পাগলের কথা।

৺দেবেন্দ্রনাথ দাস-প্রণীত।

(ডি, এন, দাস, বি, এ, কেম্ব্রিজ।)

"যেখানে দেখিলে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

কলিকাতা, ৪ নং উইলিয়ম্‌স্‌ লেন,
দাস যন্ত্রে
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৭ সাল।

মূল্য—১৲ এক টাকা।

৺দেবেন্দ্রনাথ দাস।

জন্ম—মঙ্গলবার, ২১শে শ্রাবণ, ১২৬৩ সাল, ইং ৩রা অগষ্ট, ১৮৫৭ খ্রীঃ।

মৃত্যু—সোমবার, ২৭শে পৌষ, ১৩১৫ সাল, ইং ১১ই জানুয়ারী ১৯০৯ খ্রীঃ।

ভূমিকা।

'পাগলের কথা' প্রকাশিত হইল। ইহা স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ দাসের একমাত্র বাঙ্গালা গ্রন্থ; বিলাতে বাসকালে প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন; কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁর এ পুস্তক প্রকাশ করিবার বড় ইচ্ছা ছিল না। সেজন্য তাঁর মৃত্যুর পর উহা সাধারণের সমক্ষে আনীত হইল।

এই গ্রন্থ তিনি কুড়ি অধ্যায় লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু লিখিবার কালে পীড়িত হন, পরে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকায় উহা সম্পূর্ণ করিতে আর অবসর পান নাই। 'সংসার খেলা,' 'দুর্দ্দশা,' 'ইন্দ্রজাল.' 'সত্য না মিথ্যা,' 'প্রলাপ বাক্য' শেষের এই পাঁচটী অধ্যায়ের নামমাত্র লিখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁর নোটগুলি সংগ্রহ করিয়া ও তাঁর মুখনিঃসৃত কথার স্মৃতি হইতে তাঁর বিধবা পত্নী 'সংসার খেলা' ও 'প্রলাপ বাক্য'—এই দুটী অধ্যায় লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন, অপর তিনটী অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল। গবর্ণমেণ্টের নূতন আইন অনুসারে এই পুস্তকের 'ইতিহাস' নামক অধ্যায় হইতে অনেক বাদ দিতে হইয়াছে।

এই পুস্তকে তিনি নিজ মনের ভাবগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ন্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ তাঁর প্রচুর জ্ঞান, গবেষণা ও বহুদর্শিতার ফল। ইহার ভাষাতেও অনেক নূতনত্ব আছে; পাঠকদের কাছে ইহা অনেক স্থলে বিচিত্র বোধ হতে পারে, কিন্তু গূঢ়তত্ত্বগুলি ঐরূপ সরল ভাষায় বর্ণনা বশতঃ পুস্তকখানি যে অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভাষার পরিবর্ত্তন করিলে

গ্রন্থকারের ভাবগুলি যদি জটিল হইয়া যায়, এই ভয়ে তাঁর ভাষাতে দুই একটী শব্দ ত্যাগ ভিন্ন অধিক হস্তক্ষেপ করি নাই।

এই সঙ্গে ৺দেবেন্দ্রনাথ দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনীও দিলাম।

৺দেবেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ৺শ্রীনাথ দাসের চতুর্থ পুত্র। বিলাত হতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি সাধারণের কাছে মিঃ ডি, এন, দাস নামেই পরিচিত ছিলেন। ১২৬৩ সালের ২১শে শ্রাবণ, বহুবাজারস্থ ভবনে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত দুরন্ত ছেলে ছিলেন। অন্যান্য বালকদের সঙ্গে মারামারি, ঘুঁড়ি উড়ান, গাছে চড়িয়া ফল খাওয়া প্রভৃতি বাল্যসুলভ দোষ তাঁর কৌমার জীবনে যথেষ্ট দেখা যাইত। কিন্তু ঐ সময় থেকেই তিনি অন্যায় ও অত্যাচারের ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। আর যে স্বাধীন প্রকৃতি ও সবল চরিত্রের জন্য তিনি জীবনে লুক্কায়িত থাকিয়াও সকলের সম্মানভাজন হইয়াছিলেন, সেই স্বাবলম্বন ও তেজস্বিতার অঙ্কুর ঐ কালেই গজাইয়াছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—শিক্ষকের তাড়না বা পিতার প্রহারের ভয়ে আমি কখন পাঠাভ্যাস করি নাই। যখন আমার মনে লেখা পড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মিল ও বিদ্যোপার্জ্জনের ইচ্ছা গেল, তখন আমি নিজেই পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

বাল্যকালেই দেবেন্দ্রনাথের অসাধারণ মেধা ও স্মরণশক্তি ছিল। পরীক্ষার পূর্ব্বে অন্যান্য বালকদের ন্যায় তিনি কখন রাত্রি জাগিয়া অতিরিক্ত খাটিতেন না। কিন্তু তিনি অধিক মনোনিবেশের সহিত পাঠ করিতেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি হিন্দু স্কুল থেকে এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত ও ব্যগ্র হন, কিন্তু তখন বয়সের সীমা থাকাতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার

করেন ও মাসে ২০৲ টাকা জলপানী পান। উহার অত্যল্প কাল পরেই তাঁর বিবাহ হয়। দুই বৎসর পরে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে এফ-এ পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ হন; উহার জন্য তিনি গোয়ালিয়র মেডেল পুরস্কার ও মাসে ৪০৲ টাকা স্কলারশিপ পান।

শিক্ষাকালে তিনি যেরূপ মন দিয়া লেখাপড়া শিখিতেন, সেইরূপ ব্যায়াম চর্চ্চাও যথেষ্ট করিতেন। তাঁদের বাড়ীর কাছে তাঁর পিতার একটু খোলা জমি ছিল, তাঁহারা তিন ভাই ও প্রতিবাসী সমবয়স্ক বালকেরা সেখানে গিয়া প্রত্যহ বিকালে মুগুর ভাঁজা, জিমনাষ্টিক, কোদালপাড়া প্রভৃতি বলকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে শরীর চালনা যে কত উপকারী ও আবশ্যকীয়, তাহা তিনি চিরজীবন তাঁর ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

তাঁর সরল প্রকৃতি ও অত্যাচার নিবারণের ইচ্ছা বিষয়ে ঐ সময়কার একটী ঘটনা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদিন কলেজ থেকে আসিবার কালে দেখেন, তাঁদের বাড়ীর কাছে মোড়ের মাথায় একজন ফিরিঙ্গী তাঁদের একজন প্রতিবাসীর সঙ্গে কলহ করিতেছে, অবশ্য দোষটা ফিরিঙ্গীর; কিন্তু সেই তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ভদ্রলোকটীকে মারিতে উদ্যত হইতেছে। দেবেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ গাড়ী থেকে নামিয়া এক ধাক্কায় ফিরিঙ্গীকে সরাইয়া দিলেন ও প্রতিবাসীকে অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন। ভদ্রলোকটী এই ঘটনার জন্য যাবজ্জীবন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ১৯ বৎসর বয়সে তিনি বিলাতে যান। '২১ বৎসরে ঐ একজামিন দেন। উহাতে তিনি ১৭র স্থান পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যক্রমে উহাতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে অকৃতকার্য্য

হইয়া দেবেন্দ্রনাথ জীবনের প্রারম্ভে মনে যে আঘাত পান, সে ভগ্নমনো-রথের কালিমা চিরদিন তাঁর চরিত্রে প্রতিভাত হইত। ছোট বেলায় তিনি অত্যন্ত মিশুক ও লোকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু তারপর থেকে অধিক লোকের সঙ্গে মিশিতে বিমুখ ও নির্জ্জনপ্রিয় হইয়াছিলেন।

ঐ সময়ে তাঁর পিতা তাঁহাকে অর্থকরী ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি অর্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, ও আইন ভালবাসিতেন না। বলিতেন, উহাতে মানব প্রকৃতির কেবল মন্দ দিকটার অধিক আলোচনা করার দরুণ মানুষের মন কুটীল হইয়া যায়। ইংলণ্ডে ইংরেজ ছাত্রদের সঙ্গে সমকক্ষতা করিবার ইচ্ছা চিরদিন তাঁর মনে বলবতী ছিল। তিনি বলিতেন, উপযুক্ত সুবিধা ও উৎসাহ পাইলে নিজ চেষ্টা ও অধ্যবসায় বলে প্রতি ব্যক্তিই বিদ্যা ও জ্ঞানের চরম সীমায় উঠিতে পারে। আর আমাদের দেশের অবস্থা এখন নানা কারণে অবনত হইলেও বাঙ্গালী ছাত্রদের মেধা অন্যান্য উন্নত জাতীয় বালকদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এখন সুবিধা পাইয়া তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্র শিখিবার জন্য ক্লেয়ার কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। সেখানে এক বৎসর পড়িয়া অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক (প্রায় ২০০৲ টাকার) ও দুই বৎসরের জন্য মাসে ৬০৲ টাকা করিয়া স্কলারশিপ পাইয়াছিলেন। তৃতীয় বৎসরে তিনি অঙ্কশাস্ত্রের পরীক্ষা দেন ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ উপাধি পান। এবারেও তিনি প্রথম বিভাগে পাশ হয়ে র‍্যাংলার (Wranglar) হতে পারেন নাই বলিয়া মনস্তাপ পাইয়াছিলেন। পরীক্ষার পূর্ব্বে প্রায় এক মাস জ্বর ও গাল ফুলিয়া পীড়িত ছিলেন, তাহাই বোধ হয় তাঁর Wranglar না হইবার কারণ। তিনি প্রথম বিভাগে পাশ না হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়াতে তাঁর শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত অতি আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু

মানব জীবনে সুখদুঃখ, সফলতা বা ভগ্নাশা কিছুই বৃথায় আসে না। তিনি জীবনের প্রারম্ভে বিফল মনোরথ হয়েছিলেন বলিয়াই পরজীবনে কার্য্যশক্তি চালনের অধিক প্রসর পাইয়াছিলেন।

ছয় বৎসর ইংলণ্ড বাসের পর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু কোন কারণে মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ায় পাঁচ মাসের পর পুনরায় সস্ত্রীক বিলাতে চলিয়া যান। সেখানে গিয়া তিনি প্রথমে ভারতগামী ইংরেজ যুবকদিগকে ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য একটী ক্লাস খুলেন। ঐ কাজে তিনিই প্রথম পথ দেখান। তাহাতে তিনি হিন্দী, ফার্সী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও উর্দূ ভাষা শিখাইতেন। শিক্ষাকার্য্যে তাঁর পারদর্শিতা দেখিয়া সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থীদের জন্য বিলাতে যে শিক্ষালয় (Wren's Institution) আছে তাহাতে, বার্বেক ইনষ্টিটিউশনে, (Birkbeck Institution) ও সিটি অফ লণ্ডন কলেজে (City of London College) তিনি অধ্যাপকতা কাজে নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে তিনি বিলাতের বড় বড় মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্রে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন। Nineteenth Century নামক মাসিক পত্রে তাঁর 'হিন্দুবিধবা' শীর্ষক প্রবন্ধটী তাঁর করুণ হৃদয় ও বালবিধবাদের প্রতি সমভাবের পরিচায়ক। ঐ সকল প্রবন্ধের কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি 'Sketches of Hindoo Life" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।

বহুকাল (১৪ বৎসর) বিলাতে বাস করিলে ও ইংরেজী পোষাক পরিলেও দেবেন্দ্রনাথ অন্তরে ভারতবর্ষীয় ছিলেন আর স্বদেশের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। উপরোক্ত হিন্দু জীবনের দৃশ্যগুলিতে তাঁর স্বদেশ ও স্বদেশের প্রতি ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। একখানা বিলাতের ইংরেজী পত্র তাঁহার পুস্তকের সমালোচনা করিয়া যাহা লিখিয়াছিল, তাহার

কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। তাহা দেখিয়া পাঠকেরা তাঁর স্বদেশপ্রেম বুঝিতে পারিবেন।

"Mr. Das is a Hindoo by birth and English by education, and he does credit to both. He not only writes clear fluent English, with a delicate humour that makes it a delight to read, but he is a Hindoo at heart, his writing shows that he loves his country."

(Athenæum.)

ঐ সময়ে সংবাদ-পত্রে লেখার কাজ আরো উত্তমরূপে চালাইতে পারিবেন বলিয়া তিনি নিজেই সংক্ষিপ্ত লিখন বা short hand শিখিয়াছিলেন, আর তিন মাসের মধ্যেই উহাতে এরূপ পারদর্শী হয়েছিলেন যে, মিনিটে দেড়শত কথা লিখিতে পারিতেন। কোন বিষয় শিখিবার ইচ্ছা হলে যতদিন না উহাতে সম্পূর্ণ অভীজ্ঞ হইতেন, ততদিন উহা ছাড়িতেন না। কোন কাজ বা বিদ্যা তিনি অর্দ্ধেক শিখিয়া কখন ক্ষান্ত থাকিতেন না। অনেক সময় বলিতেন, "আমার যদি দুইটা মাথা ও চারটা চোখ হত, তাহলেও বা আমার শিক্ষার বাসনা কিছু পূর্ণ হবার আশা থাকিত।"

বলা বাহুল্য, বিলাতে কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর ঐরূপ সকল বিষয়ে সমকক্ষতা দেখিয়া একতাপ্রিয় ও স্বদেশভক্ত ইংরেজদের অনেকে তাঁর প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হয়ে তাঁকে দুই একবার কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিল; আর দুইবার তিনি নিজেই কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

তিনি কিরূপ স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা নীচের ঘটনাটি পড়িলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। কেহ তাঁহাকে কোনরূপ অসম্মানের কথা বলিলে হাজার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কাজ ছাড়িয়া

দিতেন। যখন তিনি রেঁনের ইনষ্টিটিউশনে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, কতকগুলি ছাত্র তাঁর কাছে ইংরেজী ও অঙ্ক শিক্ষা করিত। কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে একজন ইহা জানিতে পারিয়া একদিন দেবেন্দ্রনাথকে বলেন—মিষ্টার দাস! তোমার এ কি রকম ব্যবহার? তুমি আমাদের সংস্কৃত-অধ্যাপক হইয়া ছাত্রদিগকে অঙ্ক ও ইংরেজী শিক্ষা দাও, ইহা ত ঠিক নয়। তিনি উত্তর করিলেন—আমি আপনাদের শিক্ষালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক, স্কুলগৃহে ঐ ভাষা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে পাঠ দেওয়া আমার অনুচিত। কিন্তু আমার বাড়ীতে আমি যে কোন বিষয়ে প্রাইভেট শিক্ষা দিতে পারি। তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন—তুমি ভারতবর্ষীয়, ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞানে তোমার যতই অধিকার থাকুক না, আমাদের দেশে আসিয়া ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া তোমার পক্ষে ধৃষ্টতা (presumption) বোধ হয়। তাহাতে মিঃ দাস উত্তর দেন—আপনাদের মাতৃভাষা বলিয়াই ইংরেজীতে যে আপনাদের একাধিপত্য আছে বা উহা অন্য কেহ ভাল বুঝাইতে পারে না, এরূপ ভাবিবেন না। আমাকে আপনারা ওরূপ বাঁধাবাঁধির মধ্যে রাখিয়া আমার মানসিক স্বাধীনতা নষ্ট করিলে আমি আর আপনাদের সঙ্গে একত্র কাজ করিতে পারিব না। এই বলিয়া পর দিনই তিনি কাজ ছাড়িবার দরখাস্ত দিলেন।

তিনি ইংলণ্ডে বাসকালে শিক্ষকতা, খবরের কাগজে লেখা, অনুবাদ প্রভৃতি জীবিকা অর্জ্জনের কাজ ব্যতীত নিজ যত্নে অনেকগুলি নূতন ও পুরাণ ভাষা শিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু, ফার্সী, ইংরেজী, ফরাসী, ইটালীয়, লাটিন ও গ্রীক—সর্ব্বশুদ্ধ এই দশটী ভাষা জানিতেন। তাঁর 'পাগলের কথা'য় ফরাসী গদ্যের অনেক অনুকরণ দেখা যায়। তাহা ছাড়া প্রত্যহ অবসর মতে তিনি ইংলণ্ডের প্রধান লাইব্রেরি—ব্রিটিশ মিউজিয়ম রিডিংরূম (British Museum Read-

ing Room) পাঠাগারে গিয়া চার পাঁচ ঘণ্টা পুস্তকে ডুবিয়া থাকিতেন ঐ কালে সংস্কৃত ও হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা তিনি যথেষ্ট করিতেন সংস্কৃতের ন্যায় বিশুদ্ধ ও উন্নত ভাষা আর জগতে নাই, এই ভাবটী তি সাধ্যমত ইংরেজদের মনে বসাইবার চেষ্টা পাইতেন।

কতকগুলি ইংরেজ বন্ধুর পরামর্শে প্রায় চার মাস ধরিয়া নিম্নলি বিষয়ে লেক্‌চার দিয়াছিলেন।

১। বৈদিক কাল। চারি বেদ, সমুদয় উপনিষদ।

২। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য—বাল্মিকীর রামায়ণ, ব্যা মহাভারত, কালিদাসের কাব্য ও নাটক, প্রাকৃতাদি সংস্কৃতের অবা ভাষাসমূহ।

৩। সংহিতা ব্রাহ্মণ (উপনিষদ ও আরণ্যক) ও সূত্র।

৪। প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র, যথা—মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশে সাংখ্য ও যোগ।

৫। পরবর্ত্তী দর্শন শাস্ত্র—জৈন, চার্ব্বাক, ভগবদ্গীতা, বৌদ্ধশাস্ত্র

৬। পানিনি প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণ, কোষ, অলঙ্কার, অঙ্কশ বীজগণিত, জ্যোতিষ, ব্যবহার (মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য), চিকিৎসাশাস্ত্র, ব (সঙ্গীত, ভাস্করকার্য্য প্রভৃতি) বিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত অতগুলি জটিল ও কঠিন বিষয়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন, তাঁর বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য যে কি পরিমাণ, তাহা প বিবেচনা করুন। সংসারে তাঁর শতাংশের একাংশবিদ্যাবিশিষ্ট ব্য কত সম্মান পাইয়া থাকেন। তিনি এদেশে সাধারণের নিকট এব বিলাত-ফেরত শিক্ষক মাত্র ছিলেন। সাধারণের এরূপ ধারণার জ দোষ দেওয়া যায় না; কারণ, তিনি এরূপ আশ্চর্য্য আত্মগোপন ক থাকিতেন যে, আমরা তাঁর অতি আত্মীয় হইয়াও তাঁহাকে চিনিতে

নাই। তিনি সমাজে কাহারও সহিত মিশিতেন না, নিজের ক্ষুদ্র বাড়ীতে পুস্তক রাশিতে ডুবিয়া থাকিতেন। তিনি বলিতেন, মানুষের অপেক্ষা পুস্তকই অতি হিতকর বন্ধু। কারণ, উহার সংসর্গে সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় মনে শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্রনাথ একেশ্বরবাদী ছিলেন ও ঈশ্বরোপাসনায় কোন প্রকার আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। বলিতেন, নিজের দেহ মন ও গৃহ পবিত্র রাখিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, কেবল নিষ্ঠার আবশ্যক। রাজনীতিতে তিনি অত্যন্ত আস্থা লইতেন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে মিশিতেন না। তিনি সচরাচর বলিতেন, আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত দোষগুলির নিরাকরণ না করিলে রাজনৈতিক স্বত্বের জন্য আন্দোলন বেশি ফলদায়ক হবে না। যে কোন জাতি চরিত্রবান হইলেই মানুষের উন্নত অধিকারগুলি ক্রমবিধানে তাঁহাদের হস্তগত হবে।

প্রবাসে শেষের দুই বৎসর অত্যন্ত পরিশ্রম করার দরুণ তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি ২।৩ বার ব্রণকাইটিস রোগে আক্রান্ত হন। সে কারণে ডাক্তারের পরামর্শে তিনি স্বদেশে ফিরিতে বাধ্য হন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাঁহাকে সিটি কলেজে ইংরেজী অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। সেখানে প্রায় এক বৎসর কাজ করিয়া তিনি নিজ বাড়ীতে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থীদের জন্য একটী ক্লাস খুলেন। আমাদের বর্ত্তমান সিবিলিয়ানদের মধ্যে অনেকে মিঃ দাসের ছাত্র ছিলেন।

প্রাইভেট টিউশনে তাঁর কার্য্যশক্তি চালনার যথেষ্ট প্রসর না পাইয়া তিনি নিজেই 'সেঞ্চুরী স্কুল, পরে 'সেঞ্চুরী কলেজ' স্থাপন করেন। ঐ কলেজ তিনি সাত বৎসর অতি দক্ষতার সঙ্গে চালাইয়াছিলেন। ঐ বিদ্যা-

লয়ের শিক্ষা-প্রণালী ও নিয়ম সকল অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি বিদ্যার সহিত বালকদের চরিত্র গঠনেও বিশেষ মনোযোগ করিতেন। দেশের অনেক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য লোকেরা নিজ নিজ পুত্র ও আত্মীয় স্বজনকে সেখানে পাঠার্থে দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ একাকী কেবল নিজ কার্য্য-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ঐ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, উহার জন্য তাঁহাকে অনেক কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সাত বৎসর অনবরত পরিশ্রম করিয়া যখন কলেজটীকে নিজ পায়ে ভর দিয়া দাঁড় করাইলেন, প্রতি বৎসর অনেক ছাত্র পাশ হতে লাগিল, গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টেও সেঞ্চুরী স্কুল ও কলেজের প্রশংসা দেখা গেল, সেই সময়ে (ইং ১৮৯৮ সালে) কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই ভয়ের আবির্ভাবে সমস্ত লোক সহর থেকে পলাইয়া যায়, স্কুল ও কলেজগুলি সব খালি হয়ে পড়ে। সেই দুই বৎসর কলিকাতার যত দেশীয় বিদ্যালয়ের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল।

এক বৎসর অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে আর্থিক ভাবনা যোগ হওয়াতে দেবেন্দ্রনাথের মাথার অসুখ জন্মায়। উহার জন্য হয় স্কুল ছাড়িয়া দিয়া বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যলাভ, নতুবা স্বাস্থ্যনাশ ও জীবনক্ষয়—এই দুই সমস্যায় পড়িয়া ডাক্তারের পরামর্শে তিনি কলেজ ত্যাগ করিতেই বাধ্য হইলেন। তিনি দৃঢ় প্রকৃতির লোক ছিলেন, অল্প দুঃখে কখন বিচলিত হইতেন না, কিন্তু সেঞ্চুরী কলেজ উঠাইয়া দিতে এতদূর মনস্তাপ পাইয়াছিলেন যে, অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই ও তিন দিন ভাল করিয়া আহার করেন নাই।

সেঞ্চুরী কলেজ বন্ধ করিয়া মস্তিষ্কের পীড়ার দরুণ তিনি কিছু-দিন দার্জ্জিলিংএ বাস করেন। পরে এক বৎসরের উপর বরিশাল ব্রজ-মোহন ইনষ্টিটিউশনে অধ্যাপকতা করেন। বরিশাল থেকে আবার তিনি

দার্জ্জিলিংএ যান, সেখান থেকে আসিয়া কিছুকাল সিটী ও রিপণ কলেজে প্রফেসরী করেন।

দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকের একটী ভ্রম ধারণা দূর করা উচিত। কেহ কেহ ভাবিতেন, তিনি অতি উগ্র প্রকৃতির লোক ও অহঙ্কারী ছিলেন, সেইজন্য অধিক দিন কোন স্থানে কাজ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁর স্বভাব কিছু গরম হইলেও তিনি বদ্‌রাগী বা অহঙ্কারী ছিলেন না; কেবল অত্যন্ত আত্মাভিমানী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। ঐ অভিমানকেই অনেকে অহঙ্কার মনে করিত, আর তাঁর স্বাধীন মন অধিক দিন বেড়ের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতে পারিত না বলিয়া তিনি শীঘ্র শীঘ্র কাজ ছাড়িতে বাধ্য হইতেন। যে কেহ তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, মিঃ দাস কিরূপ অমায়িক ও শিষ্টাচারী লোক ছিলেন। কোন কোন দিন অপরাহ্নে কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে তিনি যখন ছাত্রবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া বাক্যালাপ করিতেন, তখন কেহই বলিতে পারিত না যে, তিনি তাহাদের পিতৃস্থানীয় অধ্যাপক—বালকদের সঙ্গে তিনি এরূপ বন্ধুর ন্যায় খোলাভাবে ব্যবহার করিতেন।

তাঁর মাথার পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল আর তার সঙ্গে ডিস্‌পেপ্‌সিয়াও যোগ দিল। সে কারণে তিনি কলেজের শিক্ষকতা ছাড়িয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে পাঁচ বৎসর কাল এফ-এ, ও বি-এর পাঠ্যপুস্তকের নোট বা টীকা প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। উহাতে তাঁর যথেষ্ট আয় হত বটে, কিন্তু তিনি আর সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রত্যহ দুইবার কলিকাতার গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন। ঐ বিশুদ্ধ বায়ুসেবন ও নিয়মিতরূপে বাসের দরুণ তিনি দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও সবল ছিলেন, রোগ তাঁহাকে একেবারে আক্রান্ত করিতে

পারে নাই। পাঁচ বৎসরে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ৩১ খানা পুস্তকের ইংরেজী নোট বাহির করেন। মৃত্যুর ১০ দিন পূর্ব্বেও তাঁহার একখানি নোট বাহির হয়। তিনি পরবশ জীবনকে যেরূপ ঘৃণা করিতেন, সেইরূপ একদিনের জন্য শয্যাগত থাকেন নাই। দুইদিন মাত্র জ্বর ভোগ করিয়া তাঁর বুক খারাপ হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হয়। পরে ডাক্তারেরা জানিতে পারেন, রক্ত-বসন্তই তাঁর মৃত্যুর কারণ। ১৩১৫ সালের ২৭এ পৌষ (ইং ১১ই জানুয়ারী, ১৯০৯) প্রায় সাড়ে ৫১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকে গিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ জীবনে কখন আত্মপ্রকাশ করেন নাই। তিনি কোনরূপ বাহ্যিক আড়ম্বর ও নিজের ঢাক বাজান পছন্দ করিতেন না। যে কোন বিষয়েই হোঁক, তিনি সরলমনা ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি আত্মাভিমানী ছিলেন বটে কিন্তু কখন আত্মগর্ব্বী ছিলেন না। যে কোন লোক তাঁর সঙ্গে মিশিয়াছেন, তিনিই তাঁর ভদ্রতা ও শীলতার পরিচয় পাইয়াছেন। মিথ্যাকথা, ভণ্ডামি, কপটতা ও বিলাসিতাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। আর মানব-জীবনে সংযম শিক্ষার এত পক্ষপাতী ছিলেন যে, মাঝে মাঝে মোটা লাল চালের ভাত ও লাল আটার রুটি খাইয়া নিজ জীবনকে সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত রাখিতেন। চরিত্রবান মানুষ কার্য্যশক্তি বলে কতদূর নিজের উন্নতি ও জ্ঞান লাভ করিতে পারেন ও কত কাজ করিতে সক্ষম হন—দেবেন্দ্রনাথের জীবনীতে আমরা তাহারই অতি স্পষ্ট উদাহরণ পাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

শিশুকাল ১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মামার বাড়ী ১১

তৃতীয় অধ্যায়।

যমদূত শিক্ষক ৩০

চতুর্থ অধ্যায়।

পাঠ-তৃষ্ণা ৫০

পঞ্চম অধ্যায়।

স্কুল ও স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী ৭০

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভেল্কিখেলা ৮৪

সপ্তম অধ্যায়।

জগদম্বা ১০৫

অষ্টম অধ্যায়।

ইতিহাস ১২০

নবম অধ্যায়।

শ্বশুরবাড়ী ১৩৫

দশম অধ্যায়।

বিদ্যাশিক্ষা ১৪৮

একাদশ অধ্যায়।

ভ্রমণ ১৭০

দ্বাদশ অধ্যায়।

আরাবলী ১৯১

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মা ২১৪

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

চাকরী ২২৭

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নূতন জীবন ২৪০

ষষ্ঠদশ অধ্যায়।

সংসার-খেলা ২৫৬

সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রলাপ-বাক্য ২৭০

পাগলের কথা।

প্রথম অধ্যায়।

শিশুকাল।

ভাই, পাঠক! তুমি এই পুস্তকের শিরোনামা দেখিয়াই, বোধ হয়, ঠিক করিবে যে, ইহা ক্ষিপ্ত বা জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির দ্বারা লেখা হইয়াছে; আর উদ্ভ্রান্ত চিত্তের উন্মত্ত উক্তি বা পাগলের প্রলাপ প্রজল্প ভাবিয়া ইহার পাঠে বিমুখ হইবে, না হয় অশ্রদ্ধা করিবে। পাছে তোমার মনে এইরূপ কোন কুসংস্কার বা ভ্রান্তির উদয় হয়, এই আশঙ্কায় আমার ইতিহাস আরম্ভিবার পূর্ব্বে বিনত বদনে ও বিশ্বস্তভাবে তোমাকে গুটিকতক কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমার বক্তব্য এই যে, আমার মতে আমি পাগল নহি; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার মাথায় বা রক্তে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে নাই। লোকে আমাকে উন্মত্ত বলিয়া বর্ণনা করে, সর্ব্বসাধারণের এই মতানুসারেই আমার জীবনচরিতকে "পাগলের কথা" নাম দিয়াছি। এই বই লিখিবার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, পাঠক, তুমি আমার জীবনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অতি মনোযোগের সঙ্গে পড়িয়া আমার ঐ মিথ্যা অপবাদ সম্বন্ধে যথাবিধি

বধিতে উদ্যত হইয়াছিলাম! যাঁহার কল্যাণে আমি সমস্তই পাইয়াছি, সেই গর্ভধারিণী, প্রাণের অধিক প্রিয়, মার অন্তর হইতে বাহিরে আসিতে না আসিতেই, তাঁহার জীবন হরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

পিতার বাড়ী কলিকাতায় ছিল, তিনি সরকারী চাকরী করিতেন, আর তিনি যাহা উপার্জ্জিতেন, তাহাতে তাঁহার সংসার একরকম বেশ স্বচ্ছন্দে চলিত। পিতা স্বাভাবিক দৃশ্য অতিশয় ভালবাসিতেন, তাঁহার চিরকাল পল্লীগ্রামে বিবাহ করিতে ইচ্ছা ছিল; এই জন্যই তিনি হুগলির নিকট বিবাহ করেন। পরিণয়কালে তাঁহার বয়স কুড়ি ও মাতার বয়স তের বৎসর ছিল। আমরা তিন ভাই ও দুই বোন, আমি মার শেষ সন্তান। আমার এখনও বেশ মনে পড়ে যে, বাল্যকালে যখন মাকে উত্ত্যক্ত করিতাম, তখনই তিনি আমাকে—যে এল শেষে, সে রইতে দিলে না দেশে—বলিয়া তিরস্কার করিতেন। যথার্থই আমার কারণে তিনি যে অসহ্য কষ্ট ভুগিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অধিক দিন পৃথিবীতে পর্য্যন্ত 'রইতে' দিই নাই।

আমি যখন জন্মাই, পিতার বয়স তখন প্রায় চল্লিশ বৎসর। তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া সংসার পাতিয়াছিলেন, কারণ আমার ঠাকুরদাদার অবস্থা অতি মন্দ ছিল; কিন্তু নানা কারণে পিতা শীঘ্রই যেন সংসারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সংসারে তাঁহার আস্থা ক্রমে আরও শিথিল হইয়া আসিল, তিনি আমার খুড়ার উপর যথার্থ গৃহভার অর্পিলেন। এই খুড়ার মুখ থেকে আমি আমার পুরাণ কথা সব শুনিয়াছি, আর তাঁহার নিকট হইতেই আমার শিশুকালের ইতিহাস যথাসাধ্য সঙ্কলন করিয়াছি। খুড়ার কোন সন্তানাদি হয় নাই, সেজন্য খুড়া ও খুড়ী আমার অতিশয় যত্ন করিতেন। পিতার সংসারে অশ্রদ্ধা ও মাতার উৎকট পীড়া আমার লালনপালন সম্বন্ধে মহা অবহেলার কারণ হইয়াছিল। আমার অন্য

ভাইবোনেরা সকলেই এক প্রকার বড় হইয়াছিলেন, ও নিজেদের ভালমন্দ বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু আমি তখন একেবারে শিশু, আমার জীবন লইয়াই সংশয়। আমি যেন মহাসমুদ্রে ভাসন্ত জাহাজের পাশ হইতে একখানা কাটের মত খসিয়া পড়িয়াছিলাম, আর আমি নিজেও কখন্ ডুবি, কখন্ ভাসি, তাহার ঠিক ছিল না। আমার জন্মাবধি মাতার ভয়ানক পীড়া হইয়াছিল, তিনি আমার লালনপালনে অপারগ ছিলেন, সেজন্য খুড়াখুড়ী আমাকে তাঁহাদের নিজের সন্তানের মত ভাবিয়া অতিশয় যত্ন ও আগ্রহের সঙ্গে প্রতিপালিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, তাঁহাদের যত্নেই আমি মানুষ হইয়াছি। শিশুকালে খুড়ীই আমার মাতৃস্থানীয়া ছিলেন, তখন তাঁহাকেই মা বলিয়া জানিতাম। আমি এই বই লিখিতেছি। এখনও আমার সেই খুড়ী জীবিত আছেন। খুড়ীমা! তুমি যে আমায় এই বিষম কাঁটাময় সংসারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলে, সেজন্য তোমায় ক্ষমা করিলাম। তোমার স্নেহ, দয়া, মমতা ইহজন্মে কখনই ভুলিব না; কিন্তু তুমি আমার জীবনের প্রারম্ভে আমার যেরূপ সেবা ও যত্ন করিয়াছিলে, আমি তোমার জীবনের শেষে সেরূপ কিছুই করিতে পারিতেছি না—এ চিন্তা নিরন্তর আমার অন্তরে প্রখর পীড়া দিতেছে!

শুনিয়াছি, আমি জন্মাবার কালে একটী মাটির ঢিপির মত ছিলাম, বেশী নড়িতাম চড়িতাম না। চার বৎসর পর্য্যন্ত আমি অতিশয় নিশ্চল ও নির্জ্জীব ছিলাম, সর্ব্বদাই স্থিরভাবে থাকিতাম, এইজন্যই পিতামাতা আমাকে রহস্যচ্ছলে 'হুঁতোরাম' বলিয়া ডাকিতেন, আমি অনেক বৎসর লোকের নিকট ঐ নামে পরিচিত ছিলাম। সকলে আমাকে—হুঁতো, হুঁতো—বলিয়া আদর করিত; বুড়ো খুড়ী আজ পর্য্যন্তও আমাকে ঐ ছেলেবেলার 'হুঁতো' ছাড়া অন্য কোন নামে সম্বোধন করেন না, নামটী শ্রুতিমধুর ও অর্থমধুর না হইলেও আমার কাছে উহা অতিশয়

মিষ্ট ও সুখকর। এইজন্যই আমার জীবন-বৃত্তান্তে ঐ বাল্যকালের নাম ব্যবহার করিয়াছি। এই অবসরে আর একটী কথা বলি, কাহারও কাহারও আপত্তি থাকাতে এপুস্তকে দুইচারিজন লোকের আসল নাম না দিয়া তাঁহাদের রাশ নাম ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শৈশবে আমার স্বভাব অতিশয় বিচিত্র ছিল। লোকজনের সঙ্গে অধিক কথাবার্ত্তা কহিতে ভালবাসিতাম না, প্রায় একাকী থাকিতাম, আর নিজমনে সদাসর্ব্বদা যেন কি চিন্তা করিতাম। অত অল্প বয়সে আমার ঐরূপ গম্ভীর ভাব দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইত। আবার ঐ বয়সেই রাগ, দুঃখ আদি ভাব আমার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কেহ কোন কটু কথা বলিলে বা অন্যায় দোষে শাস্তি দিলে আমি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইতাম, আর পরের দুঃখে অতিশয় কষ্ট পেতাম, ও পরের চোকে জল দেখিয়া নিজে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতাম। সময়ে সময়ে বড় আব্দার করিতাম; খুড়ার কাছে শুনিয়াছি যে এক এক দিন কোন কারণবশতঃ প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা অনবরত কাঁদিতাম, কেহই আমাকে থামাতে পারিত না ও কাহারও কথায় ভুলিতাম না। রুগ্ন মাতার মনে এইরূপে যে কত ক্লেশ ও যন্ত্রণা দিতাম, তাহা বলা অসাধ্য।

পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি যে কি করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই আমার স্মরণ নাই; ঐ সময়ের পর হইতে আমার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি অল্প অল্প মনে পড়ে। ঐ বয়সে আমার মনে নিজের অস্তিত্বের জ্ঞান প্রথম জন্মায়, আর পাঁচ বৎসর বয়সের কালে আমি প্রথম বই পড়িতে শিখি। প্রথম পুস্তক পড়িতে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ অনুভব করিতাম, তাহা আমার মনে এখনও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। দুই চারখানা বই শেষ হইলে আমি পাঠ্য পুস্তক ফেলিয়া উপরি বই পড়িতাম; সকলের অপেক্ষা রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতে অধিক ভালবাসিতাম।

ঐ দুই বইয়ের কি এক আকর্ষণী শক্তি আছে যে, বাল্যকালে সেগুলি যেমন আগ্রহের সঙ্গে পড়িতাম, এখন এই প্রৌঢ় অবস্থায়ও সেইরূপ আস্থার সঙ্গে রাম-রাবণ ও যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত পড়িয়া থাকি।

ঐ বয়সেই, পুস্তক পাঠের সময় আমার অন্তরে হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ আদি নানা ভাবের উদয় হইত। সীতার দুঃখে একেবারে অধীর হইয়া পড়িতাম, তাঁহার গুণে একান্ত মোহিত হইতাম। রাম যখন রাবণকে বধিলেন পড়িতাম, তখন আমার হৃদয় হর্ষে উথলিয়া পড়িত; আবার কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের বিবরণ পাঠে আমি উত্তেজিত হইতাম। মা রামায়ণ মহাভারত পড়িতে অতিশয় ভালবাসিতেন; কিন্তু তিনি পীড়াগ্রস্ত হওয়াতে সে সময়ে নিজে পড়িতে পারিতেন না, এজন্য কখন কখন আমাকে পড়িতে বলিতেন। আমি তাঁহার বিছানার নিকট বসিয়া কতদিন পূর্ব্ব পুরুষদের কথা শুনাইয়া মার যাতনা ভুলাইয়া দিতাম; আর তিনি আমার মুখে বাল্মিকী ও বেদব্যাসের কথা শুনিয়া একেবারে গলিয়া যাইতেন, যতই পড়িতাম, ততই তিনি আরও শুনিতে চাহিতেন। একদিন রাত্রে মার অসুখ কিছু বাড়িয়াছিল, কিছুতেই আর তাঁহার যাতনার লাঘব হয় না। আমি মাতাকে গিয়া বলিলাম—মা! আমি রামায়ণ পড়ি, তুমি শুন।—তিনি যদিও কষ্টে অস্থির হইয়াছিলেন, তথাপি আমার প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। শুনিতে শুনিতে তিনি এমন ভুলিয়া গেলেন, আর আমি পাঠে এমনই নিমগ্ন ছিলাম যে, অধিক রাত্রি হইল বলিয়া কাহারও জ্ঞান হয় নাই। শেষে ভোরের বেলা আলো দেখিয়া ও চড়াই পাখীর ডাক শুনিয়া মা চমকিয়া উঠিলেন, আর লজ্জা বোধ করিয়া আমাকে বলিলেন,—বাবা, এস এখন ঘুমাইগে, তোমার চেয়ে দেখ্‌ছি আমি বেশী ছেলেমানুষ, যে একেবারে সব ভুলে গিয়েছিলাম।—

আমার বড়দাদা আইন শিখিয়া কলিকাতার বড় আদালতে ওকালতী

করিতে আরম্ভিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে গতিক ভাল নয় দেখিয়া আলাহাবাদের বিচারালয়ে ওকালতী করিতে গেলেন! তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল ও এক পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহাদের লইয়া তিনি আলাহাবাদে বাস করিতে লাগিলেন। আমাদের বাড়ীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক রহিল না, তিনি কেবল অনেক দিন অন্তর এক একখানা পত্র লিখিতেন। আমার মেজদাদা চিররুগ্ন, তিনি একটা না একটা ব্যারাম লইয়াই ছিলেন। তিনি ডাক্তারী কাজ শিখিয়াছিলেন, কিন্তু চিকিৎসাকর্ম্মে তাঁহার কোন বিশেষ আসক্তি ছিল না; আর নিজের শরীর লইয়াই ব্যস্ত, পরের শরীরের কি করিবেন। তাঁহার মনে নানারকম খ্যাল চাপিত; তিনি লোকজনের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসিতেন না, বাড়ীতে পাশের একটী ঘরে বসিয়া বই হাতে করিয়া রাজা উজীর মারিতেন। তিনি কখন বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন, আর এখন পর্য্যন্তও স্ত্রীসহবাস সুখে বঞ্চিত আছেন। আমার বড়দিদির অনেক বৎসর আগে বিবাহ হইয়াছিল, তিনি নিজের স্বামী ও সন্তানদের লইয়া শ্বশুরবাড়ীতে ঘর করিতেছিলেন। ছোটদিদির বয়স আমার অপেক্ষা পাঁচ বৎসর অধিক; তাঁহার তখন সবে বিবাহ হইয়াছিল; তিনি মধ্যে মধ্যে শ্বশুরবাড়ী যেতেন আর আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন। বাড়ীর মধ্যে আমি এক ছোট ছেলে ছিলাম, এজন্য আমি সকলের আদর খেতাম, আর সকলেই, বিশেষ খুড়াখুড়ি, আমায় অতিশয় যত্ন করিতেন।

খুড়া কাজ হইতে আসিয়া আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকিতেন, আমি তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতাম, তিনি ডাকিলেই আমি অতি আহ্লাদের সহিত তাঁহার নিকটে যেতাম। তাঁহার ঘরে অনেক বই থাকিত, সেগুলি হাঁটকাতে আমি বড় পছন্দ করিতাম। বই পড়িতে আমার বড় সাধ ছিল; বুঝিতাম আর নাই বুঝিতাম, খুড়ার বাঙ্গালা পুস্তকগুলির উপর

আমার মহা কোপ ছিল। কতদিন আমি লুকাইয়া লুকাইয়া খুড়ার বই পড়িতাম, আর ঐ রকমে অল্প সময়ের মধ্যে বেশ পড়িতে শিখিলাম, দুই একখানি বই বেশ বুঝিতেও পারিতাম, কিন্তু আমার মন অপেক্ষা হৃদয় অধিক শীঘ্র পরিপুষ্ট হইয়াছিল; পুস্তকপাঠ কালে যত না বুঝিতাম, তাহার অপেক্ষা হর্ষবিষাদাদি অধিক অনুভব করিতাম।

বাস্তবিক আমার হৃদ্বৃত্তি ও সমভাব ঐ অল্প বয়সে অতি প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে পার্থিব লোক ও বস্তু আমার হৃদয়ে কোন ভাব বিশেষের উদ্রেক করিত না, কিন্তু পুস্তকলিখিত ও কাল্পনিক ব্যক্তি ও বিষয়ের আলোচনায় সুখদুঃখাদি নানা রসে পরিপ্লুত হতাম। ঐ সকল বিচিত্র অন্তর্বৃত্তি আমার মনকে কোনরূপে আঘাত করে নাই, কিন্তু আমার হৃদয় হইতে মনে একরূপ প্রতিঘাত লাগিত; তাহার দ্বারা আমি মানব জীবন সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ও অপরূপ জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলাম, আর সে জ্ঞানকে এত বৎসরের অভিজ্ঞতা ও অনুধ্যান আমার মন হইতে তাড়াইতে পারে নাই।

আমার পড়াশুনা তখনও রীতিমত আরম্ভ হয় নাই। মধ্যে মধ্যে খুড়া আমার লেখাপড়ার অন্বেষণ লইতেন, কিন্তু তিনি যে বই পড়িতে বলিতেন, তাহা ফেলিয়া আমার পচ্ছন্দমত, যাহা ইচ্ছা, তাহাই পড়িতাম। এই সম্বন্ধে খুড়া আমাকে কত উপদেশ দিতেন, কিন্তু আমি অত্যন্ত এক-গুঁয়ে ছিলাম; আমার যাহা ভাল বোধ হইত, তাহাই করিতাম, কাহারও কথা শুনিতাম না। বলিতে কি আমি ঐ বয়সে যেরূপ অবাধ্য ছিলাম, তাহা এখন মনে পড়িলে অতিশয় লজ্জা বোধ হয়.আর নিজেকে ভৎ'সনা করিতে ইচ্ছা করে। আবদারে থেকে আমি ভয়ানক একগুঁয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। পিতামাতার মহা চিন্তা উপস্থিত হইল; তাঁহারা আমার সম্বন্ধে কি করিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। ওরূপ

ছেলেকে বাড়ীতে রাখিয়া যথেচ্ছা করিতে দেওয়া কোনমতে উচিত নয়, আর আমার যেরূপ প্রকৃতি ও অল্প বয়স, তাহাতে স্কুলে পাঠানও সদ্বিবেচনার কাজ নয়, এইরূপ বিতর্কে তাঁহাদের মন আন্দোলিতে লাগিল। অবশেষে পিতা ভাবিলেন যে, স্কুলে অধিক শাসনে থাকিব, আর পরের কাছে অমন একগুঁয়েপনা করিব না, এই মনে করিয়া পর বৎসরে আমাকে কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। আমি ইহাতে মতামত কিছুই প্রকাশ করিলাম না, বরং নূতন জীবনের আস্বাদে মগ্ন রহিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মামার বাড়ী।

পর বৎসর নিয়মমত স্কুলে পড়িতে যাইতে লাগিলাম। মাস কয়েক বেশ মনোযোগে পাঠ অভ্যাসিলাম ও স্কুলের শিক্ষকের কথানুসারে চলিলাম। কিন্তু ক্রমে স্কুলের পাঠাভ্যাসে আমার আস্থা শিথিল হইয়া আসিল, আমি শিক্ষকের আদেশপালনে বিমুখ হইলাম ও বড় বিরক্তি বোধ করিলাম। পিতামাতাকে এ সম্বন্ধে কিছুই জানাতাম না, আর তাঁহারাও আমার লেখা পড়ার সম্বন্ধে অধিক সংবাদ লইতেন না। মাতার পীড়া ভাল হইলেও তিনি অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বল ছিলেন, এজন্য আমাতে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারিতেন না। পিতা নিরুৎসাহ ও নিস্পৃহ ছিলেন, সংসারে তাঁহার কোন আস্থা ছিল না, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একবার আমার সংবাদ লইতেন ও আমাকে ডাকিয়া কথাবার্ত্তা করিতেন। খুড়া আমার ভালমন্দে অতিশয় যত্নবান ছিলেন, আমার লেখাপড়াতে আগ্রহ দেখাতেন ও আমার প্রতি অতি দয়ালভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে পর্য্যন্তও স্কুলের প্রতি আমার বিরাগের বিষয় কিছুই বলি নাই।

এইরূপে প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়া গেল। আমি স্কুলে কিছু কিছু বিদ্যা লভিলাম, দুই একটা ইংরেজী কথা শিখিলাম, আর দুই একখানা বাঙ্গালা বইও পড়িলাম। কিন্তু স্কুলের পাঠে বড় অবহেলা করিতে লাগিলাম। পাঠ্য পুস্তক ফেলিয়া উপরি বইয়ে মন দিতাম, লুকাইয়া

খুড়ার বাঙ্গালা বইগুলি পড়িতাম। গল্পের বই, রামায়ণ, মহাভারত নাটকাদি কিছুই আমার গ্রাস হইতে মুক্তি পাইত না। খুড়া জানিতে পারিলে দুই এক দিন আমাকে বকিতেন; কিন্তু আমি লোভ সংবরিতে পারিতাম না, তাঁহার তিরস্কার সত্ত্বেও গোপনে ঐ সকল বই পড়িতাম। ঐ সময়ে জীবনচরিত নামে একখানা বই বাহির হইয়াছিল, উহা আমার সকলের অপেক্ষা অধিক ভাল লাগিত। ঐ পুস্তকে নানা দেশের প্রসিদ্ধ বীর ও বিখ্যাত লোকদের বৃত্তান্ত লেখা আছে, আমি সেই জীবনীগুলি অতি যত্নের সঙ্গে পড়িতাম। শিবজী, রামমোহন রায়, হানি-বল, নেপোলিয়ন, টেল, পিট, ওয়াসিংটন প্রভৃতি মহাত্মাদের অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ পড়িতে আমার যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইত, তাহা বলিতে পারি না। নাটক, গল্প ছাড়িয়া ঐ জীবনচরিতখানি বার বার পড়িলাম। আমার এখন মনে হয় যে, ঐ বীরপুরুষদের কাহিনীর পুনঃপুনঃ পাঠে আমার মন সতেজ ও সবল, হৃদয় সাহসী ও উৎসাহী, আর চরিত্র অভি-মানী ও অদম্য হইয়াছিল। পরের প্রভুত্ব ও শাসনের বিষম বিদ্বেষী হইয়া দাঁড়ালাম, আর চিরজীবনের মত নিজের সুখের মূলে কাঁটা পুঁতিলাম।

জীবনচরিত পাঠে আমার মনে অনেক নূতন ভাবের উদয় হইল, আর স্বদেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে আস্থা জন্মিল। যখন যে বীরের কথা পড়িতাম, তখন নিজেকে সেই বীরের মত ভাবিতাম। নেপোলিয়নের তেজ ও সাহসের বৃত্তান্ত পাঠকালে নিজেকে ফরাসী ভাবিতাম, ওয়াসিং-টনের স্বদেশপ্রিয়তা ও নিঃস্বার্থপরতার বর্ণনার আলোচনা সময়ে নিজেকে আমেরিক্ কল্পিতাম। বিপদকালে ধীরতা ও অসমসাহসিকতার আখ্যানে আমি অতিশয় উত্তেজিত হইতাম। কখন কখন বীরদের জীবনী পড়িতে পড়িতে আমার চোক হ'তে আগুণ ঝল্‌কাইত, আমার কণ্ঠস্বর প্রচণ্ড হইয়া আসিত, আমি সর্ব্বাঙ্গে কাঁপিতে থাকিতাম। খুড়া ঐ

বইখানি পড়িতে নিষেধ করিতেন না, বরং তিনি আমাকে ঐ সম্বন্ধে আরও উৎসাহ দিতেন, আর আমার সঙ্গে বড় লোকদের বিষয় কথোপকথন করিতেন। আমার মনে পড়ে, একদিন তাঁহার সুমুখে কোন বীরের কথা বর্ণিতে বর্ণিতে এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলাম ও নিজেকে এমন ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, খুড়ার লাঠি লইয়া ঘরের মধ্যে শত্রুর উদ্দেশে ধাবিলাম; কিন্তু শত্রুর মাথা না ভাঙ্গিয়া সজোরে এক লণ্ঠনের উপর ঘা মারিলাম, লণ্ঠনটী চূর্‌মার্ হইয়া গেল।

ভাইদের সঙ্গে আমার প্রায় কোন সম্পর্ক ছিল না, ভ্রাত্রীয় স্নেহ কাহাকে বলে জানিতাম না। ভাইবোনদের মধ্যে কেবল ছোট দিদিকে দেখিতে পেতাম। তাঁহাকে আমি বড় ভালবাসিতাম; অনেক সময়ে খেলা ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যেতাম, দুজনে এক সঙ্গে বই পড়িতাম, এক মাদুরে তাস খেলিতাম, একভাবে গল্প করিতাম। আহা! সে সুখের দিন এখন কোথায়? সে নির্ম্মল বদন, সে সরল প্রণয়, সে ভাইবোনের ভালবাসা এখন কোথায়? বাড়ীতে ছোটদিদির কোন সঙ্গী ছিল না, আর আমারও সমবয়স্ক কেহ ছিল না, এজন্য আমরা দু'জনে পরস্পর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলাম ও আমাদের সমস্ত সোদর প্রেম পরস্পরের প্রতি ঢালিতাম। তাঁহার শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় আমার অতিশয় কষ্ট বোধ হইত, তাঁহার হাত ধরিয়া কত কাঁদিতাম; যেন সকলই হারালাম ভাবিয়া যারপরনাই কাতর হতাম।

আমার স্কুলের পড়ার অবস্থা দিন দিন আরও মন্দ হইয়া আসিল। উহাতে আমার প্রায় সকল আস্থাই চলিয়া গেল, আমি পাঠ্য পুস্তকে অবহেলা করিয়া যাহা ইচ্ছা পড়িতে লাগিলাম। বেশ ভাল স্কুলে পড়ি, পিতামাতার টাকার অভাব বা বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে আমার কোন যত্নের ত্রুটি নাই, আর আমি সকলের ভালবাসার পাত্র, তবে আমার মতিভ্রম

হইল কেন? এমন সকল সুবিধা থাকিতেও লেখাপড়ায় ঐরূপ তাচ্ছল্য দেখাতাম কেন? পাঠক! তুমি এ প্রশ্নের নানা প্রকার উত্তর কল্পনা করিবে, কিন্তু আমি তোমায় যথার্থ কথা বলিতেছি শুন। আমার যে লেখা পড়া করিতে ভাল লাগিত না বা ভাল শিক্ষা পেতাম না বা কোন-রকম সুবিধার অভাব ছিল, তাহা নয়। কেবল একেবারে পরের বশ্যতা স্বীকার ও পরের ইচ্ছামত চলন আমার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। এক বৎসরের অধিক বেশ পড়িয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমাগত শিক্ষক যাহা বলিবেন, তাহাই করিতে হইবে, এ আমার প্রাণে সহিল না, আর পাঠা-ভ্যাসে অবহেলার দরুণ বার কয়েক তিরস্কার ও প্রহার খাইয়া স্কুলের প্রতি আমার অত্যন্ত অভক্তি জন্মিল। আমার স্বভাবের এই বৈচিত্র্য যে, কাহারও প্রহার বা তিরস্কার সহিতে পারিতাম না। কেহ আমায় বকিলে বা মারিলে, রাগে তাহার মাথা গুঁড়া করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা যাইত, কিন্তু সে ইচ্ছা সফল করিতে পারিতাম না, সুতরাং অন্তরে সে ক্রোধ চাপিয়া রাখিতাম। আমি এই বৈলক্ষণ্যকে গুণ বলিতেছি না; বোধ হয়, উহার কারণেই আমি ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক কষ্ট পাইয়াছি। লোকে ভাল করিয়া আমায় বুঝিবে, এই আশায় মূল কথা লিখিলাম।

বাল্যকালে বয়সের দোষ আমার সবই ছিল। স্বভাবতঃ হৃষ্টপুষ্ট ছিলাম, এজন্য মারধর করিতাম, উদর পূর্ত্তিতে বিলক্ষণ পটু ছিলাম, আর প্রহার বা তিরস্কারের ভয়ে কথন কথন মিথ্যাকথা বলিতাম। কত দিন যে লুকাইয়া লুকাইয়া আহার দ্রব্য খেতাম, তাহার সংখ্যা নাই; আম, সন্দেশ, দই কোন জিনিষই এই চুরিবুদ্ধি হুঁতোর হাত থেকে এড়াত না। কিন্তু কথন পরের মন্দ বা পরের অপকার করিতে ভালবাসিতাম না। অন্যের দ্রব্য নষ্ট করা, পরের হিংসা করা বা পরের নামে দোষ দেওয়া, মনে স্থান পাইত না, আর যথার্থ প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে জানিতাম না।

আমি দুষ্ট ছিলাম, কিন্তু দুর্ম্মতি ছিলাম না। ঐ বয়সে কেবল একদিন আমি বড় অন্যায় করিয়াছিলাম; আর তাহা পরিণামে অতি ক্লেশকর হইয়াছিল। সে কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে, উহা এই খানে লিখিতেছি।

আমাদের বাড়ীর পাশে একজন ভয়ানক ঝগড়াটে স্ত্রীলোক থাকিত, সে পাড়াপর্শীদের সঙ্গে কেবল কোঁদল ও গালাগালি করিয়া বেড়াইত। দুর্ব্বল মা তার জ্বালায় সময়ে সময়ে অতিশয় অস্থির হইতেন। স্ত্রীলোক-টার উপর আমার মহা ক্রোধ জন্মিল, তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিতাম না। একদিন বিকালবেলা স্কুল হইতে আসিবার পর, জলখাবার খাইয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া মুখ ধুতেছি, এমন সময়ে দেখি না সেই কুষ্মাণ্ড স্ত্রীলোকটা কি বকিতে বকিতে আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছে। আমার রাগ ঝাড়িবার চমৎকার সুবিধা দেখিলাম। একগাল জল কুল্‌কুচা করিয়া তার গায়ে ফেলিয়া দিলাম। সে বেচারী চম্‌কিয়া গিয়া ভয়ে থতমত খাইল; তার মুখে, কাপড়ে, চারদিকে উচ্ছিষ্ট জল। কিছুক্ষণ পরে সে গায়ের জ্বালায় গালাগালি আরম্ভিল, আর এদিক ওদিক তাকাতে লাগিল। আমি এমন গোমুর্খ যে তৎ-ক্ষণাৎ জানালা হতে সরিয়া না গিয়া উকি মারিয়া তার দুরবস্থার গতি দেখিতেছিলাম। হঠাৎ আমার দিকে তার চোক পড়িল। আমাকে দেখিয়া সে গালাগালি থামাইয়া আবার বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। কিন্তু পাষণ্ড হতভাগা স্ত্রীলোকটার (এখনও মনে পড়িলে রাগ হয়) এমনই দুরভিসন্ধি ছিল যে, সন্ধ্যার পর পিতাকে আমার দুষ্টামীর কথা সব বলিয়া দিল। পিতা আমার উপর অত্যন্ত চটিয়া গেলেন ও আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমার মনে একটু সন্দেহ ও ভয় হইয়াছিল, কিন্তু আমি ভাবি নাই যে সত্যসত্যই স্ত্রীলোকটা

পিতাকে সব বলিয়া দিবে; যাহা হউক, আমি চুপ্ চাপে পিতার নিকটে গেলাম। তিনি গুটিকতক কথা বলিতে না বলিতেই আমাকে প্রহারেণ ধনঞ্জয় দিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া আসিলাম; আমার শরীরের ব্যথা দুই তিন দিনের মধ্যে সব ভুলিয়া গেলাম, কিন্তু মনে বড় আঘাত পেলাম।

কাহারও কাছে প্রহার বা তিরস্কার খাইলে খুড়ীর নিকটে যেতাম। ছোটদিদি চলিয়া গেলে বাড়ীতে খুড়ীই আমার একমাত্র বন্ধু থাকিতেন। আর তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, আমাকে কখন কটুকথা বলিতেন না বা কখন আমার গায়ে হাত তুলিতেন না, আমিও তিনি যাহা বলিতেন তাহাই শুনিতাম। স্কুলের ছুটীর সময় কত দিন তাঁহার পাশে বসিয়া তাঁহাকে সেলাই করিতে দেখিতাম বা গল্প বলিতে শুনি-তাম, কখন বা তিনি আমাকে গান শুনাইতেন। আঃ তাহাতে আমার কি সুখ বোধ হইত! তাঁহার মনোহর বদন, তাঁহার কোমল স্বভাব, তাঁহার মধুর কথা, তাঁহার কমনীয় দৃষ্টি, তাঁহার স্নেহময় আদর আজ পর্য্যন্তও আমার অন্তরে স্পষ্টরূপে জাগরূক রহিয়াছে। আমি ঐ অল্প বয়সেই গান শুনিয়া গলিয়া যেতাম, আর খুড়ী এমন মিষ্টস্বরে গাহিতেন যে, তাঁহার গানে একেবারে মোহিত হইতাম। কতবার তাঁহার দুঃখের বা বিচ্ছেদের গান শুনিয়া আমার চোকে জল আসিত, আমি নিস্পন্দের ন্যায় তাঁহার মুখপানে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতাম। তাঁহার গানগুলি এতই মনে বসিয়াছিল যে, বলিব কি আমি বুড়া হ'তে চলিলাম, এখনও তাঁহার অনেক গান মধ্যে মধ্যে আমার স্মরণে পড়ে আর দুই একটা গাইতে গিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে থাকি। একটী গান আমার অহরহ মনে আসে, উহার সুর বেশ স্মরণ আছে, কিন্তু অনেক কথা ভুলিয়া গিয়াছি। সে গানের যতটা মনে পড়ে, তাহা এই লিখিতেছি:—

চিরদিন কভু কারুর সমান না যায় ;
কভু রাখালের সনে, ফেরে বনে বনে, কখন রাজত্ব পায়।
....
অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল, তার সাক্ষী দেখ মহারাজা নল ;
....

আহা! বাল্যকালে এ গান শুনিয়া নির্ম্মল ও শান্ত-হৃদয়ে যে সুখ পেতাম, এখন সে সুখ কোথায়? কেনই বা এখন এই গানে জীবনের সমস্ত কথা আমার অন্তরে জাগিয়া উঠে?

আট বৎসর বয়সে আমার স্বভাব ঐরূপ বিচিত্র হইয়া দাঁড়াইল; আমার চরিত্রে অনেক অসামঞ্জস্য পরিস্ফুট হইল। আমি এককালে কোমল ও কঠিন, অমায়িক ও অভিমানী, নিরীহ ও সাহসী ছিলাম; যেমন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতাম, তেমনি দুঃখে গলিয়া যেতাম; পরের অবশ ছিলাম, তেমনি পরের হিতৈষী ছিলাম। পরের ভৎর্সনা বা প্রহার কখনও সহিতে পারিতাম না, কিন্তু কেহ আমার প্রতি স্নেহ বা মমতা দেখাইলে তাহা চিরকাল আমার হৃদয়ে আঁকা থাকিত। আমার দুর্ভাগ্য যে, লোকে তখন আমার এই বিষম স্বভাব বুঝিতে পারিত না।

এইরূপে আমার বয়স বাড়িতে লাগিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের পড়াতে আমার অশ্রদ্ধাও বাড়িল। স্কুলের শিক্ষক কোনমতে আমায় কিছু করিতে পারিতেন না; ক্লান্ত হইয়া মারধমক ছাড়িয়া দিলেন। অবশেষে অন্য কোন গতি না দেখিয়া তিনি পিতাকে আমার লেখা-পড়ার অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ এক পত্র লিখিলেন। পিতা উহা পড়িয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি আমাকে 'মেরে মেরে সোজা করিবেন' বলিয়া ঠিক করিলেন, আর আমাকে স্কুলে যাইতে না দিয়া একটা ঘরে

পুরিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন; মা, খুড়া, ও খুড়ী সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তাঁহারা আমার লেখাপড়া সম্বন্ধে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেও পিতার ঐরূপ কঠোর ব্যবহার, আমার অল্প বয়স ও নিঃসহায়তা দেখিয়া আমার প্রতি কুপিত না হইয়া বরং কৃপালু হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শিলেন যে, এক উপায় করিলে আমার মন বদলাতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার মামার বাড়ী হুগলী জেলায়; বাড়ীটী নগরের ভিতর ছিল না, উহার পাশে এক গ্রামে অবস্থিত। মামা সেখান হতে প্রতিদিন হুগলীতে চাকরী করিতে যাইতেন, আর সেই সঙ্গে তাঁহার ছেলেকে হুগলীর স্কুলে লইয়া যাইতেন। তিনি তাঁহার পুত্রের শিক্ষা-সম্বন্ধে নিজে সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেন ও বিশেষ যত্ন লইতেন। আমার গুরুজনেরা ভাবিলেন যে, আমি যদি পাড়াগাঁয়ে মামার বাড়ীতে থাকিয়া মামাত ভাইয়ের সঙ্গে লেখাপড়া করি, তাহা হইলে বিদ্যাশিক্ষায় আমার মন যাইতে পারে; আর মামা অতি ভদ্রলোক, তিনি আমাকে নিজ পুত্রের ন্যায় দেখিবেন ও অতিশয় যত্ন করিবেন। তাঁহারা সুবিধা বুঝিয়া পিতার নিকট ঐ মতলব পাড়িলেন। পিতা প্রথমে কোন মতে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহিলেন না, পরে সমস্ত ভাবিয়া শুনিয়া, আর আমি তাঁহার এক প্রধান জ্বালা হইয়াছি দেখিয়া, ঐরূপ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সময়ক্রমে আমিও ঐ প্রস্তাবের বিষয় শুনিলাম, আর অতি আহ্লাদের সঙ্গে নূতন জীবনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। পাড়াগাঁ, মামাত ভাই, গাছপালা, পুকুর ইত্যাদি নানাপ্রকার নূতন জিনিষ আমার মনে ঘুরিতে লাগিল। নিজের বাড়ী, আত্মীয়জন ত্যজিয়া দূরে বাস করিব বলিয়া কোনপ্রকার খেদ বা কষ্ট হয় নাই; কেবল রোগা মা ও খুড়ীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া এক একবার হৃদয় দমিয়া যাইতে লাগিল। যাহা হউক, নূতন দ্রব্যের দর্শনলালসা আমাকে গ্রাস করিয়া

রহিল, আমি সমস্ত বিচ্ছেদকষ্ট ভুলিয়া থাকিলাম। সব ঠিক হইলে আমি আমার নবম বৎসরে পাড়াগাঁয়ে মামার বাড়ী গেলাম।

মামার বাড়ীতে দুই বৎসর ছিলাম, সেই দুই বৎসর আমি যে কি সুখে ও আনন্দে কাটাইয়াছিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত। পাড়াগাঁ আমার পক্ষে তখন একেবারে নূতন ছিল, সকল দ্রব্যই আমার মিষ্ট লাগিত, কিছুতেই সেখানে ক্লান্ত হইতাম না। সেই সময়ে গ্রাম্য জীবনে আমার যে আসক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা এ জীবনে কখনও আমার অন্তর হতে দূর করিতে পারি নাই। মামা অতি দয়ালু ও বিবেচক ছিলেন, তিনি আমাদের পাঠে অবহেলা করিতে দিতেন না, তথাপি অধিক পড়াশুনা লইয়া আমাদের উপর কোন উৎপীড়ন করিতেন না। বশ্যতা বা নিয়মে থাকা আমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল না, তবুও তাঁহার নিকটে আমরা যে সময় পড়িতাম, সে সময় স্মরণে পড়িলে এখনও মনে আহ্লাদ হয়। তাঁহার কাছে অধিক শিখি নাই বটে, কিন্তু যাহা শিখিয়াছিলাম, তাহা বিনা কষ্টে শিখিয়াছিলাম, আর তাহা আজ পর্য্যন্তও ভুলি নাই।

অকৃত্রিম গ্রাম্য জীবনে আমি অমূল্য উপকার পাইয়াছিলাম। কলিকাতায় রাশি রাশি বাড়ীঘর ও লোকজনের মধ্যে থাকিয়াও আমি সঙ্কুচিতমনা ছিলাম, কেবল কল্পিত বা কৃত্রিম বিষয়ে নিরত থাকিতাম। যথার্থ স্বভাবের কোলে গিয়া বিশুদ্ধ নৈসর্গিক দ্রব্য দর্শনে পরম প্রীতি লভিলাম, আমার হৃদয় বিকশিত হইল, আমি যথার্থ জ্ঞান উপার্জ্জিতে লাগিলাম। আমার মন বন্ধুত্বসূত্রে প্রবণ হইল, আমি সমবয়স্কের প্রণয়-সুখ বুঝিলাম। কলিকাতায় সমপাঠীদের সঙ্গে আলাপ ছিল, কিন্তু সে পর্য্যন্ত কাহারও সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘটে নাই। অল্প দিনের মধ্যে নিজের ভাইবোন অপেক্ষা মামাত ভাইয়ের প্রতি আমার অধিক স্নেহ ও ভাল-বাসা জন্মিল।

পাগলের কথা।

আমার মামাত ভাই আমার সমবয়স্ক ছিল; তাহার শরীর পুষ্ট ও সবল, তাহার মন শান্ত ও সরল; তাহার হৃদয়ে কোন বিকার লক্ষিত হইত না। বাড়ীতে সকলে তাহাকে 'ভূতো' বলিয়া ডাকিত, আমিও তাহাকে ঐ নামে জানিতাম। আমরা এক সঙ্গে পড়িতাম, এক সঙ্গে খেলিতাম, আমাদের উভয়ের রুচি এক প্রকার ছিল। মামাদের বাড়ীতে আর কোন ছোট ছেলে ছিল না, আর আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে আমিই কেবল ছোট ছিলাম, এ জন্য দুজনেরই সমবয়স্ক বন্ধুর অভাব বোধ হইত। দিন কতক যাইতে না যাইতেই আমরা অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হইয়া পড়িলাম। আমাদের পৃথক্ করা কাহারও সাধ্য ছিল না, আমাদের পৃথক্ করা আর আমাদের বলি দেওয়া, সে সময়ে এক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! ভূতো আর হুঁতো আমরা দুজনে সদাসর্ব্বদা মাণিক-জোড় হইয়া থাকিতাম। দুজনেই ভাল কথার দাস, দুজনেই অত্যাচারে অসহিষ্ণু; সকল বিষয়েই আমাদের মিল ছিল। আমাদের পড়াশুনার সময় সে বা কখন আমায় কিছু দেখাইয়া দিত, কখন বা আমি তাহাকে কিছু বলিয়া দিতাম; আমাদের খেলাধূলায় সে বা কখন আমায় নূতন খেলা দেখাইত, কখন বা আমি নূতন ক্রীড়ার কথা তুলিতাম। এই-রূপে অল্প কালের মধ্যে আমাদের মিল ও বন্ধুতা এমন দৃঢ় হইয়া উঠিল যে, আমরা একেবারে অভিন্নহৃদয় হইয়া গেলাম। আমাদের দুই বৎসরের বন্ধুতাকালে আমরা অনেকবার মারামারি করিয়াছিলাম, তাহা স্বীকার করিতেছি; কিন্তু আমাদের ঝগড়া কখন দশ মিনিটের অধিক থাকিত না, কখন আমাদের ছাড়াছাড়ি করাইবার আবশ্যক হয় নাই; আর আমরা কখন বিবাদ মনে করিয়া রাখিতাম না ও কখন পরস্পরের ঈর্ষায় বা অনিষ্টে প্রবৃত্ত হইতাম না।

আমরা এক সঙ্গে হুগলির স্কুলে পড়িতে যেতাম। মামা কাজ হতে

মামার বাড়ী।

বাড়ী আসিবার পর আমাদের লেখাপড়ার সংবাদ লইতেন, আর সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়া জিজ্ঞাসিতেন বা বলিয়া দিতেন। কলিকাতায় আমার বিদ্যাশিক্ষার অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। এখানে যদিও নূতন দৃশ্য, নূতন জীবন, নূতন বন্ধুতার আস্বাদে মগ্ন ছিলাম, তবুও পাঠ্য পুস্তকের প্রতি আমার তেমন বিদ্বেষ জন্মায় নাই, আর আমার প্রকৃতি অতিশয় শান্ত ভাব ধরিয়াছিল, সেজন্য অল্প অল্প লেখাপড়া শিখিতাম, কখনই তাহাতে সম্পূর্ণ অবহেলা করিতাম না। বুদ্ধিমান্ মামা পড়াশুনা লইয়া আমাদের অধিক জ্বালাতন করিতেন না, আমরা যাহাতে ভাল ও প্রসন্ন থাকি, তাহার জন্য সযত্ন ছিলেন। তিনি আমাদের বেশী বকিতেন না, কখন মারিতেন না, বা কর্কশভাবে ব্যবহার করিতেন না; তথাপি তাঁহার কি এক গুণ ছিল যে, তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই আমরা অম্লান বদনে শুনিতাম।

আমরা পড়াশুনার অপেক্ষা খেলাধূলায় অধিক মন দিতাম। কলিকাতায় সেই এক বাড়ীর ভিতর বদ্ধ থাকিতাম, মামার বাড়ী আসিয়া যেন বাঁধা গরু ছাড়া পেলাম। আর গাছপালা, পুকুর, মাঠেতেই আমার মন ঘুরিত, কি করিয়া বই শ্লেটে মন সংযত করিয়া রাখিব? স্কুল হতে বাড়ী আসিবার পর জলখাবার খাওয়া হলেই আমরা দুজনে কোদাল ঘাড়ে করিয়া বাড়ীর বাগানে বাহির হতাম। আবশ্যক হউক আর নাই হউক, যেখানে সুবিধা দেখিতাম বা যেখানে আমাদের খ্যাল যাইত, সেখানে আমরা কোদলাইতাম। কত দিন আমরা বাজি রাখিয়া মাটী খুঁড়িতাম; এমন কি কখন কখন মাথার ঘাম পায়ে পড়িত, সমস্ত শরীর হতে আগুন ছুটিত, তবুও আমরা ক্লান্ত হতাম না। কতদিন আমরা গাছে উঠিয়া আম খেতাম, আর অতি টক আমগুলি কেমন মিষ্ট লাগিত! কখন বা বাঁদরের মত বড় বড় গাছে

উঠিয়া এডাল ওডাল করিয়া বেড়াতাম, আর কতবার আছাড় খেতাম, সে আছাড়গুলিও কেমন মিষ্ট লাগিত! কতদিন আমরা দুজনে বাহুর ভিতর বাহু দিয়া পুকুরের চারধারে ফুল তুলিয়া ও গন্ধ শুঁকিয়া বেড়াতাম। কখন বা পুকুরের ধারে ঘাসের উপর বসিয়া কবিতা পড়িতাম; সে ক্লান্ত হইলে আমি পড়িতাম, আমি ক্লান্ত হইলে সে পড়িত। কত রবিবার ও ছুটীর দিনে আমরা দুজনে পুকুরের জলের মধ্যে এক ঘণ্টা ধরিয়া ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টি করিতাম। আমি সাঁতার জানিতাম না, সে আমায় সাঁতার শিখাবার জন্য কত প্রয়াস পাইত; কিন্তু আমি ক্রমাগত বিফল হইতাম, কতবার ডুবুডুবু হইয়া যেতাম, আর সে আমাকে ধরিয়া তুলিত। কতদিন বসন্তকালের রাতে—আকাশে চাঁদ ঝকিতেছে, মৃদুমধুর বাতাস বহিতেছে, চারদিকে ফুল ফুটিয়া আমোদিতেছে—আর আমরা দুজনে পরস্পর গলা জড়াইয়া সুকুমার স্বরে গান গাইতাম। আর তখনকার কি সরল হাসি, কি মধুর আলাপ, কি বিশুদ্ধ আমোদ, কি প্রফুল্ল বদন, কি অকপট হৃদয়, কি নির্ম্মল প্রেম!

এমন শান্ত জীবনে আমার স্বভাব অতিশয় শান্ত হইয়া আসিয়াছিল। আমার চরিত্রের প্রচণ্ডতা অন্তর্হিত হইল, আমার হৃদয় প্রশান্তভাব ধরিল, আমি উগ্রমূর্ত্তি ত্যজিয়া ধীরতা অবলম্বিলাম। দুই বৎসরের মধ্যে একবারও ক্রোধে অবশ হই নাই, একবারও কোন দুর্দ্দান্ত রিপু আমাকে অধীন করে নাই। মানুষ, প্রকৃতি সকলই প্রসন্ন দেখিতাম, আমিও সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিতাম। আমার কোমল, স্নেহময়, শান্ত মনবৃত্তিগুলি বিকশিতে লাগিল; প্রকৃতির শোভা ও মাহাত্ম্য দেখিয়া আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল। বন্ধুতার পবিত্র প্রভাবে আমার উদ্ধত প্রবৃত্তিগুলি বিনম্র হইয়া আসিল। আমি ভালবাসা, মমতা,

স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই জানিতাম না। অতুল সুখ ও শান্তিতে বাস করিতে লাগিলাম। আমি যেন মর্ত্তে স্বর্গ পেলাম।

কিন্তু চাঁদেও কলঙ্ক আছে। ঐ দুই বৎসরের মধ্যে কেবল একবার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল; ঐরূপ সুখের মধ্যে থাকিয়াও সকলের প্রথম যথার্থ মানসিক ক্ষোভ পাইয়াছিলাম। পাঠক! তোমাকে ঐ সম্বন্ধে সবিশেষ বলিতেছি, আমার বৃত্তান্ত পড়িয়া ছেলেমানুষী বলিয়া হাসিও না বা উড়াইয়া দিও না। তোমায় সকলই মুক্তকণ্ঠে বলিব, আর আমার চরিত্র যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে আমার অন্তরের ভাবের মূল, গতি ও পরিণাম সমস্তই জানা বিধেয়। এইজন্য আমার ঐ সময়ের একমাত্র দুঃখের কারণ, আমার ভগ্নাশার ইতিহাস বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শুন।

মামার বাড়ীর চারদিকে এক উত্তম বাগান ছিল; বাড়ীর পিছনে পুকুর আর সুমুখে নানা প্রকার ফল ফুলের গাছ, ফুলের কেয়ারী ইত্যাদি। গাছপালায় মামার বড় সক্ দেখিতে পেতাম, তিনি যখনই অবকাশ পেতেন, বাগানের চারদিকে ঘুরিয়া বেড়াতেন, আর এ গাছটা সে গাছটা নাড়িয়া দেখিতেন। এখানে কামিনীর পাতা গজাইতেছে কি না, ওখানে আমের কলমে জল দেওয়া হইয়াছে কি না—এ সকল বিষয়ে মালীর নিকট হতে সমস্ত সংবাদ লইতেন, আর নিজেও গাছ পুঁতিতে ও ফুলের কেয়ারী করিতে বড় ভালবাসিতেন। আমরা দুজনে একলা বেড়াতে পছন্দ করিতাম, কিন্তু কখন কখন সন্ধ্যার সময় মামার সঙ্গে বাগান ঘুরিতাম, আর তিনিও আমাদের তাড়াতেন না, বরং সময়ে সময়ে আমাদের লইয়া গল্পালাপ করিতেন। আমরাও তাঁহার গাছ-পোতা দেখিতে বড় ভালবাসিতাম, আর গাছপালা সম্বন্ধে তাঁহাকে দুচারটা কথা জিজ্ঞাসিতে সাহস করিতাম।

বাড়ীর সুমুখে একদিকে এক ঘাসাল চৌকোণ ছিল, মামা সেই-টীকে নিজের বিলাস-ভূমি করিয়াছিলেন। সেখানে বসিয়া বিশ্রাম লইতেন, কাজ হইতে আসিয়া হুঁকা টানিতেন ও বড় আরাম পেতেন। বাস্তবিক সকল দিকেই উহা বড় আরামের স্থান ছিল, কিন্তু কেবল একটা খুঁত্ দেখা যাইত। চারদিকে কিছু দূরে বড় বড় গাছ থাকাতেও বিকালবেলা ঐ চৌকোণের একদিকে রৌদ্র পড়িত আর মামার চোকে সেই রৌদ্র বড় লাগিত। তিনি এই দোষের নিরাকরণের নিমিত্ত চৌকোণের পাশে সূর্য্যের দিকে এক বড় বাদামের গাছ পুতিলেন। তিনি যেদিন উহা পুতেন—আমরা দুজনে কাছে দাঁড়াইয়াছিলাম, মালী গর্ত্ত করিল, মামা গাছ ধরিয়া রইলেন, মালী মাটী ভরিয়া দিল—আমরা অতি মনোযোগের সঙ্গে সব দেখিলাম। সেইদিন হতে গাছ পুতিতে আমাদের অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিল, আমরা যেখানে পেতাম সেখান থেকে চারাগাছ লইয়া পুকুরধারে পুতিতাম। কিন্তু সেই চৌকোণের কাছে এক গোলাপগাছ পুতিতে বড় সক্ গেল। মামা কিছু বলেন, সেই আশঙ্কায় আমরা বাদামগাছের কিছু দূরে এক গোলাপের চারা রোপিলাম। মালীর নিকট হতে পাকেপ্রকারে গোলাপটী লইয়া আমরা দুজনে হাতাহাতি করিয়া, যেন যুদ্ধের সময় শত্রুর শিবিরে বিজয়পতাকা সন্নিবেশিতে যাইতেছি, সেইমত মহা উল্লাস ও ঘটার সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাছটী নামাইলাম। একবার ভূতো গাছটা ধরিল, একবার আমি ধরিলাম; একবার সে মাটী খুঁড়িল, একবার আমি খুঁড়িলাম; এইরূপে গর্ত্ত বুজাইয়া ও জল দিয়া আমাদের সুখতরু রোপিলাম। আমরা রোজ পুকুর থেকে ঘটী করিয়া জল আনিয়া গোলাপের তলে ঢালিতাম, আর জল দাঁড়াবার জন্য গোড়ার চারদিকে এক সরু গর্ত্ত কাটিলাম। জল দেওয়া শেষ হইলে

আমরা কতকক্ষণ চুপ করিয়া পাশে বসিয়া—কোন্ পাতা গজাইতেছে, কোন্ ডালটা কত বাড়িল, কোথায় কুঁড়ি বেরুতেছে—দেখিতাম; আর আমাদের পরিশ্রমের ফল গোলাপের ফুল শীঘ্রই দেখিব বলিয়া আহ্লাদের সীমা রহিল না।

দিনকতক পরে আমরা জল দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, সেই পুকুর থেকে জল টানিতে প্রাণ বেরিয়া যাইত। মামাও আমরা রোজ বাগানে অনেক সময় নষ্ট করি দেখিয়া অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু তিনি তখনও আমাদের বিদ্যা জানিতে পারেন নাই। অধিক দিন অন্তর গোলাপ গাছে জল দিতাম; তখনও বৃষ্টি আরম্ভে নাই, রৌদ্রে আমাদের গোলাপ একটু একটু শুকিয়া যাইতে লাগিল। আমাদের নিজের রোপিত তরু বিনাশ পাইবে, এই শঙ্কায় বড় আকুল হইলাম, আমাদের গোলাপ বিনা জলে মরিয়া যাবে বলিয়া প্রাণে বড় ব্যথা লাগিত। সমস্ত লেখাপড়া ত্যজিয়া সেই গোলাপের বিষয় ভাবিতাম ও কি উপায়ে উহাকে বাঁচাই, তাহাই নিরন্তর কল্পিতে থাকিলাম। অভাব হলে উপায়ও যুটে; অনেক ভাবিতে ভাবিতে এক কৌশল ঠিক করিলাম। মামা তাঁহার বাদাম গাছে প্রায় রোজ অনেক জল দিতেন, আর উহার গোড়ার চারদিকে এক গভীর গর্ত্ত কাটিয়াছিলেন। আমরা বাদাম গাছ হতে আমাদের গোলাপ পর্য্যন্ত মাটীর নীচে এক গুপ্ত পয়নালা গড়িবার পরামর্শ করিলাম। অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে তাহা নির্ম্মাইলাম, কিন্তু বিশেষ সফল হইলাম না। জলপথে মাটী পড়িয়া বা পয়নালার মুখে ঢিল আটকিয়া সব বুজিয়া যাইত, আর ভাল গড়ানে হয় নাই বলিয়া অল্পই জল আসিত। কিছুদিন পরে আমাদের সব কলবল নিরর্থক হইয়া গেল।

অবশেষে ভাবিয়া ভাবিয়া এক নূতন উপায় অবলম্বিলাম।

বাড়ীতে এক প্রকাণ্ড পুরাণ বাক্স ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া সেই তক্তা দিয়া পুনর্ব্বার আমাদের খাল নির্ম্মাইলাম। তলায় বরাবর কাট পাতিলাম, আর দুধারে কাট দাঁড় করাইয়া ও তাহাদের উপরভাগ এক সঙ্গে যোগ করিয়া ত্রিকোণের আকারে এক নূতন গুপ্ত পয়নালা তয়ের করিলাম। বাদাম গাছের ও আমাদের গোলাপের গোড়ার দিকে দুই মুখে ছোট ছোট কাটী দিয়া ঝাঁঝরি করিয়া দিলাম, তাহাতে কোন ঢিল বা পাতা পয়নালার ভিতর ঢুকিতে পারিত না। এই প্রণালী গড়িতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল, আর অতি অল্প সময়ের মধ্যে লুকিয়া লুকিয়া উহা প্রস্তুত করিতাম। পরিশ্রমের কাছে কিছুই আট্‌কায় না; একটু একটু করিয়া আমাদের পয়নালা শেষ হইল। যাহাতে কেহ আমাদের বিদ্যা না জানিতে পারে, এজন্য যথেষ্ট যত্ন লইলাম, উপরে বেশ করিয়া মাটী ঢালিয়া দিলাম, আর ঘাস বিছাইয়া সব একেবারে বেমালুম করিয়া রাখিলাম। মামার বাদাম গাছ হতে আমাদের গোলাপ চারা পর্য্যন্ত পয়নালা সম্পুর্ণ হইল। আমরা মহা উদ্বেগ ও আশার সঙ্গে বাদাম গাছে মামার জল দিবার সময় প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

মামা জল দিতে আসিলেন; আমরাও সেই সঙ্গে আসিয়া আমাদের গাছ ঢাকিবার জন্য উহা আড়াল করিয়া দাঁড়ালাম। এক ঘটী জল ফেলিতে না ফেলিতেই সব আমাদের গোলাপের তলায় গড়াইয়া গেল। এই দেখিয়া আমরা আহ্লাদে একেবারে বুদ্ধি হারালাম। মনের হর্ষ আর দমিয়া রাখিতে পারিলাম না; হো হো শব্দে চেঁচিয়া উঠিলাম। সর্ব্বনাশ আর কি! মামা তাঁহার বাদাম গাছ অত শীঘ্র জল শুষিয়া লইল দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুই বাঁদরের চীৎকার শুনিয়া চার দকে চাহিয়া দেখিলেন। দুইটা গাছের

গোড়ায় এক সময়ে জল যাইতেছে অথচ আমাদের গোলাপে কেহই জল দিতেছে না দেখিয়া মামা তাক্ হইয়া গেলেন। আবার চারদিকে তাকাইলেন। অবশেষে আমাদের বুদ্ধির দৌড় বুঝিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি একখানা মস্ত কুড়ুল লইয়া আসিয়া মাটীতে এক কোপ মারিলেন, আমাদের পয়নালার তক্তা চৌচাক্লা হইয়া ছট্‌কিয়া পড়িল। তিনি—হুঁ পয়নালা, হুঁ পয়নালা—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, আর চারিদিকে মারাত্মক আঘাত করিলেন। প্রত্যেক আঘাত আমাদের বুকে বাজিল। আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ও কৌশলের ফল এক দণ্ডের মধ্যে বিনাশ পাইল। মামা আমাদের গোলাপটী পর্য্যন্তও উপ্‌ড়াইয়া ফেলিলেন! ঐ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনের কথা মনে করিলে এখনও যেন আমার এই প্রৌঢ় অন্তরে সেই নির্ম্মম কুড়ুলের ঘা ঝন্‌ঝনিতে থাকে। আমাদের অত আদরের জিনিষ, অত যত্নের ধন, অত ভালবাসার সামগ্রী, এতদিন যাহাকে অতি পরিশ্রমের সঙ্গে পালিয়াছিলাম, এত আগ্রহের সঙ্গে যাহার সেবা করিতাম—আজ সেই নিজের হাতে রোপিত আমাদের সুখতরু গোলাপ-চারা ভগ্নমূল হইল! এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে পয়নালা, সে তক্তা, সে ঝাঁঝরি—সব বিনাশ পাইল; সেই সঙ্গে যেন আমারও সকল আশা, সকল ভরসা, লোপ পাইল!

জীবনে আমি এই প্রথম ভগ্নাশ হইলাম, আমার সুখে এই প্রথম কাঁটা বিঁধিল। মনে অতিশয় ব্যথা পাইয়াছিলাম, কিন্তু মামা যদি আমাকে ভর্ৎসনা বা প্রহার করিতেন, তাহা হইলে যে আরও কত কষ্ট পেতাম, তার ঠিকানা নাই। যাহা হউক, মামা আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন ও অতি সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি যে মনঃপীড়া দিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে ভুলিয়া গেলাম ও অনেক প্রবোধ দিয়া মনকে শান্ত করিলাম।

আমি বৎসরের অধিক ভাগ মামার বাড়ীতে থাকিতাম, কেবল ছুটীর সময় কলিকাতায় আসিতাম। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর চলিয়া গেল। হঠাৎ শুনিলাম যে, মার বড় ব্যারাম হইয়াছে, আমাকে শীঘ্র কলিকাতায় যাইবার নিমিত্ত পিতা মামাকে এক পত্র লিখিয়াছেন। এই সংবাদে মনে অতিশয় ক্লেশ বোধ হইল। জন্মিয়া অবধি মাকে এক দণ্ড সুস্থ ও সুখী দেখিতে পাই নাই, এইবার বা তাঁহাকে একেবারে হারাই, এইরূপ নানা চিন্তা আসিয়া আমার হৃদয়কে যার পর নাই আকুল করিয়া তুলিল। এত দিন মামার কাছে ছিলাম, এজন্য আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ জন্মিয়াছিল; কিন্তু তিনি কি করিবেন—নাচার, অতি কষ্টে আমায় বিদায় দিতে প্রস্তুত হইলেন। আমিও অতি কষ্টে মামার বাড়ীর সকলের নিকট বিদায় লইয়া হুগলি ছাড়িলাম।

আমার প্রথম ও একমাত্র সুখের স্থান—তোমায় বিদায়। আমার শান্তির ধাম, প্রথম প্রণয়ের আবাস, বিশুদ্ধ আনন্দের ভবন, নির্ম্মল আমোদের আকর, পবিত্র জীবনের আলয়—তোমায় বিদায়। আমার বাল্যখেলা, আমার বন্ধুক্রীড়া, আমার প্রকৃতি সহবাস—সকলকেই বিদায়। মামা! একবার যদিও তুমি এই বাল্য হৃদয়ে আঘাত দিয়াছিলে, কিন্তু তোমার স্নেহ, তোমার অমায়িকতা, তোমার বিবেকতা, ইহজন্মে কখন ভুলিব না—তোমাকে বিদায়। মামী! তোমার মিষ্ট পিঠা, তোমার স্নেহময় হাসি, তোমার মধুর বচন—সকলকেই এখন বিদায়। ভুতো! এত দিনের পরে তোর হুঁতো তোকে ছাড়িয়া চলিল। প্রথম প্রণয়ের আস্বাদ, বাল্য হৃদয়ের মিলন কি সুখকর! আবার প্রথম বিচ্ছেদ কি কষ্টকর! এইবার আমরা পৃথক্ হইয়া চলিলাম। এতদিন আমরা এক-মন, একপ্রাণ, একশরীরও প্রায় ছিলাম, এইবার আমরা বিভিন্ন হইলাম; আমাদের মন প্রাণও কি এইবার বিভিন্ন হইল? আমরা সেই বাগানে

চাঁদের আলোতে বসিয়া দুজনে এক সুরে যে গান গাইতাম, সে গান চিরদিন আমার কানে ধ্বনিতেছে—'এদিন রবে না'......। সে গানের যে দুই সুর আছে, তাহা তখন জানিতাম না। ভূতো! তবে এখন বিদায়!!

তৃতীয় অধ্যায়।

যমদূত শিক্ষক।

কলিকাতায় বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, মার ভয়ানক ব্যারাম হইয়াছে, তিনি বিছানায় পড়িয়া আছেন, তাঁহার নড়নচড়নের শক্তি পর্য্যন্তও নাই। তিনি দশ দিন জ্বরে ভুগিতেছেন, এইবার বিকার উপস্থিত; ডাক্তার, কবিরাজ—অনেক চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিয়াছেন, কিন্তু কেহই ভাল করিতে পারেন নাই, আর কোন ক্রমে রোগের উপশমও হইতেছে না। পিতা ও খুড়ার সঙ্গে দুচারটা কথা কহিয়া আমি মার ঘরে গেলাম। কোথায় অনেক দিন পরে মাকে দেখিব বলিয়া কত আহ্লাদ করিয়াছিলাম, তাঁহাকে আমাদের পাড়াগাঁর দৌরাত্ম্যের কথা ও অন্য কত কি বিষয় জানাব, তাঁহার কাছে বসিয়া মনপ্রাণ ঢালিয়া দিব, ও তাঁহার স্নেহপূর্ণ অমৃতবাক্য পান করিব ভাবিয়াছিলাম; কোথায় তিনি আমাকে—বাবা এসেছ, বাবা এসেছ—বলিয়া আদর করিবেন; কোথায় তিনি আমাকে কোলে বসাইয়া আমার গালে চুমা খাবেন—কিন্তু কি দুঃখময়, মর্ম্মভেদী, কল্পনার অগোচর দৃশ্য দেখিলাম! উঃ আমরা বাল্যকাল থেকেই এই সংসারের প্রচণ্ড ঝড়ে আলোড়িতে থাকি; ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই মার দুধের সঙ্গে ভগ্নাশার আস্বাদে অভ্যস্ত হই!

দেখি, মা একেবারে বাক্‌শূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন—নীরব ও নিস্পন্দ। কেবল তাঁর দুই চোকের তারা নড়িতেছে, নচেৎ তাঁহাকে জীবনশূন্য নির্দ্ধারিতাম। মার এক মাসী তাঁহার পাশে বসিয়া সেবা

করিতেছেন, চারিদিকে ওষুধের শিশি ও ওষুধের গন্ধ। সব নিস্তব্ধ ও নিশ্চল, মধ্যে মধ্যে কেবল নিশ্বাসত্যাগের শব্দ কানে যাইতেছে। এরূপ ভয়াবহ দৃশ্য পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। সহসা আমার অন্তরে এক উচ্চণ্ড আঘাত লাগিল, আমি বিমূঢ় হইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে মার যন্ত্রণা ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া গেলাম। তিনি কিছুই প্রকাশিতে পারিতেছেন না দেখিয়া, আমার হৃদয়ের কষ্ট দুগুণ বাড়িল। কিরূপে তাঁর ক্লেশের লাঘব করিতে পারি, কি উপায়ে তাঁর উদ্ধারসাধনা হয় তাহাই চিন্তিতে লাগিলাম। মন থেকে অন্য সকল চিন্তা ও ভাবনা দূর করিলাম; ভুতো, মামার বাড়ী, পাড়াগাঁ, গাছপালা সব ভুলিয়া গেলাম; কেবল মা! মা! ইহাই অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে বাজিতে লাগিল। তিনিই আমার একমাত্র চিন্তার সামগ্রী হইলেন। আহার করিতে গেলাম, কিন্তু গলা শুকাইয়া আসিল, কোন বস্তুই প্রবেশিল না। খাবার সময় মা আমার কাছে বসিয়া কথা কহিতেন, আহারের নামেই যে মার স্নেহময় মুখ মনে পড়িত, আজ তাঁহাকে সুমুখে না দেখিয়া সমস্ত শূন্য বোধ হইল। আবার যখন খুড়ী বলিলেন, মার বাক্যরোধ হবার পূর্ব্বে "হুঁ তোকে দেখ্‌তে পেলাম না" বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, তখন আর আমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে দমিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, দর দর করিয়া আমার দুই চোক থেকে জল পড়িতে লাগিল। এত দিনে, মা কি মিষ্ট সামগ্রী, মার ভালবাসা কি অপরূপ বস্তু, তাহা বুঝিলাম।

মার রোগের উপশম আর হয় না; পিতা উত্তম উত্তম চিকিৎসক দ্বারা দেখাতে ও যত্ন লইতে কোন ত্রুটি করেন নাই, তথাপি মার ব্যারাম কোন ক্রমে কমিয়া আসিল না। আমি প্রায় সমস্ত দিন মার শিয়রে বসিয়া যাহা পারিতাম, যথাসাধ্য তাঁহার সেবা করিতাম। বরফ কাটিয়া তাঁর মুখে দিতাম, মাথায় ঠাণ্ডা জল সিঁচিতাম, তাঁর গায়ে হাত বুলাতাম;

আর তিনি যদি একবার আমার দিকে চোক ফিরাতেন, তাহা হলেই আমার দেহে প্রাণ আসিত, আমি যেন আবার সজীব হইতাম। এইরূপে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। পিতা অতিশয় কাতর ও চিন্তাকুল, ভাইবোনেরা মাকে দেখিতে আসিলেন; আমার পড়াশুনা সব বন্ধ, আমি মার সেবাতেই রত থাকিলাম। ক্রমে মার রোগের চূড়ান্ত হইল। মহা সঙ্কট উপস্থিত। সকলেই তাঁহার আশা ত্যজিলেন। বাড়ীতে ঘন ঘন ডাক্তার ও ওষুধ আসিল, আমরা সকলে পাগলের ন্যায় মার ঘরের আশপাশে ঘুরিয়া বেড়াতে লাগিলাম। কিন্তু কি সৌভাগ্য! কি ঈশ্বরের ইচ্ছা! কুড়ি দিনের দিন ব্যারাম একটু কম পড়িল। আমরা আহ্লাদে উথলিয়া উঠিলাম; এ যাত্রা মা পরিত্রাণ পাইলেন বলিয়া আমাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। ক্রমে যতদিন চলিয়া গেল অল্পে অল্পে মার রোগের হ্রাস হইতে লাগিল। এক মাস পরে মা অনেকটা ভাল হইয়া উঠিলেন ও কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই ভাবিয়া আমরা শান্ত ও সুস্থির হইলাম।

মা প্রায় আরোগ্য লভিলেন, বাড়ীর গোলমাল কমিতে লাগিল, উপরি লোকজন চলিয়া গেল, এমন সময়ে এক দিন পিতা আমাকে ডাকিয়া পাঠালেন। আমি সশঙ্কে তাঁহার নিকট উপস্থিত হলাম। দেখি, তিনি আমার পাঠ্য পুস্তকগুলি হাতে করিয়া আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। পিতার সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল না, এজন্য অতি ভয়ে ভয়ে আড়ষ্টভাবে তাঁহার পাশে গিয়া বসিলাম। তাঁহার হাতে বই দেখিয়াই আমার রক্ত শুকিয়া গিয়াছিল। মামার বাড়ীতে বিদ্যা শিক্ষা লইয়া অধিক মাথা ব্যথা করিতাম না, আর বাড়ীতে আসিয়া অবধি এ বিষয়ের কোন চর্চ্চা হয় নাই, বিশেষ মার ব্যারামে, মাথায় যাহা কিছু ছিল, তাহা

সবই প্রায় বেরিয়া গিয়াছিল। আমি ত্রস্তভাবে শিরে বজ্রাঘাতের আশঙ্কায় পিতার কাছে বসিয়া রহিলাম। তিনি গুটিকতক প্রশ্নের পর আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বুঝিতে পারিলেন। কিছুক্ষণের পর অতি কর্কশভাবে —এত দিন কেবল খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছ, লেখা পড়ায় একেবারে ঘন্টা, আমার বিষভক্ষক ছেলে—এই কয়েকটী কথা বলিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। তাঁহার অত বলিবারও আবশ্যক ছিল না; তাঁহার মুখ দেখিয়াই আমার অন্তর্পিত্তি বাহির হইয়া গিয়াছিল।

পরে খুড়ার নিকট শুনিলাম যে পিতা আমার উপর ভয়ানক চটিয়াছেন, আর মার রুগ্ন অবস্থা না হইলে তিনি আমাকে উত্তম মধ্যম প্রহার দিতেন। পিতা একে উদাসীনের ন্যায় ছিলেন, কেবল নিজের কাজ বুঝিতেন ও টাকা উপার্জ্জিতেন, তাহার পর আবার মার উৎকট পীড়া—ভাবনা চিন্তায় অস্থির হইয়াছিলেন। এমন অশুভ সময়ে ছুঁতোরামের বিদ্যা প্রকাশ পাইল। পিতার কুপিত হওয়াতে আমি কোন দোষ দিই নাই। পিতা ঠিক করিলেন, পর বৎসর থেকে আমি আবার সেই আগেকার স্কুলে যাইব, কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়াই পড়াশুনা করিব, আর তিনি আমার জন্য এক ঘরের শিক্ষক নিযুক্ত করিবেন।

আবার সেই স্কুলে যাইতে আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। আমার পূর্ব্বেকার সমপাঠীরা কত আগিয়া গিয়াছে, হয় ত আমাকে দেখিলে ধিক্কার দিবে, আর সেই পুরাণ শিক্ষকদের হাতে পড়িব—এইরূপ বিষাদের ভাবনা আমার মনে উপস্থিত হইল। কিন্তু কি করিব, পিতার ইচ্ছা কে লঙ্ঘিতে পারে? সৌভাগ্যক্রমে পূর্ব্বে যে শ্রেণীতে পড়িতাম, তাহার পরের পর শ্রেণীতে পুরাণ সমপাঠীদের সঙ্গেই পড়িতে লাগিলাম। তাহারা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিল, তখনকার শিক্ষককেও প্রচণ্ড বলিয়া বোধ হইল না। এদিকে আমাকে

বাড়ীতে পড়া দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত একজন শিক্ষক নিয়মিতরূপে আসিতে লাগিলেন। বাড়ীতে নূতন শিক্ষক, স্কুলে নূতন শিক্ষক, ও নূতন শ্রেণী, নূতন পুস্তক ও নূতন বৎসর, আর মাও বেশ সুস্থ ও সবল হইয়া আসিলেন—এই সকল কারণে আমি পরম সুখ ও আনন্দ অনুভবিলাম। মনে নানাপ্রকার কল্পনা ও আশা সঞ্চারিল। ভাবিলাম এইবার অতিশয় যত্ন ও আগ্রহের সঙ্গে লেখাপড়া শিখিব, ঘরের শিক্ষকের নিকট তাড়াতাড়ি স্কুলের বই শেষ করিয়া অপর নূতন বই পড়িব আর এইরূপে আমার সব সমপাঠীদের উপরে উঠিব। ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া খুড়ার সঙ্গে ইংরেজী কথা ঝাড়িব; মা, খুড়ী ও দিদিদের কাছে ইংরেজী ফলাইয়া তাঁদের একেবারে তাক্ লাগাইয়া দিব; আর চাকর চাকরাণীদের ইংরেজীতে ফরমাজ্ দিয়া তাদের আক্কেলগুড়ুম করিব—এই সকল হর্ষের চিন্তায় আমি ডুবিয়া রহিলাম।

মাস কয়েক কাটিয়া গেল; বাড়ীর সব সংবাদ ভাল, আর কোনদিকে গোলযোগ নাই; আমিও ধীরভাবে বিদ্যা শিখিতে লাগিলাম। কিন্তু যতদিন গেল, ঘরের শিক্ষক তত অল্প অল্প করিয়া আমার প্রতি ক্রূরভাব ধরিলেন। প্রথম প্রথম তিনি সযত্নে আমাকে স্কুলের পড়া বলিয়া দিতেন ও আমার শিক্ষায় বিশেষ আস্থা লইতেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহার সে যত্ন শিথিল হইয়া আসিল, আর তিনি অল্পেতেই আমার উপর চটিয়া যেতেন। আমার পড়া মুখস্থ করিতে বিলম্ব হলে, কি ভাল না অভ্যাসিলে আমাকে অত্যন্ত বকিতেন ও কখন কখন মারিতেন। আমিও ঐ সময় থেকে তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিখাকে নমস্কার করিলাম ও আপাতত জ্ঞানলাভকে বিদায় দিলাম।

ক্রমে তাঁহার ক্রূর স্বভাব অধিক পরিস্ফুট হইতে লাগিল, আমার কোন বিষয়ে অল্প ব্যতয় ঘটিলে তিনি আমাকে প্রহার দিতে আরম্ভি-

লেন। আমি ভয়ে কাহারও নিকট এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতাম না, নীরবে তাঁহার উৎপীড়ন সহিতাম, তাঁহার ত্রাসে আমি জড়সড় হইয়া থাকিতাম। ওদিকে তিনি যে পরিমাণে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেন, সেই পরিমাণে আমারও বিদ্যা বুদ্ধির লোপ পাইতে লাগিল। প্রহার বা ভর্ৎসনা আমি কাহারও নিকট সহিতে পারিতাম না, তাহাতে আবার একজন অপর ব্যক্তি সামান্য লেখাপড়া লইয়া আমার উপর ঐরূপ অত্যাচার করিতেছে; আর আমি দুর্ব্বল, অক্ষম বালক একজন বয়স্‌প্রাপ্ত বলবান লোকের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছি না—এই ভাবনায় যারপরনাই ক্লেশ পেলাম ও নিজেকে নিঃসহায় দেখিয়া অন্তরের দুঃখ অন্তরেই রাখিলাম। ঠুস্‌কিমারা, চিম্‌টানি, অঙ্গুষ্টিপণী, রুল ও বেতের ঘা, চাপড়, কিল, ঘুষা কিছুই আমার শিক্ষক বাদ দিতেন না। তিনি যত বাড়াবাড়ি করিতে লাগিলেন, আমি ততই জড়ভরতের মত হইয়া গেলাম। তাঁর ভয়ে দিবারাত্র কাঁপিতাম, রাত্রে ভাল ঘুমাতাম না আর তাঁর আসিবার সময় উপস্থিত হইলে আমার রক্ত শুকিয়া যাইত। ঈশ্বর জানেন তিনি মদ পীতেন কি না, কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহার চোক লাল ও মুখ কর্কশ দেখিতাম। তিনি একেবারে সাক্ষাৎ যমদূত ছিলেন। একদিন ইংরেজী 'দো' কথা বানান করিতে পারি নাই বলিয়া তিনি আমাকে এক প্রকাণ্ড ইংরেজী অভিধান বাঁ হাতে দিয়া ক্রমাগত দুই ঘণ্টা দাঁড় করিয়া রাখিলেন। পুস্তকখানি আমার মাথার কাছে বাঁ হাতের উপর টল্ টল্ করিতেছিল, একটু ফস্‌কালেই মাথা গুঁড়া হইয়া যাইত! একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার আসিবার পর হঠাৎ ঘুমে একটু ঢুলিয়াছিলাম; তৎক্ষণাৎ তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আমাকে এমনি মারিলেন যে আমি ঘুরিয়া মেজেতে পড়িয়া গেলাম ও এক চৌকাটের উপর ঠেকিয়া আমার কপাল

কাটিয়া গেল। সে কপালের দাগ আমার এখনও রহিয়াছে; যখন আর্শীতে মুখ দেখি সেই মহামহিম শিক্ষককে ধন্যবাদ দিই।

ঐরূপ ক্রূর ব্যবহারের স্বাভাবিক ফল ফলিল। লেখাপড়ায় আমার সম্পূর্ণ অভক্তি জন্মিল। পূর্ব্বে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা পর্য্যন্তও বৎসর খানেকের মধ্যে আমার মন থেকে অপসরিতে লাগিল। আমার স্বভাবে অত্যন্ত বিপর্য্যয় ঘটিল; আমি রাগ চাপিয়া রাখিতে শিখিলাম, লোকজনের সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় হাসিমুখে কথা কহিতাম না; আমার প্রকৃতি গম্ভীর হইয়া আসিল। যাহাতে আমার অতিশয় ঘৃণা ছিল সেই মিথ্যাকথা বলিতে আরম্ভিলাম। মিথ্যাকথার সঙ্গে সঙ্গে ভণ্ডামি ও তস্করবিদ্যা শিখিলাম। আমার সরল হৃদয় কলুষিত হইয়া গেল, মা খুড়ীর নিকটে আর আমি সেরূপ খোলাভাবে ব্যবহার করিতাম না, আমার স্বভাব চাপা ও লাজুকভাব ধরিল। যে লাজুকতা আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে, যার জন্য লোকে চিরকাল আমার সম্বন্ধে ভ্রম বিচার করিয়া আসিয়াছে সেই লাজুক স্বভাব আমি ঐ বয়সে প্রথম পাই; উহা কখনই আমার জন্মসিদ্ধ ছিল না। পিতাকে অতি সম্মান করিয়া চলিতাম আর যদিও তিনি অধিক ঘনিষ্ঠতা দেখাতেন না তবুও তাঁহার প্রতি আমার মমতা ছিল; কিন্তু তিনি আমার জন্য ঐরূপ শিক্ষক নিয়োজিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি আমার সেভাব শিথিলিয়া গেল।

দিন দিন আমার আরো অধোগতি হল। কোন বিষয়ে আমার মন লাগিত না আর লেখাপড়ায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলাম। পাড়ার ছেলেদের খেলা দেখিতে যেতাম আর তাদের আমোদ আহ্লাদে নিজের মনের কষ্ট ভুলিয়া থাকিতাম। ক্রমে তাদের সঙ্গে মিশিতে সুরু করিলাম ও তাদের খেলাধূলায় যোগ দিলাম। বিকাল বেলা স্কুল থেকে আসিবার পর ও ছুটীর সময় যখন পেতাম তাদের সঙ্গে লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি

ইত্যাদি করিতে যেতাম। ওদিকে স্কুলের সমপাঠীরা আমাকে বোকা বা অজ্ঞ ভাবিল, উত্তম বালকেরা আমার সঙ্গে তেমন মিশিতে চাহিত না। আমি তখনও বকা বলিয়া পরিচিত হই নাই, তখনও যথার্থ দুষ্টামি শিখি নাই। কিন্তু ক্রমে দুষ্ট দলের দিকে নামিতে লাগিলাম। বাল্যস্বভাব কখন সম্পূর্ণরূপে সঙ্গীশূন্য, নিষ্কর্ম্মা বা সকল বিষয়ে নিরাস্থ হইয়া থাকিতে পারে না; বালকেরা সৎসঙ্গের অভাবে অবশ্যই অসৎ সঙ্গের দিকে ধাবিবে। আর দেখিলাম, উহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক নাই, উহারা সর্ব্বদা কোন না কোন আমোদ লইয়া ব্যস্ত। এই সকল কারণে আমি ক্রমে স্কুলের বকা ছেলেদের কাছে ঘেঁসিলাম।

স্কুলে, বোধ হয়, তখন কিছুই শিখিতাম না, শ্রেণীতে যোগ দিতাম মাত্র। অধিকাংশ সময় শিক্ষক পড়াইতেছেন, বোর্ডে অাঁক বুঝাইতেছেন বা কাহারও পড়া লইতেছেন, আর আমি হুঁতোরাম হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, অন্য কোন ছাত্রের সঙ্গে চুপ্‌চাপে গল্প করিতাম বা কাগজে ছবি অাঁকিতাম ও হিজিবিজি কাটিতাম। সে সময়ে আমাদের স্কুলে আদবে বাঙ্গালার চর্চ্চা হইত না। গোড়া থেকেই আমরা ইংরেজী ভাষা শিখিতাম ও কয়েক বৎসর পরে সংস্কৃত ধরিতাম। তখন আমার পক্ষে দুইই সমান ছিল। বিদেশীয় ভাষায় সবই যেন আবছায়া রকমে বুঝিতাম, গুটিকতক কথামাত্র জানিতাম; সেগুলির যথার্থ ভাব কখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না। আর যে সকল পাঠ অভ্যাসিতাম তাহা ত মন দিয়া শিখিতাম না, ভয়ে কিম্বা মারের চোটে এক প্রকার কণ্ঠস্থ—থুড়ি, কণ্ঠস্থ কেন, মুখস্থও নয়—কেবল ঠোঁটস্থ করিতাম। পাখীদের মত ঠোঁটের আগায় ইংরেজী ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণাদি ধরিয়া রাখিতাম, আর একরকমে বাহিরে ফেলিয়া দিতে পারিলে প্রাণ বাঁচিত। বাস্তবিক এ বিষয়ে আমারই কেবল দোষ ছিল না। ঐ বয়সে কিরূপে গ্রীস ও

রোমের ইতিহাস ইংরেজীতে বুঝিব ইংরেজীর বানান্ লইয়াই জীবনসংশয় ঘটিত; তার পর সেই প্রাণসংহারী ইংরেজীতে লেখা ইংরেজী ভাষার ব্যাকরণ। উঃ! সে সময়ের যন্ত্রণা মনে পড়িলে এখনও বুক কাঁপিতে থাকে।

যাহা হউক, মাষ্টার মহাশয়ের লাল চোকের কল্যাণে ও হলদে বেতের প্রসাদে তোতাপাখীর মত ইংরেজী আওড়াতে শিখিয়াছিলাম। সেই তের বৎসর বয়সের সময় যে গ্রীস ও রোমের বৃত্তান্ত পড়িয়াছিলাম, তাহার কেবল ট্রয় অবরোধের ঘোড়ার গল্প, আর রমুলস, রিমস ও নেকড়ে বাঘের কথা এখন স্মরণ আছে। কি করিয়াই বা ভাল জ্ঞান জন্মিবে? শিক্ষক ইংরেজী কথাগুলির বাঙ্গলা মানে বলিয়া দিতেন; ঠিক জিনিষটা কি তাহা বুঝাইবার জন্য কিম্বা ছাত্রেরা যথার্থ ভাব বুঝিয়াছে কি না সে বিষয় লইয়া অধিক পরিশ্রমে শিরঃপীড়া ঘটাতেন না বা স্বেদনির্গমনও করিতেন না। তিনি ইংরেজী 'সীজ' মানে অবরোধ ও 'বে' মানে উপসাগর বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন; কিন্তু আমার কাছে 'সীজ, বে' যেমন, 'অবরোধ, উপসাগর'ও তেমনি বোধ হত। দুইই এক প্রকার বুঝিতাম, বরং অবরোধ উপসাগর অপেক্ষা সীজ, বে বেশী কানে লাগিত।

সংস্কৃত ভাষায় আমি চতুর্ভুজ বিদ্যাভুড়ভুড়ী ছিলাম, আর পণ্ডিত মহাশয়—নরঃ নরৌ নরাঃ, নরম্ নরৌ নরান্ লইয়া আমাদের প্রাণান্তক জ্বালাতন করিতেন। আমি তখন সংস্কৃত এমন চমৎকার শিখিয়াছিলাম, আর উহার সরল, মনোহারী, লাবণ্যময় ব্যাকরণ এইরূপ হৃদয়স্থ করিয়াছিলাম যে এখন পর্য্যন্তও 'নর' শব্দের রূপ করিতে গিয়া প্রথমার একবচনে বিসর্গ বসাব কি না লইয়া আমার মহা বিভ্রাট উপস্থিত হয় ও প্রায় আধঘণ্টা কলমের আগা চিবাতে থাকি। স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় সংক্রান্তে একটী গল্প মনে পড়িতেছে, সেই গল্পে এখন এই বয়স্থ অবস্থায়ও

আমি হাসিয়া মরিয়া যাই। পাঠক! তোমায় তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমাদের স্থবির পণ্ডিত মহাশয় বড় নিদ্রাসক্ত ও নস্যপ্রিয় ছিলেন। তিনি পড়াতে পড়াতে প্রায় ঢুলিতেন; হাত থেকে বই ফসকিয়া পড়িত আর তাঁহার নাক দিয়া দিন রাত্রি নস্যথরা জল গড়াইত। তাঁহার চোক সর্ব্বদা রক্তবর্ণ থাকিত, আর যখন কোন কারণে কুপিত হইয়া আমাদের প্রতি বিকট দৃষ্টি নিক্ষেপিতেন, তথন আমাদের হৃদয়ে থরহরিকম্প লাগাইয়া দিতেন। তিনি অপর দিকে বেশ অমায়িক, ভালমানুষ ছিলেন; মেজাজ ঠাণ্ডা থাকিলে আমাদের সঙ্গে দুই একটা গল্প জুড়িয়া দিতেন। শ্রেণীর বদ্ ছেলেরা কিন্তু গোলমাল করিয়া তাঁহাকে অতিশয় উত্ত্যক্ত করিত, সেজন্য তিনি তাদের প্রতি সর্ব্বদা খড়্গহস্ত থাকিতেন; বকা দলেরও সে কারণে তাঁহার প্রতি বড় আক্রোশ ছিল। আমি ঐ সময়ে শ্রেণীর ভাল ছেলেদের দল থেকে বিচ্যুত হইয়াছিলাম আর লাজুকতা বশতঃ মন্দ দলের সঙ্গেও ভাল মিশিতে পারিতাম না। কিন্তু আমার মন তাদের দিকেই যাইতেছিল, বকারাও আমাকে তাদের নূতন চেলা দেখিয়া মাঝে মাঝে আমার উপর উপদ্রব করিত।

এক দিন গ্রীষ্মকালের বিকাল বেলায় পণ্ডিত মহাশয় ব্যাকরণের পড়া লইতে লইতে অতিশয় নিদ্রাপরবশ হইয়া ঢুলিতে আরম্ভিলেন। ক্রমে নিদ্রাদেবী তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিল; তাঁহার হাত থেকে পুস্তকখানি স্খলিল; তিনি চৌকির পিছন দিকে বিলীন হইয়া অবাধে পরম নিদ্রাসুখ অনুভবিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ অতিশয় ভীমাকার ব্যাদানাবস্থা ধরিল, তাঁহার নাক মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক গর্জিল। এইরূপ গম্ভীর সময়ে ছাত্রেরা নিস্তব্ধে পরস্পর চাহাচাহি ও হাসাহাসি করিতে আরম্ভিল; কি করিব নির্দ্ধারিতে না পারিয়া আমরা সকলে হতবুদ্ধির

ন্যায় বসিয়া রহিলাম। এমন সময়ে একজন দুষ্ট ছেলে উঠিয়া, অতি আস্তে আস্তে, পণ্ডিত মহাশয়ের যে এক মধ্যম আকারের টিকি ঝুলিতেছিল, তাহা দড়ি দিয়া চৌকির পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়া দিল। আর তাঁহার নস্যের বাক্সটী সরাইয়া লইল। পণ্ডিত মহাশয় তখনও অসাড়। ছাত্রেরা সকলে মুখে চাদর রুমাল গুঁজিয়া অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিল, আর একবার পরস্পরের প্রতি আড়ে আড়ে তাকাইল একবার পণ্ডিত মহাশয়ের দুরবস্থার দিকে চোক ফিরাইল, একবার সেই নস্যকাক্সহাতে ছেলেটার প্রতি চাহিল। আমিও ঐ দুষ্টমতি সমপাঠীর মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া সকলের মত বেশ মজা দেখিতেছিলাম। এমন সময়ে সে আমার নিকট আসিল ও গোপনে নস্যের বাক্স খুলিয়া হঠাৎ এক চিমটী নস্য আমার নাকে সিঁধাইয়া দিয়া পালিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ মহা শব্দে ও মহা ঘটার সঙ্গে দুইবার হাঁচিয়া ফেলিলাম। এইবারেই হরিবোল! পণ্ডিত মহাশয় চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ওদিকে তাঁহার টিকি বাঁধা, মাথায় ভয়ঙ্কর হিঁচকানি লাগিল। ছাত্রেরা আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। আমি বেচারী কিন্তু ভয়ে একেবারে মরিয়া গেলাম। আমার দিকে তাঁহার বিকট দৃষ্টি পড়িল। আমার পানে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া অতি কর্কশভাবে চেঁচিয়া উঠিলেন —কুষ্মণ্ড, নরাধম—!!

বাড়ীতে আমার বিদ্যাশিক্ষার জঘন্য অবস্থা ঘটিয়াছিল। সেই যমদূত শিক্ষকের হাত থেকে তখনও পরিত্রাণ পাই নাই। ক্রমে দৈনিক আহারের ন্যায় তাঁহার দৈনিক প্রহারও আমার সড়গড় হইয়া আসিল। দিন দিন তাঁহার মারকুটে স্বভাব এরূপ প্রবল হইল যে বিনা কারণে বা অতি অল্প কারণে তিনি আমাকে মারিতেন। আমি দেখিলাম, শিখি আর নাই শিখি প্রহার আমার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার, এতএব পড়িয়া

কেন মিথ্যা কষ্ট করিব? এই ভাবিয়া আমি সরস্বতীর নিকটে বিদায় লইলাম ও পাড়ার বকা ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে লাগিলাম। তাদের সঙ্গে গল্প করিতাম, তাস খেলিতাম, ঘুড়ি উড়াতাম, বকামি করিতাম; আর লুকাইয়া লুকাইয়া তামাক খাইতেও শিখিয়াছিলাম। দিনকতক আমার ঘুড়ি উড়াবার এরূপ বাতিক হইয়াছিল যে, সব ফেলিয়া দিয়া কেবল ঘুড়ি ও সূতা লইয়া মত্ত থাকিতাম। একদিন স্কুল থেকে পালিয়া পাড়ার ইয়ারদের ডাকিয়া ছাদের উপর রৌদ্রে প্রায় তিন চার ঘন্টা ক্রমাগত ঘুড়ি উড়াইয়াছিলাম। পিতা তাহা জানিতে পারিয়া আমার ঘুড়ি, লাটাই সব চুরমার্ করিয়া ফেলিলেন, আমাকে পর্য্যন্তও প্রায় চুরমার্ করিয়াছিলেন। সেই অবধি আমার ঘুড়ি উড়ান বন্ধ রহিল; আমিও দিনকতক চুপ্‌চাপে থাকিতাম, বাড়ীর বাহিরে বড় একটা যেতাম না।

আমার মানসিক অবস্থা তখন এমন বিকার পাইয়াছিল আর প্রহারে প্রহারে আমার হৃদ্বৃত্তি এরূপ জড়ভাব ধরিয়াছিল যে সব ভুলিয়া গিয়া অল্প দিনের মধ্যে আবার সেই পূর্ব্ব সঙ্গীদের সঙ্গে মিশিতে প্রবৃত্ত হলাম। বিকাল বেলা স্কুল থেকে আসিয়া জলখাবার খাইয়াই পাড়া বেড়াতে যেতাম, যতক্ষণ না পিতা কাজ থেকে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন, ততক্ষণ নির্ভয়ে সেঙ্গাতদের সঙ্গে খেলাধুলা করিতাম। ঐ সময়কার আমার লাউ শিকারের কথা বেশ স্মরণ পড়িতেছে। উহার বিলক্ষণ পুরস্কার পাইয়াছিলাম, সেজন্য এস্থলে সে গল্প লিখিতেছি।

আমাদের পাড়ায় এক ইয়ারের বাড়ীর পাশে কোন লোকের বাড়ীতে এক তোলার ছাদের উপর চমৎকার লাউ হইয়াছিল। আমরা তার লোভ সম্বরিতে না পারিয়া কি উপায়ে একটা লাউ আত্মসাৎ করিব তাহার পরামর্শ করিলাম। একদিন ছুটীর সময় দুপর বেলা বন্ধুর বাড়ীতে

উপস্থিত হলাম; বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সকলে বাহিরে ছিল, অতএব এমন সুযোগ কোন মতে ছাড়িবার নয়। একটা লম্বা গরাণ যোগাড় করিলাম; জানালার ভিতর দিয়া গরাণ চালাইয়া দেখিলাম নাগাল পাই কি না, কিন্তু সেটা অতি ছোট। একটা শক্ত বাকারি খুঁজিয়া আনিয়া গরাণের আগায় জোড় দিলাম। অনেকবার বিফলে খোঁচাখুঁচি করিলাম। অবশেষে ডালপাতাসুদ্ধ এক প্রকাণ্ড লাউ টানিতেছি জানিতে পারিয়া আমাদের মহা হর্ষ জন্মিল। অতি আস্তে আস্তে টানিয়া আনিলাম, লাউটা জানালা ছুঁইল, আমি হাত গলাইয়া উহা লইতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার দুঃখের কথা কে বুঝিবে? লাউটা বড় মোটা, জানালার গরাদের ভিতর দিয়া গলিল না! কতপ্রকার উপায় করিলাম; শেষে দেখিলাম লাউটাকে না কাটিয়া আমরা উহা কখন ঘরে লইতে পারিব না। আমার বন্ধু একটা বড় ছুরী আনিল। সে গরাণটা ধরিয়া রহিল, আমি লাউ কাটিতে গেলাম। ভাবিয়াছিলাম এক আধখানার পর আর আধখানা গলাইয়া লইব। কিন্তু যেই উহা দুভাগে পৃথক হইল অমনি, দুই বাড়ীর মাঝে এক গলি ছিল, সেই গলির পাশে নর্দ্দামাতে ধপ্ ধপ্ করিয়া একটার পর আর একটা—দুই আধখানাই পড়িয়া গেল! কৃপাল পাঠক! আমার মনের ক্ষোভ ভাবিয়া দেখ।

ঐ শিকারে অনেক সময় নষ্ট করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি হতাশ না হইয়া আবার পরদিন ঐ অসংসাহসিক ব্যাপারে ধাবিলাম। আগের দিন গলিতে দুইজন লোক আমাদের কাণ্ড দেখিয়াছিল, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, যেন কিছুই জানি না এইভাবে লাউ শিকারে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলাম। আবার সেই সব উপায় অবলম্বিলাম; গরাণ বাড়াইলাম, ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া লাউ ধরিলাম। টানিতে প্রস্তুত—বাড়ীর কর্ত্তা নিঃশব্দে ছাদের উপর উপস্থিত! আমরা লাউ টানিতেই ব্যস্ত ছিলাম। তিনি

হাত দুটী পাশে ঝুলাইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া আমাদের দিকে আসিলেন ও আমার দিকে তাকাইয়া বিকটভাবে বলিলেন—সাবাশ! সাবাশ!—এ কথা লিখিতে আমার হাত থেকে কলম পড়িয়া যাইতেছে!

লোকটী পিতাকে সমস্ত কথা বলিয়া দিল; পিতা শুনিবামাত্র আমাকে ভয়ঙ্কর প্রহার দিলেন। এরূপ তীব্র প্রহার পূর্ব্বে আর কখন খাই নাই, কিন্তু এই দুই বৎসর আমি লগুড় ব্যাপারে চমৎকার অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, আর ঐরূপ পুরস্কার যে আমার ভাগ্যে ঘটিবে তাহা মনে বেশ জানিয়াছিলাম, এই কারণে অন্য অন্য সময়ের মত এবার তেমন যন্ত্রণা অনুভবি নাই।

বাড়ীতে অধিক দৌরাত্ম্য করিতে সাহসিতাম না। মারে মারে আমার মন একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, কেবল সামান্য তস্কর বৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিতাম। টাকা পয়সার প্রতি আমার কোন আক্রোশ ছিল না, কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর উপর মাঝে মাঝে বড় লোভ পড়িত। আমি আহারপ্রিয়, কিন্তু কখনই বিলাসপ্রিয় নহি। ভাঁড়ারঘর থেকে আম সন্দেশ কিম্বা ঠাকুরঘর থেকে কলা কাঁটালটা চুরি করিয়া খেতাম। উহার সঙ্গে সঙ্গে গালাগালি, মারধরটাও খেতাম; কিন্তু চুরির আহার সুখে সে সব তুচ্ছ ভাবিতাম।

শীঘ্রই খাদ্য দ্রব্য হতে অন্য জিনিষ আমার মনকে লোভাতে লাগিল। খুড়া ছবি আঁকিতে বড় ভালবাসিতেন, দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার মত চিত্র কাটিতে আমার অতিশয় অভিলাষ জন্মিল। একদিন খুড়ার অনুপস্থিতিতে তাঁহার ঘরে গিয়া কল-কৌশলে তাঁহার বাক্সটী খুলিলাম; আর তাঁহার ভাল সরঞ্জম, উৎকৃষ্ট চিত্র, উত্তম আদর্শগুলি, যাহাতে আমার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল ও যাহা তিনি আমার কাছ থেকে লুকাইয়া রাখিতেন, সে সব বাহির করিয়া নিজের ব্যবহারায়ত্ত করি-

লাম। খুড়া জানিতে পারেন নাই; সন্ধান পাইলে যে কি করিতেন তাহা ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু আবার আমার পক্ষে একটা কথা বলি। ঐ পরস্ব অপহরণে বিশেষ দোষ দেখি না, কেননা খুড়ার জিনিষগুলি চুরি করিয়া আমার নিজের হাতে রাখিতে ইচ্ছা ছিল না। কেবল সেইগুলির ব্যবহারে আমি একমাত্র অভিলাষী ছিলাম আর তাঁহার দ্রব্যাদির সঙ্গে তাঁহার চিত্র আঁকিবার শক্তিও চুরি করিব এই ভাবিয়া ঐরূপ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। অনেকে বলিবেন—ব্যবহারই বল, আর নিজায়ত্তই বল, চুরি ত চুরি;—তবে—তবে—অবশ্য আমার ঘাট।

ক্রমে আমার অধোগতির সীমা রহিল না। বাড়ীতে, স্কুলে, আত্মীয়ের নিকট, পরের কাছে, দিনরাত ভৎর্সনা ও প্রহার সহিয়া আমি মৃতবৎ হইয়া গিয়াছিলাম। ঐ তের বৎসর বয়সে সকল বিষয়ে আমার অত্যন্ত বিরক্তি জন্মিল, কোন বস্তুর জন্য আমি লালায়িত হইতাম না। কিন্তু আমার অন্তরের আগুন বিলীন হইয়াছিল, নির্ব্বাণ হয় নাই; আমার হৃদয়ের বেগ আচ্ছন্ন ছিল, তিরোহিত হয় নাই; আমার মনের তেজ পিষিত ছিল, বিলুপ্ত হয় নাই। প্রকাশ্যে আমি সব সহিতাম, কিন্তু বিরলে অবচনীয় মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত থাকিতাম। সময়ে সময়ে আমার হৃদয়কে দমিয়া রাখিতে পারিতাম না; বৈশাখ মাসের আকাশের ন্যায় ক্রোধবজ্র ও রোষবিজলী হৃদয় হতে অতি উচ্চণ্ডভাবে ভঙ্গপ্রবণ হইত।

বাস্তবিক আমার প্রকৃতিই ঐরূপ। অতি উষ্ণ রিপুচয় নিরন্তর আমার অন্তরে বাস করে; আর যখন সেই রিপুগুলি দ্বারা আলোড়িত হই, তখন আমার হৃদয়ের তীব্র সংঘর্ষণ দুর্দ্ধর্ষ ভাব ধরে। সমচিত্ততা, মর্য্যাদা, আশঙ্কা, ভব্যতা একেবারে হারাই; ধৃষ্ট, উচ্চণ্ড, নরদ্বেষী, অসংসাহসী হইয়া দাঁড়াই। সে সময়ে এমন লজ্জা নাই যাহা আমাকে

রোধিতে পারে, এমন বিপদ নাই যাহা আমাকে ত্রাসিতে পারে; যে বিষয়ে আমি ব্যাপৃত তাহা ব্যতীত সমস্ত বিশ্ব তখন আমার পক্ষে শূন্য-বৎ। কিন্তু এরূপ ভাব এক মুহূর্ত্তমাত্র বর্ত্তে। পরক্ষণেই সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যায়। আমাকে ধীর অবস্থায় দেখ, আমি সাক্ষাৎ অলসতা ও কোমলতা; সে সময়ে সবই আমাকে বিভীত করে, সমস্তই আমাকে ব্যথিতচিত্ত করে; একটা উড়ন্ত মাছীতে পর্য্যন্তও আমি ভয় পাই। একটা কথা বলিতে, একটা ঈশারা করিতে আমার অলস স্বভাবে বিভীষিকার উদয় হয়। ত্রাস ও লজ্জা তখন আমাকে এরূপ অভিভূত করে যে সমস্ত নরলোকের সমক্ষ হতে নিজেকে অন্তর্হিত করিতে অভি-লাষ জন্মে। কিছু কাজ করিতে হইলে কি করিব ঠিক পাই না, কথা কহিতে গেলে কি বলিব জানি না; যদি কেহ আমার দিকে তাকায় মাত্র আমি অপ্রতিভ হইয়া যাই। যখন রিপুর দ্বারা দোলায়িত হই, তখন সব যেন উজ্জ্বল দেখিতে থাকি; তখন কি বলিব, কি করিব তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায়, সচরাচর সমাগমে আমি কিছুরই অনুসন্ধান পাই না; কেবল কথা কহিতে হবে ইহাতেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

ঐ সময়ে আমার বিদ্যাশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্থগিত ছিল। তিন বৎসর অতি কষ্টে অল্প অল্প পড়া অভ্যাসিতাম ও পারে প্রকারে এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে উঠিতাম, কিন্তু আমার মনে যথার্থ বিদ্যা ও জ্ঞানের অনুমাত্রও সঞ্চার হয় নাই। ঘরের শিক্ষকের অত্যাচারে আমার বুদ্ধি ও বিবেকশক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছিল, লেখা পড়ার নামমাত্রে আমার প্রখর বিদ্বেষ জন্মিত। সকল বিষয়ে আমি অনাস্থা দেখাতাম; পাড়ার সঙ্গী, বন্ধুবান্ধব সব ত্যজিয়া, খেলাধুলা, আমোদ প্রমোদ সব ফেলিয়া দিবারাত্র বিমর্ষভাবে থাকিতাম। আমার মন এমন জড়ভাব ধরিয়াছিল যে কোন

প্রকার চিন্তার উদয় হইত না। সর্ব্বদা যেন শূন্য দেখিতাম। কিছু দিন এই ভাবে গেল, পরে এ বিষম যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতে আমি লুকাইয়া লুকাইয়া দুই একখানি বাঙ্গলা বা চিত্রময় ইংরেজী বই পড়িয়া ভুলিয়া থাকিতাম। ঘরের শিক্ষক ইহা জানিয়া আমার প্রতি পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুর ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি আমাকে ভয়ঙ্কর প্রহার করাতে আমি থাকিতে না পারিয়া মার কাছে গেলাম আর আমার গা খুলিয়া মাকে—মা, এই দেখ, শিক্ষক মহাশয়—এই বলিতে না বলিতে মহাবেগে কাঁদিতে থাকিলাম। প্রায় আধঘণ্টা অবিশ্রান্ত একভাবে চীৎকারস্বরে রোদিলাম; যেন তিন বৎসরের মনক্লেশ এক দমে মার কাছে ঢালিয়া দিলাম। মার মন গলিয়া গেল। তিনি আমাকে কোলে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইলেন ও কত চুমা খেলেন, আর সেই নরাধম পিশাচ শিক্ষকের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। খুড়াখুড়ী ও অন্যান্য দুই চার জন লোক শিক্ষকের বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মা ও তাঁহারা পরামর্শিয়া পিতাকে বলিয়া সে যমদূত শিক্ষককে বিদায় দিলেন।

ঐ সংবাদে আমার অতিশয় হর্ষ বোধ করারই কথা, কিন্তু কয়েক বৎসরের ক্রূর আচরণে ও চারদিকের অনপেক্ষিত ঘটনাক্রমে আমার হৃদয় এরূপ অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল যে শিক্ষকের বিদায়ে আহ্লাদ পর্য্যন্তও অনুভবিতে পারি নাই। পিতা আর একজন শিক্ষক নিয়োজিলেন। ইনি অতি ভালমানুষ ও ভদ্রলোক ছিলেন আর আমার প্রতি যথাসাধ্য শান্ত ব্যবহার করিতেন। কিন্তু আমার মনের এরূপ দশা ঘটিয়াছিল যে কোন প্রকারে আমার অন্তর থেকে পাঠ্য পুস্তকের প্রতি ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ নিষ্কাশিতে সক্ষম হই নাই। পূর্ব্বের ন্যায় গোপনে উপরি বই পড়িতাম; বাঙ্গালাই ভাল বুঝিতাম, সেজন্য উহাই আগ্রহের সঙ্গে পড়িতাম। মনে

দুই একটা নূতন ভাব ও নূতন কল্পনার আবির্ভাব হইল। তখনও আমি সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুগ্রস্ত হই নাই সে বিশ্বাস জন্মিল। নূতন শিক্ষক আমার এই গুপ্ত পাঠে অধিক বিরক্তি দেখাতেন না; তিনি আমাকে নিজের বই পড়িবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করিতেন, কত মিষ্ট কথা বলিতেন কিন্তু কিছুতেই তিনি আমার মনকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে সফল হন নাই।

এইরূপে মাস কয়েক কাটিয়া গেল, আমার যাহা ভাল লাগিত করিতাম, যাহা ইচ্ছা পড়িতাম। পিতা আমাকে বেশী উৎপীড়ন করিতেন না। বড় হইয়াছি বলিয়া বা অন্য কোন কারণে হউক তিনি আমার সম্বন্ধে সমস্ত ভাবনাকে দূর করিলেন; শিক্ষকের ও মা খুড়ার হাতে আমার ভার দিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন। ইঁহারা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন, আমার মন যাহাতে ভাল পথে ধায় তার জন্য অতি কোমল উপায় অবলম্বিতেন। আমার হৃদয় শান্ত হইয়া আসিল, প্রচণ্ড ঝঞ্চাবাতের পর সুমধুর প্রশান্ত ভাব ধরিল। আমাতে আবার চেতনা সঞ্চারিল, পিষিত হৃদ্বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠিল, আমি অনেক বিষয়ে আস্থা দেখাতে লাগিলাম। দুই একখানি বই পড়িতে ২ পুস্তক পাঠে আবার আমার রুচি জন্মিল। বাল্যকালের লালসা আবার ফিরিয়া পেলাম।

ক্রমে আমার পড়িবার তৃষ্ণা আরো প্রবল হইল, কিরূপে তাহার পরিতৃপ্তি করিব তাহার উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিতাম। আমাদের পাড়ায় একটী ছোট বইয়ের দোকান ছিল, সেখানে আমার মন দৌড়িল। কিন্তু সেখানে ইংরেজী বইই অধিকাংশ, যাহা দুই একখানা ভাল বাঙ্গালা বই সেকালে ছিল তাহা পর্য্যন্তও ঐ দোকানে পেতাম না। একদিন একরাশি পুরাণ বই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একখানা বালকদের প্রতি উপদেশময় ইংরেজী পুস্তক দেখিয়া উহা পড়িতে আমার বড় ঔৎসুক্য জন্মিল।

জলখাবারের পয়সা হতে যাহা কিছু জমাইয়াছিলাম তাহা দিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ বইখানি কিনিয়া আনিয়া মনোযোগের সঙ্গে পড়িতে লাগিলাম। রচনাটী সরল ভাষায় লেখা ছিল, অভিধানের সাহায্যে ও অধ্যবসায়ের বলে উহা অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। সহসা আমার মনে যেন বিদ্যুৎ স্ফুরিল, অকস্মাৎ আমার হৃদয় যেন কোন গূঢ় চালক দ্বারা সঞ্চালিত হইল। বই পড়িয়া জানিলাম যে, আমার মত অনেকের অধোগতি হইয়াছিল, অনেকের অবস্থা আমার অপেক্ষা অত্যন্ত হীন ছিল, অনেকে আমার অপেক্ষা শতগুণ মর্ম্মপীড়ায় উৎপীড়িত হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি তাহারা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে আবার উঠিয়াছে, ইচ্ছা ও কর্ম্ম-শক্তির গুণে বিলক্ষণ যশ লভিয়াছে, সুপথ ও সদনুষ্ঠানের কল্যাণে পরম আনন্দ অনুভবিয়াছে। তবে আমিই বা ঐরূপ করিতে পারিব না কেন? তাহারাও মানুষ, আমিও মানুষ, তবে আমিই বা তাহাদের ন্যায় আমার বর্ত্তমান হীন অবস্থা হতে নিজের উদ্ধার সাধিতে পারিব না কেন? দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা থাকিলে মানুষ কি না করিতে পারে? লোকে পথের ভিখারী থেকে নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলে রাজার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, সামান্য চাষার পুত্র মানসিক শক্তি ও অদম্য উৎসাহের ভরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ ও পণ্ডিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তবে আমিই বা এই বিরলে বসিয়া জীবন্মৃতভাবে থাকিব কেন?

ইংরেজী পুস্তকখানি পড়িয়া ঐরূপ চিন্তা আমার মনে বিচরিতে লাগিল। সেইদিন থেকে আমি সজীব হলাম। একেবারে নিরুৎসাহে ডুবিয়াছিলাম, আবার কে যেন আমাকে গভীর গুহা হতে উপরে ডাকিল। আমার পাঠতৃষ্ণা প্রবল হইল। আমি সকল জিনিষ ছাড়িয়া বইতেই বিব্রত থাকিতাম। যাহা কিছু পয়সা জমাতাম, তাহা সেই দোকান-দারের হাতে যাইত। রোজ বিকালবেলা স্কুল থেকে আসিয়া দোকানে

গিয়া বই ঘাঁটিতাম। দোকানদারটী অতিশয় সদয় ও সুন্দর লোক ছিল; আমাকে অবাধে তাহার দোকানে পুস্তকাদি দেখিতে দিত, আর যখন কিনিবার সঙ্গতি থাকিত না, তখন দুই একখানি বই আমাকে অমনি পড়িতে দিত। তাহার নিকট আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তাহা বলিতে পারি না। বৃদ্ধ এখন পরলোকে; শুনিয়াছি তাহার পুত্রের হাতে সেই পুরাণ দোকানের আরো শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। আশা করি, সে আমার এই কয়েকটী কথা পড়িয়া তাহার পরলোকগত পিতার প্রতি আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানিয়া পরম প্রীতি লভিবে। *

এইরূপে আমার চোদ্দ বৎসর সমাপ্ত হল। আমি অস্থিরচিত্তে, পরের ও নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট, নিজের অবস্থার প্রবল বিদ্বেষী, উন্নতি-লাভের উৎকট ইচ্ছায় প্রণোদিত ও এক অপ্রকাশ্য বস্তুর জন্য লালায়িত হইয়া থাকিলাম। দিবারাত্র নানা প্রকার কল্পনা কল্পিতাম ও বহুবিধ আকাশ-কুসুম রচিতাম; বালকযোগ্য ক্রীড়া ও আমোদপ্রমোদ ছাড়িয়া কেবল পুস্তকপাঠে তন্ময় হইয়া রহিলাম। মনে নব নব ভাব সঞ্চারিল, হৃদয় পুনর্ব্বার বিকশিত হইল, আমি যেন আবার নবজীবন পাইলাম।

---

* ৺শরৎচন্দ্র আঢ্য। (S. C. Addy.)

চতুর্থ অধ্যায়।

পাঠ-তৃষ্ণা।

ক্রমে পুস্তকপাঠ আমার পক্ষে রিপুস্বরূপ হইয়া দাঁড়াল, আমি আহার নিদ্রা ভুলিয়া আমার নূতন সাধ মিটাইবার নিমিত্ত সদাসর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিতাম। তখন একখানি বই পড়িবার জন্য যেরূপ প্রবল তৃষ্ণা জন্মিত, এখন একটা নূতন দেশ দেখিতেও সেরূপ ঔৎসুক্য হয় না; তখন একটী নূতন রচনা-পাঠে যেরূপ হর্ষে উথলিয়া উঠিতাম, এখন এক লাখ টাকা পাইলেও সে আনন্দ অনুভব করি না। এত দিনের পর বিদ্যাশিক্ষার প্রথম স্বাদ পেলাম। আত্মীয়জন, বন্ধুবান্ধব, আমোদপ্রমোদ সকলই ইহার কাছে তুচ্ছ বোধ হল; ভাবিলাম, এরূপ বিমল ও অব্যাহত সুখ আর কোথাও মিলিবে না। ইহাতে রাজা প্রজার সমান অধিকার; কি ধনী, কি গরীব, সকলেই একভাবে এ সুখ পাইতে পারে; বড় ছোট সকলেরই সুমুখে জ্ঞানপথ অবাধে খোলা রহিয়াছে। এ পথে প্রবেশিবার একমাত্র মূল্য—নিজের ইচ্ছা ও নিজের উদ্‌যোগ।

ইংরেজীতে দুই একখানা সরল ভাষায় রচিত বই পড়িলাম। রবিন্সন ক্রুসো, পল ও বর্জিনিয়া প্রভৃতি চিরপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি অতি যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করিলাম। ঘরের শিক্ষক বিরক্ত হইবেন বা পিতাকে বলিয়া দিবেন, এই আশঙ্কায়, কখন তাঁহার নিকট ঐ সকল বইয়ের কোন দুরূহ স্থানের অর্থ বুঝাইয়া লইতাম না। যথাসাধ্য নিজের আয়াসে ও অভিধানের সাহায্যে সেগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। প্রথমে সামান্য

বাক্যগুলিরও অর্থ গ্রহিতে অতিশয় কষ্ট হইত, কিন্তু অনেক পরিশ্রমের পর একটা বাক্যেরও যথার্থ ভাব বুঝিলে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ অনুভবিতাম, তাহা বলিতে পারি না। অভিনিবেশ ও অধ্যবসায়ের বলে কি না সম্ভবে? আর তখন বই পড়া আমার এক রকম নেশার মত হয়েছিল, যতক্ষণ না আমি ভাল করিয়া কোন বিষয় বুঝিতাম, ততক্ষণ নাছোড়-বন্দ হইয়া তাহাতে লাগিয়া থাকিতাম। এ পৃথিবীতে নিজ পরিশ্রমের ফল অপেক্ষা কোন ফল অধিক মিষ্ট নয়। অনেক কষ্ট ও আয়াসের পর নিজ বুদ্ধিতে একটী কঠিন ছত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে যে আহ্লাদ হইত, দশ বৎসর পরের নিকট চল্লিশখানা বই পড়িয়াও সে সুখ পাই নাই।

যতদিন না ইংরেজীতে একটু অধিকার জন্মিল, ততদিন বাঙ্গালা পুস্তকই অধিক পড়িতাম। আমার সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প বই ছিল, আর ভাল গদ্যের বই ছিল না বলিলেই হয়। যাহা দুই একখানি দেখিতাম, সেগুলির ভাষা এরূপ জটিল যে, তাহাতে দাঁত ফুটাইবার সাধ্য ছিল না। তখনকার বাঙ্গালা গদ্য রচনা আর আজকালকার ভাষার তুলনা করিলে, ঐ দুই এক ভাষা বলিয়া বোধ হইবে না; এই পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের ভাষা যে কত বদলিয়া গিয়াছে, তাহা অনেকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিবেন না। পদ্যে দুই চারখানি উৎকৃষ্ট বই ছিল। ভারতচন্দ্র রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা আমাদের বড় আদরের সামগ্রী। উঁহাদের রচনায় যেমন রস ও মধুরতা আছে, এখনকার অতি অল্প পদ্য-গ্রন্থে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ে ভাল বই অল্প ছিল বটে, কিন্তু সেগুলি অতিশয় যত্ন ও মনোযোগের সঙ্গে পড়িতাম। এখনকার মত ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প উপন্যাস বা নাটক বাহির হইত না, আর লোকে ইংরেজী শিখিয়া বাঙ্গালাকে ফেলিয়া দিত না বা দূরছাই করিত না। সে জন্য আমরা ধীরে ধীরে

ও বার বার ভাল বাঙ্গালা বইগুলি পড়িতাম ও নিজ ভাষার যথেষ্ট আদর ও সম্ভ্রম করিতাম।

বাস্তবিক, এখন আমাদের নিজ ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিলে আমার মনে যারপরনাই ক্লেশ হয়। আজকাল আমাদের ভাষা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের অন্য কোন বর্ত্তমান ভাষা বাঙ্গালার সমকক্ষ হইতে পারে না; আর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইহার যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে ও এখন ইহা যেরূপ শীঘ্র পরিপুষ্টি লভিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, এক শত বৎসরের পরে বাঙ্গালা পৃথিবীর কোন ভাষা অপেক্ষা হীন বা কম আদৃত থাকিবে না। বাঙ্গালার ন্যায় সরল ও সুললিত ভাষা অল্পই আছে, আর উহা অতি আধুনিক হইয়াও ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাগুলির অপেক্ষা অনেক উপরে উঠিয়াছে।

আজকাল আমাদের দেশে তিনটী ভাষা প্রধান—বাঙ্গালা, হিন্দী, ও মার্হাট্টী। পাঞ্জাবী ও গুজরাটী হিন্দীর রূপান্তর বলিয়া ঐ গুলিকে ধরিলাম না; উর্দূ হিন্দীর মুসলমান বোন; উড়িয়া বাঙ্গালার বৈমাত্রেয় ভগিনী; আর তামিল ও তেলুগু ঐ গুলি হতে একেবারে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র, এ জন্য এই ভাষাগুলিকেও বাদ দিলাম। বাঙ্গালা হিন্দী ও মার্হাট্টী, এই তিন ভাষার মধ্যে প্রথমটী সকলের অপেক্ষা সরল, আর শেষেরটী সকলের অপেক্ষা জটিল, হিন্দী সকলের পুরাণ, আর বাঙ্গালা সকলের নূতন। কিন্তু তিনটীর মধ্যে বাঙ্গালা সকলের অপেক্ষা উন্নত ও পরিপুষ্ট।

প্রায় সাড়ে চার শ. বৎসর হইল, বিদ্যাপতি প্রথম বাঙ্গালায় কবিতা লেখেন, কিন্তু তখনকার ভাষা আধুনিক বাঙ্গালা হতে অনেক বিভিন্ন। উহা প্রায় হিন্দীর মত ছিল। বিদ্যাপতি ও তাঁহার সমকালীন বৈষ্ণবদের ভাষা, আর পূর্ব্বদেশীয় হিন্দীর মধ্যে অতি অল্প প্রভেদ দেখা যায়। প্রথা-

মতঃ আমাদের বাঙ্গালা ভাষা বেহার অঞ্চলের কথিত হিন্দী থেকে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি কেহ বিদ্যাপতির 'পদাবলী' পড়েন, তিনি ইহার প্রমাণ পাইবেন। বিদ্যাপতির প্রায় এক শ বৎসর পরে কবিকঙ্কণ আবির্ভূত হন। ইহার ও ইহার পরে গোবিন্দ রায় প্রভৃতি কবিদের ভাষাও অনেকটা হিন্দীর মত; সকলেই জানেন যে, ভারতচন্দ্র রায়ের রচনাসমূহে এই বাঙ্গালা ও হিন্দীর ঘনিষ্ঠতার বিলক্ষণ স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র রায়ের পরেই বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ সৃষ্টি হয় ও ঐ সময় থেকেই বাঙ্গালা বর্ত্তমান আকার পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু গত পঞ্চাশ বৎসরে বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, উহার পূর্ব্বে চার শ বৎসরেও সেরূপ ঘটে নাই। বাঙ্গালা গদ্য একেবারে নূতন সৃষ্টি, আর এত আধুনিক হলেও বাঙ্গালা গদ্যে আজকাল যেরূপ উৎকৃষ্ট বই লেখা হয়, তাহা দেখিলে কোন্ ব্যক্তির অন্তরে না আনন্দ সঞ্চারে? আর কোন্ বাঙ্গালীর মনে না অভিমানের উদ্রেক হয়?

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতচন্দ্র রায় ও ঈশ্বর গুপ্তের লেখা এবং এখনকার বাঙ্গালার মধ্যে একটা প্রধান প্রভেদ লক্ষিত হয়। তখনকার লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে অল্প বিভিন্নতা থাকিত, আর আজকাল ভাল বাঙ্গালা বইয়ের ভাষা ও কহা ভাষার মধ্যে অত্যন্ত অসামঞ্জস্য হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কহিবার সময় এক রকম কথা ব্যবহার করি, আর লিখিবার সময় সেইগুলি সংস্কৃত ধারায় লিখি। আমাদের ভাষায় তিন প্রকার কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে—দেশজ, তদ্ভব, ও তৎসম। যেগুলির মূল সংস্কৃত নয়, সেগুলিকে দেশজ বলে, যেমন—গাছ, ডাব, ডোঙ্গা, ইত্যাদি। যে কথাগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু কালের গতিতে আদিম অবস্থা থেকে ভিন্ন রূপ ধরিয়াছে, সেগুলিকে তদ্ভব বলে, যেমন—মাছ, পাতা, ঘাড়ী, দোর, ইত্যাদি।

আর যে কথাগুলির সংস্কৃত ভাষায় যে আকার ছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ আছে, সেইগুলিকে তৎসম বলে, যেমন—সংস্কৃত, ভাষা, দেশজ, জল, ইত্যাদি। এখন আমাদের প্রধান দোষ এই যে, দেশজ বা তদ্ভব কথা চলিত থাকিতেও লিখিবার সময়ে আমরা সেগুলির পরিবর্ত্তে তৎসম পদ ব্যবহার করি।

ইহার প্রধান কারণ এই যে, পণ্ডিতেরা ও অধিকাংশ লেখকেরা মনে করেন যে, সংস্কৃতই একমাত্র যথার্থ ও বিশুদ্ধ ভাষা, আজকালকার কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত কথাগুলি সংস্কৃত কথার অপভ্রংশমাত্র ও মূর্খতাই সে অপভ্রংশের মূল; অতএব প্রত্যেক বাঙ্গালা কথা সংস্কৃত আকারে ব্যবহার করাই উচিত। আর লোকে একটু সংস্কৃত পড়িলেই নিজের কহা ভাষাকে তুচ্ছ ভাবিয়া, যতদূর পারে, লিখিবার সময় বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত কথা ব্যবহার করে। এই ভ্রম—বাঙ্গালা সংস্কৃতের কদর্য্য অপভ্রংশমাত্র—যতদিন এই কুসংস্কার আমাদের মনে থাকিবে, তত দিন আমাদের ভাষার যথার্থ উন্নতি হবে না, আর সাধারণ লোকের শিক্ষার পক্ষে প্রকৃত সুবিধা ঘটিবে না। যে ভাষা সংস্কৃত কিম্বা ইংরেজী না জানিলে বুঝা যায় না, সে ভাষাকে আমি বাঙ্গালা বলি না; উহা ইংরেজীও নয়, সংস্কৃতও নয়, বাঙ্গালাও নয়। বস্তুত উহা কিছুই নয়।

এই বিষয় লিখিতে লিখিতে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে, আমি আর কলম বন্ধ করিতে পারিতেছি না। সকল কথা খুলিয়া বলিব, তাহা এই বইয়ের গোড়াতেই লিখিয়াছি, অতএব আমার মনে যে সকল ভাব আসিতেছে, তাহাই এস্থলে প্রকাশ করিলাম। আমার বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা কথা থাকিতে আমরা সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়া মরি কেন? 'হাত' থাকিতে আমরা 'হস্ত' লিখি কেন? প্রথমটী বাঙ্গালা, দ্বিতীয়টী সংস্কৃত; তবে বাঙ্গালা রচনার সময় সংস্কৃত পদের ব্যবহার করি কেন?

হাঁ, যেখানে একটা আস্ত যুক্তকথা সংস্কৃত থেকে লওয়া হইয়াছে, সেখানে সংস্কৃত পদ লিখ, যেমন—'হস্তলিপি'। কিন্তু সদাসর্ব্বদা যেখানে সরল 'হাত' বলি, সেখানে কুটিল 'হস্ত' লিখিবার কি আবশ্যক? আমরা কহিবার সময় 'গাছপালা, বাড়ীদোর, নাকচোক' বলি; কিন্তু যেই লিখিতে বসি, অমনি আমাদের ঘাড়ে ভূত চাপে, আর "বৃক্ষপল্লব, বাটীদ্বার, নাসিকা চক্ষু' লিখিয়া ফেলি; এ দেখিতেছি ঠিক আমাদের আজকালকার পোষাকের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা বাড়ীতে জামা ধুতি পরি, কিন্তু কাজে বাহির হবার সময় চোগা চাপকান ও পাগড়ী বাঁধিয়া ঘণ্টা দিয়া বেড়াই।

যেখানে তদ্ভব, দেশজ বা অন্য চলিত কথা আছে, সেখানে তৎসম বা সংস্কৃত কথা ব্যবহার করি কেন? 'গিয়া' থাকিতে 'গমন করিয়া' লিখিবার কি আবশ্যক, তাহা দেখি না। 'জাহাজ' 'জরিমানা'র বদলে 'পোত' 'অর্থদণ্ড' ব্যবহার করা কেবল বিদ্যাদাম্ভিকের কাজ। 'মাথা' আর 'মস্তক' কথার মানেতে কি প্রভেদ, তাহা বুঝিতে পারি না। বিদ্যা-বাগীশেরা যতই কেন চেষ্টা করুন না, সর্ব্বসাধারণের মুখ থেকে ঐ সকল চলা কথা বাহির হওয়া কখনই বন্ধ করিতে পারিবেন না। অনেকে বাঙ্গালা ভাষার আধুনিক উৎপত্তি ভুলিয়া গিয়া উহাকে সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া ভাবেন, আর চলা কথা অর্থাৎ বাঙ্গালাকে কদর্য্য অপভ্রংশ ভাবিয়া যেখানে পারেন সংস্কৃত পদ ব্যবহার করেন। তাঁহারা জানেন না যে, ভাষাও অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। যেমন এক পাহাড় খসিয়া গিয়া ছোট ছোট পাথর ও নুড়ি অনেক দূরে গড়াইয়া পড়ে, আর সময়ে কোন কোন স্থানে সেইগুলি রাশীকৃত জমিয়া আবার নূতন পাহাড় হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ এক ভাষা ব্যবহৃত হইয়া গিয়া কালে অন্য ভাষায় পরিণত হয়। দুইটিই স্বতন্ত্র ভাষা, কোনটাই কদর্য্য অপভ্রংশ নয়। দুইটারই মজ্জা এক, কিন্তু স্বাভাবিক কারণ বশতঃ দুইটার ভিন্ন আকার ও প্রকৃতি।

আর একটা আমাদের বড় দোষ। আমরা বাঙ্গালায় নূতন কথা প্রস্তুত করিতে পারিলেও সংস্কৃতের আশ্রয় লইয়া থাকি। 'হেঁটমাথা', 'হাঁটু লম্বা' এইরূপ সরল ও চমৎকার বাঙ্গালা পদ থাকিতেও লোকে ঐ সকল ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন, আর সেগুলির বদলে 'অবনত-মস্তক,' 'আজানুলম্বিত' পদগুলি লিখিয়া থাকেন। কেন, আমরা কি বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালা কথা লিখিতে লজ্জা বোধ করি? যার অপেক্ষা গুরুজন এ সংসারে আর কেহই নাই, আমরা বড় হইয়া তাঁর কাছে যে সকল কথা ব্যবহার করি, সেই সকল কথা লিখিতে কুণ্ঠিত হই? ভারতবর্ষের প্রায় সব ভাষায় ভাইকে 'ভাই' বলে ও লেখে; কিন্তু আমরা 'ভাই' বলি, অথচ লিখিবার সময় আমাদের প্রমাদ ঘটে, আমরা 'ভ্রাতা' লিখি। 'চাঁপা' ছাড়িয়া দিয়া আমরা 'চম্পক' ভক্ত হইয়াছি, 'চাঁদ' ছাড়িয়া দিয়া 'চন্দ্র' শব্দ খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছি;— যদিও 'চম্পক' ও 'চন্দ্র' হতে 'চাঁপা' ও 'চাঁদ' অনেক মিষ্ট।

এ সম্বন্ধে একটা কথা আমার মনে পড়িতেছে; কথাটী গল্প নয়, বাস্তব ঘটনা। একজন ইংরেজ ফ্রান্সের কোন নগরের এক হোটেলে বসিয়া খানসামাকে সুরুয়া ফরমাজ দিবেন। এখন সুরুয়ার ফরাসী নাম 'সূপ্' ইংরেজী নামও 'সূপ্', ইংরেজেরা ফরাসীদের থেকেই ঐ কথাটা লইয়াছে। ইংরেজ মহাশয়ের জ্ঞান ছিল যে, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা সকল বিষয়েই ভিন্ন। তিনি খানসামাকে বলিলেন—খানসামা 'সুপে'। খানসামা না বুঝিতে পারিয়া বাক্‌শূন্য হইয়া রহিল। ঐ ব্যক্তির সঙ্গী তাঁহার বিদ্যা বুঝিতে পারিয়া বলিল—ওহে, ইংরেজীতে ফরমাজ দাও, খানসামা বুঝিতে পারিবে। তখন ইংরেজ মহাশয় 'সূপ' বলিলেন, খানসামাও তাঁহাকে তখনই সুরুয়া আনিয়া দিল।

বাস্তবিক বাঙ্গালা বই পড়িলে বোধ হয় যে, বাঙ্গালা ভাষা ঠিক বুড়ো

খোকার মত, বড় হইয়াও আপন চেষ্টায় অন্য আহারে নিজের পুষ্টি না করিয়া সর্ব্বদা মার দুধ খাইতে ভালবাসে। মা হলেও রক্ষা থাকিত, কিন্তু সংস্কৃত বাঙ্গালার মা নয়, মার মাও নয়। সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত, প্রাকৃত থেকে হিন্দী, হিন্দী থেকে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইয়াছে। আচ্ছা, যেখানে দুই প্রকারের কথা প্রচলিত আছে, সেখানে দুইটা দুই অর্থে ব্যবহার করিলেই ত বেশ হয়। সকল ভাষায় ঐ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দীতে পর্য্যন্তও তাই; যেমন 'দেখ্না' শব্দে সামান্য দেখা বুঝায়, কিন্তু 'দর্শন কর্না' বাক্যে কেবল ঠাকুর তীর্থাদি দেখা বুঝায়। আমরা বাঙ্গালায় সেরূপ করি না কেন? আমরা কি এতই তরল ও এতই অসার যে, একটু আয়াস করিয়া এই সামান্য প্রভেদ বজায় রাখিতে পারি না? আজকাল 'সাধু ভাষা' অর্থাৎ পণ্ডিতী ভাষার অধিক আদর দেখিতে পাই। একটু সংস্কৃত বা ইংরেজী অন্তরে গেলেই অমনি আমরা বাঙ্গালার প্রতি ধিক্কার করি; আর সংস্কৃতের আড়ম্বর বা ইংরেজীর ছটা ব্যতিরেকে বাঙ্গালা বই রচনা করা ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'সাধুভাষী' মহাত্মারা ভাবেন না যে, প্রকৃতি চিরকালই সুমুখে অগ্রসর হয়, কখন পশ্চাতে ফিরে না। চলিত ভাষা ছাড়িয়া পুরাণ বাক্য-রীতির অবলম্বন আর গঙ্গার স্রোতের গতিরোধ করা একই প্রকার। হিমালয়ের কঠিন পাষাণময় চূড়া সকল বৃষ্টির দ্বারা কোটি কোটি খণ্ডে বিভক্ত হইতেছে, সেই খণ্ডগুলির সারভাগ গঙ্গার জলে ভাসিয়া আসিয়া আমাদের বাঙ্গালা দেশকে উর্ব্বরা করিতেছে; আমরা কি এই উর্ব্বরা ভূমিকে সেই সব জমাটবাঁধা পাহাড়ের পরিভ্রষ্ট সন্ততি বলিয়া ঘৃণা করিব?

বাঙ্গালা বই পড়িতে আমার যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হয়, তাহা বলিতে পারি না। বিদেশীয় ভাষায় দশ খানা বই পড়িয়া মনে যে সুখ না পাই, নিজের ভাষায় একখানা ভাল রচনার পাঠে তাহার

অপেক্ষা দশ গুণ আনন্দ লাভ করি। কিন্তু বাঙ্গালাকে যেমন ভালবাসি, উহাকে কেহ বিকৃত করিলে সেইরূপ কষ্ট পাই। বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে বিভাষার ব্যবহার দেখিলে আমার গা জ্বলিয়া উঠে; বই পড়ার সমস্ত সুখ একেবারে চলিয়া যায়। সেদিন একখানা বিখ্যাত বই পড়িতে-ছিলাম। দেখিলাম এক শ একত্রিশ পৃষ্ঠার মধ্যে সংস্কৃত হতে এগারটী ও ইংরেজী হতে চোদ্দটী উদ্ধৃত বাক্য রহিয়াছে; তার মধ্যে একটী ইংরেজীতে এগার ছত্রের। ইহা ব্যতীত "হেমাম্বুদকিরীটিনী' 'সপ্তমী-চন্দ্রাকৃতলালটতলস্থ' প্রভৃতি আছোলা আচাঁচা সংস্কৃত সমাসঘটিত পদের অভাব নাই। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, কজন লোকে ঐ সকল ভাল করিয়া বুঝিতে পারে? ঐ সকল ভাব কি বাঙ্গালা পুস্তকে অবিকল ব্যক্ত হয় নাই, না ঐ সকল দীর্ঘ বিশেষণ বাঙ্গালায় প্রকাশ করা যায় না? যদি গ্রন্থকারের কেবল শ্রুতিমধুর কথার দ্বারা পাঠকদের মন ভুলাবার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অভ্যাসকে আমি মহাপাপ বলি, কারণ উহাতে প্রতারণা করা হয়। কজন লোকে গ্রন্থকারের সমস্ত লেখার মর্ম্ম গ্রহণে সক্ষম হয়? আর কজন কেবল গল্পটী জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকে? সাধারণ লোকদের ত কথাই নাই, একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী, সংস্কৃত ও ইংরেজী না জানিয়া, কেবল এক অভিধানের সাহায্যে ঐ বই কি বুঝিতে পারে?

শুধু গ্রন্থকারের দোষ নয়, আমরা এরূপ জঘন্য অবস্থায় আসিয়াছি যে, কেবল মিষ্ট সুললিত কথা পড়িয়া ভুলিয়া যাই; ভাবার্থ যাহাই হউক না কেন, বা তাহা বুঝিতে পারি আর নাই পারি, বাহ্যাড়ম্বর থাকিলেই আমরা বইয়ের আদর করি। আর আমরা বাল্যকাল থেকে নিজেদের অন্যান্য জিনিসের মত নিজেদের কথাকেও ঘৃণা করিতে শিখি। সরলতা ও বিনয়ের আদর নাই। আজকাল যে অতি জোরে

ঢাক বাজাতে পারে, তাহারই রাজ্য। "ধূমধাড়াক্কা সকলই ফক্কা", এই উক্তি আমাদের বাঙ্গালীদের পক্ষে যেমন খাটে, তেমন আর কোন জাতির মধ্যে খাটে না। গল্প নাটক ছাড়া আর কিছুই আমাদের ভিতর প্রবেশে না, আর তাহাও নানা রকম তীব্র মশলা না মিশাইলে অন্তর্গত করিতে পারি না।

আমি দূর থেকে দেখিতে পাইতেছি, আমার কোন অমায়িক পাঠক হাসি চাপিয়া বলিতেছেন—ওহে, হুঁতোরাম, অত চট কেন হে? সামান্য ভাষা লইয়া অত মাথা গরম কেন? ভাষা পরিচ্ছদ মাত্র, ভাল ভাব থাকিলে ভাষার অল্প ব্যত্যয়ে কুপিত হওয়া বিবেচকের কাজ নয়। আর যে গ্রন্থকারের রচনা সমালোচনা করিলে, তাঁহার ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আগে লেখ, তারপর তাঁহার দোষগুণের বিচারে প্রবৃত্ত হইও। আমি কাহারও উপর চটি নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাহাকে চটাতে ইচ্ছা করি না; তবে আমি আগেই বলিয়াছি যে, আমার রকমই ঐরূপ। আমার মনে যেমন ভাবের উদয় হইয়াছে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাই লিখিয়াছি। আমার নিবেদন এই যে, আমরা মাছ খাই, মাছ ধরি, কাপড় কিনি, কাপড় পরি; তবে লিখিবার সময় মৎস্য আহার করি, মৎস্য ধৃত করি, বস্ত্র ক্রয় করি, বস্ত্র পরিধান করি কেন? আর তিন কোটী লোকের মধ্যে এক হাজার যে ভাষা ভাল বুঝে, অপর ২,৯৯,৯৯,০০০ লোক হয় একেবারে বুঝে না কিম্বা আধ আধ বুঝে, সেরূপ ভাষায় লিখিবার প্রয়োজন কি? ভাষার উদ্দেশ্য মনের ভাব প্রকাশ করা, আর এরূপে প্রকাশ করা যে অপরে লেখকের যথার্থ ভাব অনায়াসে বুঝিতে পারে। ভাষা ভাবের পরিচ্ছদের মত বটে, কিন্তু যে পরিচ্ছদ আমাকে মানায় না, যাহা পরিয়া আমি সহজে কাজ করিতে পারি না, যাহাতে আমার সকল কর্ম্ম করিতে অনেক বাধা পড়ে, যাহা

আমার পরিচ্ছদের কাজ না করিয়া আমাকে সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে—সে পরিচ্ছদ আমার পক্ষে উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত, তাহাই জানিতে চাহি। আমার মতে ভাষা নদীর জলের ন্যায়; যখন সে জল তরল ও স্বচ্ছভাবে বহে, তখনই আমরা নদীর অন্তর্ভাগ ভাল দেখিতে পাই। আজকাল লোকে বড় ইংরেজী ভক্ত; আচ্ছা আমি যে সকল দোষের কথা উপরে উল্লেখ করিলাম, সেগুলি কি ইংরেজীতে দেখা যায়? বাঙ্গালা, উড়িয়া ও আর দুই একটী ভিন্ন কোন্ ভাষায় ঐরূপ অসঙ্গতি দেখা যায়? পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে ফরাসী গদ্য অদ্বিতীয়। উহার প্রধান গুণ কি?—সরলতা ও স্বচ্ছতা। একজন সামান্য ফরাসী অতি গভীর বিষয়ের একখানি ফরাসী বই যেমন বুঝিতে পারিবে, একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী একখানা বাঙ্গালা নভেলেরও ভাষা তেমন সহজে বুঝিবে না।

এমন কোন ভাষা নাই, যাহাতে বাঙ্গালার মত লেখা ও কহা ভাষায় এত প্রভেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর আমাদের ভাষার মত অন্য কোনটীর এত অন্তর্ভাষা নাই। আমাদের দেশের চাষারা এক রকম কথা কহে, এক ভাষায় আমরা মোকদ্দমা করি, এক ভাষায় ভট্টাচার্য্যেরা পূজাদি করে, এক ভাষায় ভদ্রলোকেরা পরস্পর আলাপ করে, এক ভাষায় স্ত্রীলোকেরা মনের ভাব প্রকাশে, আবার এক ভাষা ইতর লোকেরা ব্যবহার করে। হিন্দী বল, মার্হাট্টী বল, ফার্সী বল, ইংরেজী বল, ফরাসী বল, কোন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মুখে বাঙ্গালার মত এক ভাষার এমন বহু রূপান্তর শুনা যায় না। অবশ্য লোকের শিক্ষা ও বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে সকল দেশেই বাক্যরীতির ও কথাভঙ্গির প্রভেদ দেখা যায়। কিন্তু আসল ভাষায় অতি অল্পই বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। সংস্কৃতে বলিতে পার যে, বাঙ্গালার ন্যায় স্ত্রীলোকেরা ও

ইতর লোকেরা সংস্কৃত না কহিয়া প্রাকৃত ব্যবহার করিত। কিন্তু কথাটা হইতেছে এই যে, বিশুদ্ধ সংস্কৃত কখন কেহ সচরাচর কহিত কি না, তাহাতে বড় সন্দেহ; আর যদিও যথার্থ সংস্কৃত এক কালে চলিত ছিল, অধিক লোক যে সে ভাষা বিশুদ্ধ ভাবে ব্যবহার করিত, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বিশেষ, সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালার তুলনা হতে পারে না; বর্ত্তমান ভাষার সঙ্গেই বর্ত্তমান ভাষা মিলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য। অনেকে বলিতে পারেন, বাঙ্গালার অনেক অন্তর্ভাষা শুনা যায়, এই কারণেই লিখিবার সময় বইয়ের ভাষা ব্যবহার করাই শ্রেয়। এ যুক্তিতে কোন সত্ত্ব নাই। রাজপুতানার হিন্দী কথাতে আর বেহারের হিন্দী বোলিতে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বলিয়া কি খাস্ হিন্দীতে লেখা বইয়ে হিন্দীর বদলে সংস্কৃত কথা ব্যবহার করে? ইউরোপের ইটালী দেশে অনেক অন্তর্ভাষা ছিল, এমন কি এক জন মিলানী একজন নিয়াপলিটানের কথা বুঝিতে পারিত না; এখনও উত্তর ও দক্ষিণ ইটালির ভাষায় অনেক প্রভেদ আছে, আর ইটালীয় ও লাটিনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; তাহা বলিয়া কি ইটালীয়েরা বই লিখিতে গিয়া ইটালীয় কথা ফেলিয়া লাটিন কথা বসায়?

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারের দোষগুণ বিচারের বিষয় বল আমি ত তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। আমি কেবল বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে গুটিকতক মনের কথা লিখিলাম, ঐ প্রসঙ্গে তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে দুই একটা কথাও বলিলাম। তিনি এখনকার বাঙ্গালা লেখকদের মধ্যে সকলের প্রধান; আমি তাঁহার ভাষাতে পর্য্যন্তও দোষ সহিতে পারি না। আমার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু আমি কখনই পরের অপকারী বা গুণদ্বেষী নহি। আমি যেমন ভাল লেখকদের সম্ভ্রম করি, এমন আর কেহই করে না; আমি যেমন ভাল বাঙ্গালার আদর

করি, এমন আর কেহই করে না। তবে যাকে যত ভালবাসি, তার উপর তত চটি, কিন্তু সে রাগ আন্তরিক ভালবাসার রাগ, সে বিদ্বেষের রাগ নয়। আর—কি?—আমি ঐ লেখকের দোষগ্রাহী? না, তাহা কখনই সম্ভবে না। যিনি সরস ও সুমিষ্ট রচনার দ্বারা ভুবন মোহিত করিয়াছেন—যাঁহার সুন্দর চরিত্রবর্ণনা ও সুমধুর উপাখ্যানরীতি আজও অপরাজিত রহিয়াছে—যাঁহার মনোহর বাক্যবিন্যাস ও সুললিত লিখনভঙ্গী কেহই অনুকরণ করিতে সক্ষম হয় নাই—যিনি বাঙ্গালা ভাষার অদ্ভুত ক্ষমতা ও সমুজ্জ্বল শোভা বিস্তারিয়াছেন, যাঁহার গ্রন্থ বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বিদেশীয়দের নিকট বাঙ্গালার মহিমা ও গৌরব প্রচার করিয়াছে—যিনি বাঙ্গালীদের বুদ্ধি ও চাতুর্য্যের প্রভূত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেশে বিদেশে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সুনাম ও সুখ্যাতি ঘোষণা করিয়াছেন;—আমি কি সেই লেখকের দোষগ্রাহী? *

আমি প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কত দূর আসিয়া পড়িয়াছি! নিজের কথা বলিতে বলিতে বাঙ্গলা ভাষা লইয়া একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছিলাম। সাধে কি লোকে আমায় পাগল বলে? যাক্, এখন আবার হুঁতোরামের বৃত্তান্ত আরম্ভ করি। আমার বয়স ঐ সময়ে প্রায় ষোল বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল, আমিও দিন দিন বাড়িতে লাগিলাম, আমার শরীর সবল ও দৃঢ় হইয়া আসিল। পুস্তকপাঠই তখন আমার সর্ব্বপ্রধান কাজ ছিল; অন্য সকল চিন্তা দূর করিয়া মনপ্রাণে কেবল নানা বিষয়ের বাঙ্গালা ও ইংরেজী বই পড়িতাম। বাড়ীর নূতন শিক্ষক আমাকে যে সব বই পড়িতে বলিতেন, তাহা ফেলিয়া আমি আমার সাধের বইই পড়িতাম। তিনি অতিশয় নিরীহ ভালমানুষ ছিলেন; অনুনয় বিনয় করিয়া পাঠ্য পুস্তকে

* যখন এই পুস্তক লেখা হয়েছিল, তখন ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবিত ছিলেন।

আমার মন লওয়াইবার জন্য অনেক চেষ্টা পেতেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত আয়াস বিফল হত। ইহার নিকট কিম্বা ইহার পূর্ব্বগামীর নিকট আমি কোন উপকার লভিয়াছিলাম কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান শিক্ষক অমন ভদ্রলোক ও কোমলস্বভাব ছিলেন, তথাপি তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা তাঁহার বাক্যপালন করিতাম না স্মরিয়া, এখন নিজেকে ভৎ'সনা করি ও আমার বাল্যকালের একগুঁয়ে অভ্যাসকে ধিক্কার দিই। কিন্তু আমি কি করিব, ইহার পূর্ব্বগামী সকলের পথে কাঁটা পুতিয়া গিয়াছিলেন। সে শিক্ষক যে একেবারে সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, তাহা কেহই জানিত না। পিতা ও অন্যান্য গুরুজনেরা দেখিলেন যে, ঘরের মাষ্টার হতে আমার কোন উপকার দর্শিল না; তাঁহারা পরামর্শিয়া শিক্ষককে বিদায় দিলেন। আমি লেখাপড়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লভিলাম। আমার যাহা ইচ্ছা সেইরূপ বই পড়িব; এটা পড়িও, সেটা পড়িও না—এরূপ আর কেহই বলিবে না ভাবিয়া আমার মনে যারপরনাই আহ্লাদ হইল।

এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। খুড়ার প্রায় সব বাঙ্গালা পুস্তকগুলি শেষ করিলাম, আর ইংরেজী যাহা বুঝিতে পারিতাম, এমন কয়েকখানি বইও পড়িলাম। হাতে যা টাকা পয়সা জমিত, তাহা সমস্তই সেই পাড়ার দোকানে খরচ করিতাম। রোজ সেখানে দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়া এটার খানিকটা ওটার পাতা কতক এ রকমে অনেক ইংরেজী বই হাঁটকাতাম; আর যেটী আমার পছন্দ হত, আমি তৎ-ক্ষণাৎ নগদ বা ধারে কিনিয়া আনিতাম। তখনও আমার ইংরেজীতে প্রবেশ হয় নাই; আর কি পড়িব, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতাম না ও ঐ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসিতাম না, এজন্য আমার নিজের বিবেচনায় যাহা ভাল লাগিত ও যাহা আমার মনকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিত তাহাই পড়িতাম।

উপরি বই পড়িতে পড়িতে আমার পাঠ্য পুস্তকগুলির প্রতি মন ফিরিল, আর কালগতিকে সে গুলির প্রতি আগেকার বিষম বিদ্বেষ চলিয়া গেল। আমি নিজের যত্নে যতদূর পারিতাম বাড়ীতে স্কুলের পড়া অভ্যাসিতাম ও স্কুলে এক রকম বেশ পড়া দিতাম। মাস কয়েকের মধ্যে শ্রেণীর বদ্ ছেলেদের সঙ্গ ছাড়িলাম। ভাল ছেলেরা আমার প্রতি দৃক্‌পাতও করিত না, কিন্তু তখন আমাকে বেশ পড়াশুনা করিতে দেখিয়া তাহারা চমকিয়া উঠিল। তাহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, আমাতে কোন পদার্থ আছে বা কোনকালে আমার দুর্গতির নিরাকরণ হবে ; এ জন্য সহসা আমার উন্নতি দেখিয়া তাহারা অতিশয় আশ্চর্য্য হইল ও আমার সম্বন্ধে পরস্পর দুই চারটা কথা বলিতে লাগিল। তাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার সঙ্গে সরলভাবে মিশিতে আরম্ভিল, কেহ কেহ আদর ও সম্ভ্রম করিতে লাগিল, কাহারও কাহারও অন্তরে নূতন সমকক্ষের প্রতি হিংসা জন্মিল।

পিতা লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে, স্কুলে আমার বিদ্যাশিক্ষা তখন বেশ হইতেছিল। তিনি আমার সম্বন্ধে সব আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; ঐ নূতন অভাবনীয় সংবাদ শুনিয়া তিনি যেন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিলেন, তাঁহার আস্থাশূন্য মনে যেন কি এক নূতন ভাবের উদয় হল। তিনি ক্রমে আমার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিতে লাগিলেন ও আমাকে ডাকিয়া পড়াশুনা সম্বন্ধে কখন কখন জিজ্ঞাসিতেন। বোধ হইল, যেন আমার প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মিল, অথবা তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন মমতা সঞ্চারিল। যাহাই হউক, ঐ সময়ে আমার প্রতি তাঁর টান পড়িল, তিনি যেন আমাকে ভালবাসিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম—পিতা, এতদিন আপনার যত্নে আমার কিছুই হয় নাই, আপনি বরাবর আমাকে দূরছাই করিয়া আসিয়াছেন, এখন

নিজের যত্নে একটু লেখাপড়া শিখিলাম, তাই এতদিনের পর আপনি আমায় ভালবাসিলেন।—মা চিরকালই আমার প্রতি স্নেহময়ী ছিলেন, যদিও তাঁর রুগ্ন অবস্থার দরুণ তিনি বেশী স্নেহ প্রকাশিতেন না বা আমার বিশেষ কিছু করিতে পারিতেন না, তবুও আমি জানিতাম যে, এ পৃথিবীতে মার মত কেহ আমাকে ভালবাসিতেন না। আমার মঙ্গল সংবাদে তাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। ভালই হই আর মন্দই হই, আমি তাঁহার কাছে সেই হুঁতোই ছিলাম। তবে এতদিনের পর পিতার সাড় হল দেখিয়া তিনি এক নূতন আনন্দ বোধ করিলেন, আর ছেলের ভাল কথা শুনিয়া কোন্ মার অন্তর আহ্লাদে না উথলিয়া উঠে? তিনি ঐ সময়ে অনেকটা সুস্থ ও সবল হইয়া আসিয়াছিলেন আর তাঁহাকে প্রায় প্রসন্ন দেখিতাম। খুড়া, খুড়ী ও বাড়ীর অন্যান্য লোকেরাও আমার প্রতি অতিশয় প্রীত ও সদয় হলেন।

আমার পাঠ-লালসা পরিতৃপ্ত না হইয়া ক্রমে দ্বিগুণ ভাব ধরিল; যতই পড়িতাম, ততই আমার পড়িতে আরো ইচ্ছা যাইত। দিন কয়েক ঐ সম্বন্ধে আমি জ্ঞানশূন্যের মত ছিলাম। পিতা মাতা ইহা জানিতে পারিয়া, আমার স্বাস্থ্যের হানি ঘটিবে বা হঠাৎ আমি কোন বিষম রোগে পড়িব, এই আশঙ্কায় স্কুলের শীতের অবকাশের সময় আমার সেই পল্লীগ্রামে মামারবাড়ী যাবার ব্যবস্থা করিলেন। পিতা পত্র-দ্বারা মামাকে সমস্ত জানালেন ও ছুটী আরম্ভ হওয়াতে, একজন লোক দিয়া, আমাকে মামারবাড়ী পাঠালেন। আমি মনকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিই, এই মানসে পিতা আমাকে একখানা বইও সঙ্গে লইয়া যাইতে দিলেন না।

আমার সমস্ত জীবনের মধ্যে ঐ সময়ে আমি শরীরের ও মনের সকলের অপেক্ষা সুখময় অবস্থায় ছিলাম। আমি যুবক, সুস্থ ও

বলিষ্ঠ; সংসারের বিপদ আশঙ্কায় অনভিজ্ঞ; আমার নিজের ও পরের প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। জীবনের যে সময়ে মন ও হৃদয়ের সকল বৃত্তিগুলি বিকশিতে থাকে, যে সময়ে নিজান্তরের প্রতিভায় প্রতিভাত হইয়া সমস্ত সংসার, সমস্ত জগৎ আমাদের নিকট সর্ব্বাঙ্গীন সুখময় ও সমুজ্জ্বল শোভাবান হয়—আমি তখন সেই অবস্থায় উপস্থিত। আমার হৃদয়ে কোনমাত্র ক্লেশ ছিল না। পিতামাতা প্রভৃতি সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন ও স্নেহময়; ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র আমি আদরিত হতাম; আমার সেই বাল্য-সহচর ভূতোকে আবার দেখিব ভাবিয়া মন আহ্লাদে পরিপ্লুত হইল, মধুর স্বভাব মামার মৃদু সম্ভাষণ শুনিব বলিয়া হৃদয় উথলিয়া উঠিল। মামীর কথা সব মনে পড়িল। তিনি আমার প্রতি যে স্নেহপূর্ণ আস্থা লইতেন; তাঁহার সাদর সম্ভাষণ, তাঁহার স্নেহময় চাহন; যাত্রাকালে এই সকলই এককালে আমার মন ব্যাপিয়া রহিল, আমি মনোহর সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। কোন প্রকার আশঙ্কা, কোন প্রকার সন্দেহ এ স্বপ্নের বিঘ্ন করিল না। আমার অন্তরে কোন প্রকার যাতনা বা ভাবনা রহিল না।

এইরূপে উল্লাসিত মনে আমি মামারবাড়ী চলিলাম। চমৎকার কল্পনা, যৌবনসুলভ অভিলাষ, মায়াবী আশা আমার অন্তরে অনুক্ষণ বিরাজিতে লাগিল। পথে যে সকল দ্রব্য দেখিলাম, সে সকলই যেন আমার আনন্দের জন্য সৃজিত হইয়াছে ভাবিলাম। ভূতো ও আমার পূর্ব্বকথা স্মরিলাম। বাড়ীর ভিতরে গ্রাম্য খেলা, মাঠের উপর দৌড়া-দৌড়ী; ফুল ও ফুলের বাগান, পুকুর ও পুকুরে স্নান; চাঁদ ও চাঁদের আলোতে বিচরণ; গাছের উপরে সুমিষ্ট ফল, গাছের ছাওয়ায় সুস্নিগ্ধ গন্ধ; প্রচুর দই, প্রচুর ক্ষীর; রমণীয় অলসতা, শান্তি, সরলতা, যথেচ্ছা ভ্রমণ—এই সকল একে একে আমার মনে জাগিল।

ঐ সব সুখের কথা চিন্তিতে চিন্তিতে আমি মামারবাড়ী পৌঁছিলাম। কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার বিপরীত ঘটিল। দিনকতক সেখানে থাকিতে না থাকিতে আমার মনে কি এক বিরক্তি জন্মিল। আমি যেন সব আলাদা দেখিলাম। ভূতো বড় হইয়াছিল ও তাহার বয়স প্রায় আমারই সমান, কিন্তু তাহার মন ও আমার মন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ধাবিতেছিল। তাহার স্বভাব সেই বাল্যকালের মত সরল ও নিরীহ ছিল, তাহার হৃদয় পূর্ব্বে যেরূপ বিমল ও অক্ষুণ্ণ ছিল, তখনও উহা সেইরূপ; কিন্তু আমাতে বিকার ঘটিয়াছিল, আমার স্বভাবে কত ঝড়, কত তুফান বহিয়া গেল। নানা প্রকার পুস্তক পাঠে আমার মনে দাবানল জ্বলিতেছিল, নানা প্রকার চিন্তা ও কল্পনায় জর্জ্জরিত হতেছিলাম; কিন্তু তাহার শান্ত প্রকৃতি সেইরূপই ছিল, ভাবনা আসিয়া তাহার নির্ম্মল মনকে কলুষিয়া দেয় নাই। মামা, মামী, বাড়ী, ঘর, গাছ, মাঠ— সকলই প্রায় সেইরূপ ছিল, কিন্তু বাল্যকালের সে পরম, পবিত্র, সরল আনন্দ অনুভবিলাম না। আমার মন একেবারে মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সর্ব্বদাই যেন কিসের কারণে হু হু করিত।

পিতাকে পত্র লিখিয়া আমি আবার কলিকাতার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। যে আশায় পাড়াগাঁয়ে গিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ বিফল হল; আমি মানসিক বিশ্রাম লভিলাম না। আমি যাহাতে আদবে মনের চালনা না করি, এই আশায় পিতা আমাকে একখানা বই সঙ্গে লইয়া যাইতে দেন নাই, কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, আমার হিতে বিপরীত ঘটিবে। তিনি জানিতেন না যে, আগুণ দাউ দাউ করে একবার জ্বলিলে, তাতে জল সিঁচিলে আরো প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠে। যথার্থই সে সময়ে আমার স্বভাব অত্যন্ত বিরূপ হইয়া গিয়াছিল। যে প্রকৃতিকে আমি অত ভালবাসিতাম, যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্যের আলোচনায়

অত মগ্ন থাকিতাম; সেই প্রকৃতিকে যখন পেলাম, তখন তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করিলাম না। ঐ ষোল বৎসর বয়সে আমার বাল্য-ক্রীড়া, বাল্য আমোদ-প্রমোদ সকলই তুচ্ছ ভাবিলাম। আমার মনে এতই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল!

বাড়ীতে আসিয়া আমি আবার পুস্তক পাঠে নিমগ্ন রহিলাম। পড়িতে পড়িতে আমার মাথা এক একবার ঘুরিয়া যাইত, রাশি রাশি চিন্তা আসিয়া আমাকে জড়ীভূত করিত। আমার কল্পনা-শক্তি অতিশয় প্রখর হইয়া উঠিল। যেমন নানা রকমের বই পড়িতাম, তেমনি নানা রকমের কল্পনা কল্পিতাম। সময়ে সময়ে বই বন্ধ করিয়া নীল আকাশের দিকে চাহিয়া বিবিধ আকাশ-কুসুম রচিতাম। সেগুলির মধ্যে একটী আমার বেশ স্মরণ আছে, তাহা নীচে লিখিতেছি।

একদিন অতি ভোরে ছাদের উপর বসিয়া একখানি ইংরেজী বই পড়িতেছিলাম; বইখানার নাম মনে নাই, কিন্তু উহা পড়িতে পড়িতে আমার মনে ভাব লাগিয়া গেল। তখন বাড়ীর কেহই উঠে নাই; কোন শব্দও নাই। কেবল মাথার উপরে নীল আকাশে তখনও দুই একটা তারা ঝকিতেছিল; আমার হাতে বই, কল্পনা আমার একমাত্র সঙ্গী। কিছুক্ষণ পরে বইখানি কোলে ফেলিলাম ও গালে হাত দিয়া আকাশের দিকে শূন্যভাবে তাকাইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, আমি লেখাপড়া শেষ করিয়া বড় হলে পর, দুই তিন শ টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম করিব; একটী সুন্দরী, সরলা, সুশিক্ষিতা ও সুমার্জ্জিতা স্ত্রী হবে। কিছু টাকা জমাইয়া কলিকাতার অল্প দূরে গঙ্গার তীরে একটী বাড়ী কিনিব। বাড়ীর চারদিকে বাগান থাকিবে; সুমুখে ফুলগাছ, ফুলের কেয়ারী; তারপর একটী পরিষ্কার সবুজ ঘাসাল চৌকোণ; তারপর পুকুর, পুকুরে শানবাঁধান ঘাট, আর চারপাশে বড় বড় ফলের

গাছ। বাগানের চারদিক মেতির বেড়ায় ঘেরা থাকিবে; এক কোণে একটু খোলা মাঠে দুই চারিটী ছাগল, ভেড়া ও তাদের বাচ্ছা চরিবে। অন্য এক কোণে একটী গোয়ালঘরে গাই ও বাছুর থাকিবে; আমরা রোজ সকালে তার টাট্‌কা দুধ খাব। বাড়ীটী ছোট রকমের, ছয় সাতটী মাত্র ঘর; সে গুলির মধ্যে একটী ঘর ঠিক গোল। ঐ গোল ঘরটী আমার পুস্তকাগার করিব; মেজে থেকে ছাদ পর্য্যন্ত চারদিক বইতে ঠাসা, আর আমি ঠিক মাঝখানে বসিয়া নানা ভাষার নানা রকমের বই পড়িব। সে ঘরে কাহারও যাবার অধিকার থাকিবে না, স্ত্রীরও সেখানে যাইতে নিষেধ। স্ত্রীর সঙ্গে বাগানের ভিতর বেড়াইয়া বেড়াব; পুকুরের ঘাটে বসিয়া সকল বিষয়ের কথা কহিব; দুজনের এক মনপ্রাণ, দুজনের এক চিন্তা ও এক বাসনা। ক্রমে আমাদের একটী ছেলে ও একটী মেয়ে হবে। বাড়ীতে অপর লোক দুই একটী মাত্র থাকিবে। ছেলে মেয়ে বড় হলে তাদের দুজনকে দুহাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াব; তাদের সঙ্গে খেলা করিব; ঘাসের উপর তাদের গড়িয়ে দিব; গাছের উপর আম পাড়িবার জন্যে তাদের তুলে ধরিব; আর তারা—বাবা, আবার এস, আবার এস—বলে আমাকে ঝুলাঝুলি করিবে। তাদের মুখে কেবল হাসি, তাদের অন্তরে কেবল আনন্দ; আমিও তাদের উপর স্নেহ ঢালিয়া দিব। চল পাঠক, দেখি আমার আকাশ-কুসুম কতদূর ফুটিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

স্কুল ও স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী।

সম্পূর্ণ সুখ বা সম্পূর্ণ দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা আমরা এ সংসারে জানি না। এ জীবনে সমস্তই অবিশুদ্ধ। লোকের অন্তরে কথন কেবল একটী বিশুদ্ধ ভাবের সঞ্চার হয় না, লোকে দুই মুহূর্ত্ত কথন এক অবস্থায় বর্ত্তে না। শরীরের রূপান্তরের ন্যায় আমাদের মনোগত ভাবগুলিতে ক্রমাগত তারতম্য হইয়া থাকে। ভাল ও মন্দ আমাদের সকলের ভাগ্যে ঘটে, কিন্তু উহাদের পরিমাণে প্রভেদ আছে। যে ব্যক্তি সকলের চেয়ে কম কষ্ট সহিয়াছে, সেই সকলের অপেক্ষা সুখী; যে সকলের চেয়ে কম আহ্লাদ অনুভবিয়াছে, সেই সকলের অপেক্ষা দুঃখী। আমরা সকলে এক বিষয়ে সমান; আমরা সর্ব্বদা সুখ অপেক্ষা অধিক দুঃখ ভুগিয়া থাকি। এই মর্ত্তভূমিতে দুঃখের অভাবকেই আমরা সুখাবস্থা বলি; আর কষ্টের পরিমাণ অনুসারে আমরা সেই সুখাবস্থার ইতরবিশেষ নির্ণয় করি।

দেখ, আমি এখন জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় কালে উপস্থিত; কোনরূপ সংসারের ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, পিতামাতার হাতে সমস্ত পার্থিব ভার; যথেচ্ছা আমার পাঠতৃষ্ণা মিটাইতেছিলাম, তথাপি আমি মনে সুখ পাই নাই। বাল্যস্বভাব আমি অনেক দিন হল ত্যজিয়াছিলাম, আমার ভালমন্দ জ্ঞান জন্মিয়াছিল, আমি এখন নিজের উপর ভর দিয়া চলিতাম। আত্মীয়জন, বন্ধুবান্ধব সকলেই আমার প্রতি প্রসন্ন, কোন দিকেই আমার কষ্টের কারণ ছিল না; তবে আমার মনের শান্তি হল

না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ভার, তবে এই মাত্র জানি যে, ঐ সময়ে আমার হৃদ্বৃত্তিগুলি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, আর আমি কল্পনায় একেবারে অভিভূত ছিলাম। আমার অবস্থার উপযুক্ত আমোদ আহ্লাদ ফেলিয়া আমি কি এক কল্পিত সুখের অন্বেষণে ধাবিতাম। দিবারাত্র আমি কল্পনায় ডুবিয়া থাকিতাম, বই পড়িতে পড়িতে মনে কত প্রকার বিচিত্র চিন্তার উদয় হত। কতবার আমি বিনা কারণে কাঁদিতাম, কতবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতাম, কিন্তু কিসের জন্য, তাহা বুঝিতাম না। এইরূপ কল্পিত বিষয়ের ভাবনায় ও সর্ব্বদা সেগুলির আলোচনায় আমার মনে চারদিক্‌কার সমস্ত বস্তুর প্রতি বিরক্তি জন্মিল, আর যে বিরলে থাকিতে আমি চিরকাল ভালবাসি, সে নির্জ্জনতার প্রতি আসক্তি, আমার ঐ বয়সে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইল। লোকের সংসর্গ ত্যজিয়া আমি একান্তে নিজের সুখ দুঃখ নিজেই ভুগিতাম। অপরের সঙ্গে মিশিতে হলে আমার অন্তরে ভয়ঙ্কর গোলযোগ ঘটিত; আমি যে ক্রমে কি পর্য্যন্ত লাজুক হইয়া আসিলাম, তাহা বলিতে পারি না।

আমার লাজুকতা সম্বন্ধে একটী কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের স্কুলে ছাত্রেরা একটী তর্ক করিবার সভা বাঁধিয়াছিল; প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছুটীর পর অনেকে মিলিয়া নানা বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিত ও সময়ে সময়ে মহা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হত। আমি ঐ সভার একটী নামমাত্র সভ্য ছিলাম, কেননা আমি সভ্য হইয়াও উহাতে প্রায় যোগ দিতাম না, আর যদি কখন বা যেতাম, এক কোণে বোবার মত বসিয়া থাকিতাম, সভার আসল কর্ম্মের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। আমি যে অন্য ছাত্রদের অপেক্ষা হীন বা তাহারা আমার অপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞানে অধিক পারদর্শী, তাহা নয়, আমার লাজুকতা ও ভয়শীলতা ঐরূপ বিচিত্র আচরণের এক মাত্র কারণ। আমার আলাপী ছাত্রেরা

আমাকে তাহাদের তর্কে যোগ দিবার জন্য অনেক উপরোধ করিত, কতবার তাহারা আমাকে উঠিয়া বলিতে জেদ করিত, কিন্তু আমি কিছুতেই তাহাদের কথার অনুবর্ত্তী হতাম না। আমার মনে হত, যেন সকলেই আমার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে, কেহ বা আঙ্গুল দিয়া তাহার বন্ধুকে দেখাইতেছে, কেহ বা আমার রঙ্গভঙ্গ দেখিয়া হাসিতেছে; আর আমি চোক তুলিতে পারিতাম না, নিজের জায়গায় আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকিতাম ও অন্যেরা কি বলিতেছে, তাহা শুনিতাম।

এক দিন বাড়ীতে ঘরে বসিয়া এই প্রসঙ্গে ভাবিতে ভাবিতে মনে হল যে, আমি কি কাপুরুষ, কত ছাত্রেরা বেশ অম্লানবদনে বক্তৃতা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে আমার অপেক্ষা কম লেখাপড়া জানে, তবে আমি অমন বোবার মত বসিয়া থাকি কেন? এইরূপ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া অবশেষে স্থির করিলাম যে, আগামী সভার অধিবেশনে আমি নিশ্চয়ই উঠিয়া বলিব। শনিবারে সভায় গিয়া উপস্থিত, কিন্তু সে দিন যেন ঘরটা একটু অন্ধকার দেখাতে লাগিল, আমার মনে কেবল—আজ উঠিয়া বলিব, আজ উঠিয়া বলিব—এই চিন্তা ঘুরিতে থাকিল, আমার পা যেন মেজেতে আল্‌গা আল্‌গা পড়িল, বোধ হল যেন সকলেই আমার দিকে তাকাইয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছে যে—আজ হুঁতো-রাম বক্তৃতা করিবে।—আমার মন উলট্ পালট হতে লাগিল তথাপি আমি আজ বলিবই, এই ঠিক করিয়া বসিলাম। কিন্তু যে সময়ে আমার বলিবার ইচ্ছা ছিল, সেই সময় না আসিতে আসিতেই, আমার ঘাম ছুটিতে লাগিল, আমার গলা শুকাইয়া আসিল, আমি জড়ের মত বসিয়া রহিলাম; আর একজন ছাত্র উঠিয়া বেশ বক্তৃতা করিল। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিজেকে যারপরনাই ধিক্কার দিলাম, ভাবিলাম, আমার ন্যায় হেয়, অধন্য, অপদার্থ বস্তু আর পৃথিবীতে কিছুই নাই; আমি ত

একটা মানুষ নই, আমি একটা গাধা, জন্তু, মাটীর ঢিপি মাত্র ; মাটীর ঢিপির অপেক্ষাও আমি অকিঞ্চিৎকর, কেননা আমাতে কোন সার নাই। পরে দুই চারখানা বই পড়িয়া আবার নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম ও মনকে দৃঢ় করিয়া আগামীবারে নিশ্চয়ই উঠিয়া বলিব, এই মনস্থ করিলাম। শনিবার আসিল, আমি সভায় গেলাম। আবার সেই সব গোলযোগ, আবার সেই সব উদ্বেগ, কিন্তু এবার প্রাণ যায় আর থাকে, তথাপি দাঁড়াইয়া বলিব অঙ্গীকার করিলাম। সভ্যেরা কেহই জানিত না যে, সে দিন আমার বক্তৃতা করিবার মানস ছিল, কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহ হয় নাই, কিন্তু যেই বলিবার অবসর আসিল, আমি উঠিতে যাইতেছি, এমন সময়ে মনে হল কে যেন গলাখাঁকৃরি দিল, আর কে যেন আমার দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া রহিয়াছে। আমার হৃৎকম্প হল, সব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এক মুহূর্ত্তে ধ্বসিয়া গেল ; আমি না বলিয়া বাড়ী আসিলাম।

বাড়ীতে আসিয়া আমার অন্তরের যাতনা পূর্ব্বের অপেক্ষা দুগুণ হল, নিজেকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা গেল ; ভাবিলাম, এরূপ তুচ্ছ, তরল, সকল কর্ম্মে অপটু জীবন রাখিবার কোন দরকার নাই। দুই দিন আহার নিদ্রা ত্যজিয়া কেবল নিজেকে তিরস্কার করিলাম। পরে আবার ভাবিলাম, আচ্ছা একবার বিফল হলাম, দুইবার বিফল হলাম, তিনবারের বার অবশ্যই সফল হব, এইরূপে মনকে নানাপ্রকার আশ্বাস দিলাম ও অধ্যবসায়ের নিকট কিছুই আট্‌কায় না স্মরিয়া, আগামীবারে নিশ্চয়ই উঠিয়া বলিব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম। কি বলিব, দিবারাত্র তাহাই ভাবিতে লাগিলাম, আর কোন রকমে ভড়্‌কিয়া না যাই, এই মানসে আমার বক্তৃতাটী একটী কাগজে লিখিয়া ক্রমাগত তার আবৃত্তি করিলাম ও বার বার নিজের ঘরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহা চীৎকারস্বরে বলিলাম। এইরূপ উত্তম ও অব্যর্থরূপে প্রস্তুত হইয়া আবার সভায় উপস্থিত। এবার

ঘরটা তত অন্ধকার বোধ হল না, গতবারের অপেক্ষা মন অনেক শান্ত ও ধীর ছিল, ভাবিলাম এইবার অবশ্যই কৃতকার্য্য হব, স্বয়ং বিধাতা আসিয়াও আমাকে থামাতে পারিবেন না। আমার বলিবার অবসর আসিল, আমি তড়াক্ করিয়া কলের পুতুলের ন্যায় খাড়া হইয়া উঠিলাম। কিন্তু যেই মুখ দিয়া—"মহাশয়গণ!"—বেরিয়া পড়িল অমনি যেন আমার চারদিকে সব ঘুরিতে লাগিল, সব ঝাপ্সা দেখিলাম, চৌকি টেবিলগুলা উপর দিকে পায়া করিয়া নাচিতে লাগিল, দর্দর্ করিয়া আমার ঘাম পড়িল, আমার হাত পা অবশ হইয়া আসিল, আমি একেবারে নিঝুম হইয়া পড়িলাম।—তারপর যে কি ঘটিল, তাহা আমার স্মরণ নাই, এইমাত্র মনে পড়িতেছে যে, ঐ অসংসাহসিক ক্রিয়ার পর আমার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল। আমি উহার পর সভায় আর কখন যাই নাই।

স্কুলে আমার বেশ পড়া চলিতেছিল, শিক্ষকেরাও আমার প্রতি বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন। মাস কয়েক এইরূপ কাটিয়া গেল, তারপর আমার সতর বৎসর পূর্ণ হবার কিছু আগে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। পরীক্ষার ফল ভাল হইয়াছিল, এ জন্য পিতামাতা প্রভৃতি সকলেরই মহা আনন্দ, সকলেই আমাকে আদর ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমিও দশ বৎসরের পর ভালয় ভালয় স্কুলের জীবন ফুরাল বলিয়া, পরম আহ্লাদিত হলাম। কিন্তু এতদিন এক স্কুলে পড়িয়াছিলাম, আমার যেন সে স্কুলের সকল জিনিসে এক রকম মায়া বসিয়াছিল, জন্মের মত সব বিদায় দিতে হবে বলিয়া আমার মনে কষ্টও বোধ হল। স্কুলের শিক্ষকদের প্রতি আমার বিশেষ আসক্তি জন্মে নাই, আর স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিও আমার বিশেষ ভক্তি হয় নাই। শিক্ষকেরা বেশ ভদ্রলোক ছিলেন, যথাসাধ্য যত্ন করিয়া পড়াতেন, কিন্তু তাঁহারা পাঠ্য পুস্তকগুলি লইয়াই ব্যস্ত

থাকিতেন। ঐ গুলির চর্চ্চা ভিন্ন তাঁহাদের সঙ্গে অন্য সম্পর্ক ছিল না। তাঁহারা পড়াতেন, আমরা পড়া শুনিতাম ও দিতাম, আমাদের সময়ে স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থা অতি জঘন্য ছিল, এখন তাহার কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা আমার উত্তম জানা নাই। *

পাঠক! আমি শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে গুটিকতক কথা লিখিতেছি, কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিও, যে লোক তোমাকে এই সব বলিতেছে, সে একজন বিজ্ঞও নয় বা একজন পণ্ডিতও নয়, সে একটা সরল, সামান্য মানুষ মাত্র, সত্যপ্রিয়,—কোন দলের অনুবর্ত্তী বা কোন ব্যবস্থার পক্ষপাতী নয়; বিজনবাসী—সাধারণ লোকজনের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই, এজন্য তাহার মনে কোন বিশেষ সংস্কারও নাই, কোন বিশেষ কুসংস্কারও নাই।

প্রথমত দেখা যাক্, আমরা দশ বৎসরে স্কুলে কি শিখিলাম। ইংরেজী ভাষা, সংস্কৃত ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস ও ভূবৃত্তান্ত—এই পাঁচটী আমাদের প্রধান শিখিবার বিষয় ছিল। এখন ঐ দশ বৎসর মোটামুটি পড়ার বিষয় সম্বন্ধে ভাগ করিলে দেখিতে পাই যে, পাঁচ বৎসর কেবল ইংরেজী ভাষার শিক্ষায় দিয়াছিলাম, দুই বৎসর অঙ্কে, এক বৎসর ইতিহাসে, এক বৎসর ভূবৃত্তান্তে, ও এক বৎসর সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃতে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক শ ছোট পৃষ্ঠার রামায়ণ মহাভারত হতে সংকলন ও একখানি ছোট ব্যাকরণ পড়িলাম, ইহাতে আমাদের কি উপকার হল? মৃত ভাষার চর্চ্চায় তিন উপকার হতে পারে, কেবল ভাষা শিক্ষা, নূতন জ্ঞান লাভ, ও মনের দীক্ষা। আমরা যাহা পড়িতাম, তাহার পোন্ ভাগের অধিক মুখস্থ করিয়া সারিতাম, ভাষার যথার্থ গঠন বা লিখনরীতি কিছুই শিখিতাম না, উহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হয় নাই। আর জ্ঞান শিক্ষা

* ৺ দেবেন্দ্রনাথ দাস স্বদেশে ফিরিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হবার পূর্ব্বে এই পুস্তক লিখেছিলেন।

বল, আমি যে ঐ কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়িয়া কি জ্ঞান পাইয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। আর যেরূপ তাচ্ছল্য ও অযত্ন করিয়া সংস্কৃত শিখিতাম, তাহাতে মনের দীক্ষা কি করিয়া হবে? স্মরণশক্তির পর্য্যন্ত যথার্থ চালনা হত না। আমরা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে একটা ভারী জিনিস তুলিলে আমাদের বাহুর দীক্ষা হয়, কিন্তু আমরা যদি প্রতিদিন তাহা না করিয়া আজ তুলিলাম, পরশু তুলিলাম, আবার তিন চার দিন পরে তুলিলাম, ও তাহাও যথাসময়ে আর যথাভাবে না করিয়া আমাদের যে সময়ে ইচ্ছা ও যেমন করিয়া হউক জিনিসটা তুলিলাম; তাহা হলে আমাদের বাহুর কি শিক্ষা বা দীক্ষা হল? আর আমাদের নিজ বাহুর উপর কি দমন রহিল? সেইরূপ আমরা যেরূপে সংস্কৃত শিখিতাম, তাহাতে মনের কোন প্রকার দীক্ষা হয় নাই।

ভূবৃত্তান্ত ও ইতিহাসে আমাদের স্মরণশক্তি কেবল চালিত হত, কিন্তু ঐ দুই বিষয়ে কোন যথার্থ জ্ঞান হইয়াছিল কি না সন্দেহ। যে পাঠেই বল, সূচিত দ্রব্যের জ্ঞানই সব, সেই দ্রব্যের সূচক শব্দ চিহ্ন বই কিছুই নয়। 'বে' বা 'উপসাগর' এই কথাটীতে সাগরের বিশেষ ভাগকে বুঝায়, কিন্তু সাগরের বিশেষ ভাগ একটা বই বা একটা কাগজের মত বাস্তবিক জড় বস্তু কি না? তাহা হলে সেই বাস্তবিক বস্তুটা সূচিত দ্রব্য, আর 'বে' বা 'উপসাগর' সেই দ্রব্যের সূচক চিহ্ন মাত্র। যেমন এক জনের নাম 'হরি,' 'হরি' কথাটা কেবল চিহ্নমাত্র। অনেক রক্তমাংসময়, নাকচোকবিশিষ্ট সজীব বস্তু আছে, 'হরি' এই নাম করিলে তাহাদের মধ্যে একটী ব্যক্তি-বিশেষের জ্ঞান আমাদের মনে উদয় হয়। কিন্তু আমরা বাল্যকালে কেবল ঐ সকল চিহ্ন শিখি, যে সকল বস্তুর জন্য ঐ সকল চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তাহার জ্ঞান পাই না। আমরা অনেক নগর, দেশ, নদীর নাম মুখস্থ করি, কিন্তু সেই সকল জিনিস কেবল কাগজে বা মানচিত্রে আছে, ইহা

ভিন্ন আমাদের মনে সেগুলির অন্য কোন জ্ঞান হয় না। একদিন আমাদের স্কুলে একজন আগন্তুক ব্যক্তি এক বালককে জিজ্ঞাসিলেন—ভূমণ্ডল কাহাকে বলে? সে উত্তর করিল—ভূমণ্ডল ফানুসের মত একটা গোল কাগজ। শিশুদের ভূবৃত্তান্ত শিখা অবিকল ঐরূপই হইয়া থাকে। আর দশ বৎসর কাম্স্কাট্কা, পারিস, গোয়াটিমালা, ও পৃথিবীর সকল দেশের বিষয় জানিলাম, কিন্তু কলিকাতা হতে হুগলি কি করিয়া বা কিসের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, তাহার জ্ঞান নাই।

ইতিহাসকে আমরা কেবল ঘটনা ও তারিখের রাশি বলিয়া জানিতাম; ঘটনাগুলির পরস্পরের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ বা তাহাদের অনুক্রমের যথার্থ ধারা কি, তাহার কিছুই বুঝিতাম না। ঘটনাগুলির যথার্থ জ্ঞান আর তাহাদের ও কারণের ফল জ্ঞান কি বিভিন্ন? সাধারণ ইতিহাসকে যদি কেবল কতকগুলি ঘটনার সংগ্রহ মনে করি, আর যদি সেই ঘটনাগুলির প্রবর্ত্তক মানুষদের বিষয় কিছুই না জানি, তবে সে ইতিহাস-পাঠে কি উপকার পাইলাম? কিছুই না। এরূপ পাঠে কোন প্রকার আস্থা বা কোন প্রকার আমোদ জন্মে না। যদি বল, বালকদের ঐরূপ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, আমার মতে সে কথা অমূলক। গোড়া থেকে এক জন বালককে ভাল বিধি মত শিখাও, আর তাহার ষোল সতর বৎসর বয়সে ইতিহাসের যথার্থ জ্ঞান, অন্তত যথার্থ জ্ঞানের আরম্ভ হয় কি না দেখ। অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়গুলি আমরা প্রথমে মুখস্থ করিতাম। যে সকল জিনিস বাঙ্গালাতেই বুঝিতে পারি না, সেগুলি বিদেশীর ভাষায় বিদেশীয় নামে কি করিয়া বুঝিব? পরে যখন সেগুলি ভাল করিয়া শিখিতে হয়, তখন আবার আমরা প্রথম হতে আরম্ভ করি, ও তাহাতে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হয়, তাহা বলিতে পারি না।

আমরা শুধু ভাষা শিথিতে যে কত সময় নষ্ট করি, তাহা মনে পড়িলে আমার শরীর শিহরিয়া উঠে। আমাদের সামান্য দ্রব্যগুলির জ্ঞান না হতেই আমরা ইংরেজী শিথিতে বাধ্য হই আর প্রায় সকল জিনিসই ঐ বিদেশীয় ভাষায় লেখা বইএ পড়িয়া শিথিয়া থাকি। আমার মতে ছয় সাত বৎসরের বালককে ইংরেজী শিথান অত্যন্ত মূঢ়তার কাজ। যে জিনিসটার জ্ঞান আমরা নিজের ভাষাদ্বারাও পাই নাই, সে জ্ঞান ইংরেজীদ্বারা কি করিয়া পাব? ইহাতে আমরা ভিন্ন কথা শিথি মাত্র, আসল জিনিসের সম্বন্ধে বেশী জানি না। আবার ইংরেজদের মন আলাদা, বুদ্ধি আলাদা, অতএব এক জিনিসই তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করে। যে জিনিসটা বাঙ্গালায় বুঝিতে এক ঘণ্টা লাগে, সে জিনিসটা ইংরেজীতে শিশুরা প্রথমে আদবে বুঝে কি না সন্দেহ; যদিও বা বুঝে, এক ঘণ্টার বদলে তাহাতে প্রায় চার ঘণ্টা লাগে। আমার বক্তব্য এই যে, প্রথমে বালকদের বাঙ্গালায় সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, পরে তাহারা একটু বড় হলে বার তের বৎসরের সময়ে তাহাদের ইংরেজী আরম্ভ করা উচিত। এইরূপ করিলে বালকেরা ইংরেজী ভাষা শীঘ্র ও কম কষ্টে শিথিবে; আর ষোল সতর বৎসরের সময় সেই এক কাজ হবে, অথচ আমার মতে উহা ভাল করিয়া ও অল্প আয়াসে হবে। এ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, বাঙ্গালা ভাষায় ভাল পুস্তক নাই, আর বাঙ্গালায় একেবারে ঠিক ঠিক সকল ভাব ব্যক্ত করা যায় না। সে আপত্তি বৃথা, কেননা অতি অল্প আয়াসে ভাল পাঠ্য পুস্তক রচনা করা যায়, আর আবশ্যক হলে ভাল বইয়ের অবশ্য সৃষ্টি হবে। ভাষার দোষ বল, উহার সম্বন্ধে একবার বলিয়াছি, উহা ভাষার দোষ নয়, আমাদেরই দোষ। যদি "শৃগাল মানে! শিয়াল, আর 'জেকল' মানেও শিয়াল শিথিতে হয়, অবশ্য তবে "জ্যাকল" মানেই শিয়াল শিথিলে অধিক উপকার হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ স্কুলের শিক্ষকেরা, ছাত্রেরা কিরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তাহাই ক্রমাগত মনে রাখিয়া শিক্ষকতা করেন। তাঁহারা শিখান্ বটে, কিন্তু যথার্থ শিক্ষা দেন না। ছাত্রদের কোন বিষয় যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হল কি না, সে বিষয় লইয়া বিশেষ কষ্ট স্বীকার করেন না। অবশ্য শিখানর বিষয়গুলিতে তাঁহাদের নিজেদের অতি উত্তম পরিষ্কার জ্ঞান আছে কি না, তাহা আমি জানি না; কিন্তু কিসে ছাত্রেরা কেবল পাঠ্য পুস্তকগুলি পরিপাটীরূপে আবৃত্তি করে ও পরীক্ষার সময়ে পরিপাটীরূপে উদ্গার করে, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয়। বালকদের বুদ্ধি বা যুক্তি-শক্তি শিক্ষিত ও মার্জ্জিত হল কি না, সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ সংবাদ রাখেন না। তাঁহারা স্মরণশক্তিরই আদর করিয়া থাকেন, এবং যে ছাত্রেরা অতি শীঘ্র পাঠ অভ্যাস করে ও সহজে পাঠ মনে রাখে, তাহা-দেরই বিশেষ উৎসাহ দেন। এই সহজে পাঠশিখা বালকদের সর্ব্বনাশের মূল। লোকে দেখে না যে, ইহাই তাহাদের কিছু না শিখিবার একটা প্রধান কারণ। তাহাদের চিক্কণ ও মসৃণ মস্তিকে দর্পণের ন্যায় সকল বিষয় পুনরায় প্রতিফলিয়া থাকে, কিন্তু উহাতে কিছুই বসে না, উহার ভিতর কিছুই প্রবেশে না। বালকেরা কথাগুলি ধরিয়া রাখে মাত্র, ভাবগুলি সকলই মাথা হতে প্রক্ষিপ্ত হয়; যাহারা তাহাদের কথা শুনে, তাহারা সে কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারে, কিন্তু বালকেরা নিজে তাহার কিছুই বুঝে না।

এই কারণেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ অধিকাংশ ছাত্রগুলির অল্প দিনের মধ্যে ভয়ানক দুর্দ্দশা ঘটে। যেই বিদ্যালয়ের পাঠ-চর্চ্চা শেষ হয়, অমনি তাহাদের মন থেকে সমস্ত বাহির হইয়া যায়। তাহারা মনে করে যে, যথেষ্ট বিদ্যা ও জ্ঞানলাভ হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহাদের যথার্থ জ্ঞান বা শিক্ষা হয় নাই, কেবল কতকগুলি কথা ও ঘটনা মাত্রের আবৃত্তি

হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাহাদের কোন দোষ নাই, শিক্ষা ব্যবস্থারই সম্পূর্ণ দোষ।

তৃতীয়তঃ আমাদের দেশে অধিকাংশ স্কুলে মনের কেবল এক বৃত্তির—স্মরণ-শক্তির শিক্ষা দেওয়া হয়। একে ত মনেরই সর্ব্বাঙ্গের চর্চ্চা হয় না, তাহাতে আবার প্রত্যেক মানুষের তিন প্রধান বিভাগ আছে—মন, হৃদয়, ও শরীর। কোন কর্ম্ম মনে ঠিক করিলে আমাদের হৃদয় সহায় না হলে আমরা তাহা সাধিতে পারি না, আবার মন ও হৃদয় সাপেক্ষ হলেও সবল শরীর না থাকিলে আমরা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। অতএব কেবল এক মনের শিক্ষা হলে আমাদের বাস্তব উপকার হয় না। সাহস, তেজ, সহ্যতা, প্রভৃতি মহা গুণগুলি আমরা বাল্যকালে না লভিলে কখনই লভিতে পারি না। বাঙ্গালীদের ঐ সকল গুণ অতি অল্প, সেই জন্য বাল্যকালে ঐ গুণগুলির ধারণা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। শরীর সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। সকলেই আমাদের শরীরের অবস্থা ও উহার প্রতি মহা অবহেলার বিষয় বিলক্ষণ জানেন।

কোন শিল্পকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হলে পূর্ব্বে যন্ত্রের আয়োজন করিতে হয়, আর যন্ত্রগুলির ব্যবহারে যথার্থ উপকার পাইব, এজন্য সেগুলিকে উত্তমরূপে কঠিন ও তীক্ষ্ণ করিয়া ব্যবহারের যোগ্য করা উচিত। আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়াদি আমাদের বিবেকশক্তির যন্ত্র-স্বরূপ, এজন্য চিন্তা করিতে হলে এইগুলির সঞ্চালন আবশ্যক; আর এই যন্ত্রগুলি হতে যথাসাধ্য কাজ পাইবার জন্য উহাদের আধার শরীরকে সর্ব্বদা সুস্থ ও সবল রাখা একান্ত বিধেয়। অতএব শরীর ও মনকে একেবারে স্বতন্ত্র বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত নয়; যাহার শরীর উত্তম ও বলিষ্ঠ, সেই উত্তম ও অব্যর্থরূপে মানসিক কর্ম্ম করিতে পারে।

স্কুল ছাড়িবার পর আমার মন নানা ভাবনায় আন্দোলিতে লাগিল।

ভাবিলাম, এইবার বোধ হয় আমার লেখাপড়ার জীবন শেষ হল, কারণ পিতা একজন গৃহস্থ লোক, তিনি এতদিন টাকা খরচ করিয়া আমায় লেখাপড়া শিখালেন, হয় ত আর তিনি আমার জন্য অর্থ-ব্যয় করিবেন না, এইবার আমাকে চাকরী করিতে হবে। আবার ভাবিলাম, না, আমি এই সবে বিদ্যাশিক্ষার স্বাদ পাইয়াছি, আমার লেখাপড়ায় বেশ মন লাগিয়াছে ও বেশ পরীক্ষার ফল হইয়াছে। আর যত ভাল শিক্ষিত হব, পরে তত ভাল কাজ পাব; পিতা আরও কয়েক বৎসর বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করিতে বিশেষ কুন্ঠিত হবেন না। নূতন বিদ্যালয়ে ইংরেজ অধ্যাপকদের নিকট পড়িব বলিয়া সময়ে সময়ে মনে বড় আহ্লাদ হল; আবার এতদিনকার স্কুল, স্কুলের সঙ্গী প্রভৃতি সব একেবারে ছাড়িলাম ভাবিয়া কথন কথন বড় দুঃখও হল। বাল্য খেলা, বাল্য আমোদ, বাল্য জীবনকে একেবারে বিদায় দিতে হবে বলিয়া বড়ই বিষাদ জন্মিল। আবার এতদিন একটী সামান্য স্কুলে পোড়ো বালক ছিলাম, কেহই আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিত না; এখন একজন বিদ্যালয়পাঠী যুবক হইয়া দাঁড়াইতে যাইতেছি, সকলেই আমাকে সম্ভ্রম করিয়া চলিবে, এই ভাবিয়া মনে অতিশয় হর্ষের উদয় হল।

পরীক্ষার পর ছুটীতে ঐরূপ নানাকারণে এককালে হর্ষিত ও বিষণ্ণ হলাম। পুস্তক পাঠে মনের ব্যাকুলতা উপশমিতে চেষ্টা পেলাম, নূতন নূতন ভাবের আলোচনায় হৃদয়কে স্থির করিলাম। ঐ সময়ে ইংরেজী ভাষাতে আমার অনেকটা ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল, পড়িবার জোরে সরল রচনা প্রায় সবই বুঝিতে পারিতাম আর শক্ত ভাষায় লেখা দুই চার খানা ইংরেজী বইয়েরও অধিকাংশ আমার হৃদয়ঙ্গম হত। ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও জীবনচরিত—এই কয়েকটী বিষয় পড়িতে আমি অত্যন্ত

ভাল বাসিতাম। বাল্যকাল হতেই বাস্তবিক ঘটনা, বাস্তবিক লোকজন; মানুষ ও দেশের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমার অতি উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, এখন ইংরেজীর অগাধ সাগরে সে লালসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিব ভাবিয়া যারপরনাই আহ্লাদ হল।

দুই চারখানা ইংরেজী বই পড়িতে পড়িতে স্বদেশ ও বিদেশ, দেশভক্তি ও দেশহিতৈষিতা, বীরতা ও সাহসিকতা প্রভৃতি নূতন বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। আজকালকার যুবকদের মত আমরা দেশের উপকার লইয়া পাগল হইয়া বেড়াতাম না; আর, বাস্তবিক, ঐ বয়সে দেশ ও বিদেশের যথার্থ মূল বিষয় কিছুই বুঝিতাম না, তথাপি বার বার ঐ সকল প্রসঙ্গের কথা পাঠে আমিও একজন দেশভক্ত, বীর, সাহসিক পুরুষ হতে অভিলাষ করিলাম। যৌবন কালে শরীর, মন ও হৃদয় সকলেরই জোয়ারের অবস্থা, তাহাতে আবার বীর, তেজস্বী, দেশভক্ত পুরুষদের চরিত পড়িয়া কাহার হৃদয় না উচ্ছ্বসিত হয়? কেই বা সেই নূতন উচ্ছ্বাস দমিয়া রাখিতে পারে?

ঐ সময়ে আমার অন্তরে আর এক নূতন ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর হল, সময়ে সময়ে আমি এক প্রকার নূতন চেতনার বশবর্ত্তী হতাম। সে যে কি, তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিতাম না, পড়িতে পড়িতে সহসা আমার মন জড়ভাব ধরিত, আমি এককালে হর্ষক্লেশ অনুভবিতাম। আবার ক্ষণকাল পরে সে বিচিত্রভাব বিলীন হইয়া যাইত। কিন্তু যত দিন চলিতে লাগিল, ততই যেন আমার হৃদয়ে অনেক বার সেই অপরূপ রসের সঞ্চার হত; থেকে থেকে হঠাৎ আমার মন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিত ও কি এক অব্যক্ত পদার্থের জন্য ঘুরিত। কাহাকেও এ সকল কথা বলিতাম না, মনে মনেই সব সহিতাম। আমার লজ্জাশীল স্বভাব আরো লাজুক হইয়া উঠিল। ইংরেজীতে দুই এক

খানি উপন্যাস পড়িতাম, তাহাতে যেখানে নায়ক নায়িকাদের প্রেমের বর্ণনা থাকিত, সেখানে আমার মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হত, আমি যেন সেই সকল প্রেমবাক্যগুলি প্রাণ ভরিয়া গ্রাসিতাম। ঐ সকল প্রণয়ালাপ পাঠে আমার মনে এক অদ্ভুত সমভাবের উদয় হত, আমার হৃদয় যেন উথলিয়া পড়িত। ক্রমে দেখিলাম যে, স্ত্রীলোকদের প্রতি আমার মনের ভাব অল্পে অল্পে বদলিয়া গেল, পূর্ব্বে তাঁহাদের কেবল মা বা ভগিনীর মত দেখিতাম, কিন্তু তখন যেন তাঁহাদের প্রতি আর এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হল; অথচ স্ত্রীলোকদের নিকট অধিক বিনম্র থাকিতাম, অপরিচিত মহিলার দৃষ্টিতে আমি একেবারে লজ্জায় কাতর হইয়া যেতাম, আমার বাক্‌বুদ্ধির রোধ উপস্থিত হত। পরে বুঝিলাম, আমাদের হুঁতোরাম প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তাহার নূতন রস—প্রেমের রস, তাহার নূতন বাঞ্ছা—কামিনীর হৃদয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভেল্কিখেলা।

আমি যাহার শঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। বর্দ্ধমানে বিশ্বম্ভর বাবু নামে পিতার একজন আলাপী লোক সেখানকার মহারাজার বাড়ীতে চাকরী করিতেন। তিনি আমাদের শীতের অবকাশের সময় কলিকাতায় আসিয়া পিতার সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজার বিষয় সম্পত্তির হিসাব রাখিবার জন্য আর একজন শিক্ষিত লোকের আবশ্যক হইয়াছিল। বিশ্বম্ভর বাবু আমার লেখা-পড়া'ও পরীক্ষার কথা শুনিয়া পিতার নিকট ঐ কাজের কথা তুলিলেন; আর তাঁহাকে বলিলেন যে, ঐ চাকরী আমার বেশ পোষাবে, কেননা, আমি অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলাম; ভবিষ্যতে অনেক ভাল হইতে পারে, আমি মন দিয়া কর্ম্ম করিলে ক্রমে ক্রমে মহারাজার দেওয়ানী পদ পর্য্যন্ত পাইতে পারি। মহারাজা বড় মহাশয়, মহোদয়, মহানুভব ব্যক্তি, তিনি তাঁহার নিযুক্ত লোকদের প্রতি অনেক যত্ন করেন ও বেশ বেতন দেন ইত্যাদি। বিশ্বম্ভর বাবুর বাক্য শ্রবণে পিতার মন টলিয়া গেল। তিনি স্থবির হইয়া আসিতেছিলেন, আমার সম্বন্ধে একটা স্থির নিষ্পত্তি করিয়া মনে পরিত্রাণ লাভে ইচ্ছুক ছিলেন, আর অমন চাকরী, অমন আশা ভরসা ছাড়িয়া দিলে আবার যে ঐরূপ উৎকৃষ্ট সুযোগ ঘটিবে, তাহার কোন প্রত্যাশা নাই। এই সকল কারণে তিনি নিশ্চয় করিলেন যে, আমি বর্দ্ধমানে বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ীতে থাকিয়া মহারাজার

প্রাসাদে ঐ হিসাব রাখার কর্ম্ম করিব। বিশ্বম্ভর মহাশয় শীঘ্রই সেখানে ফিরিয়া যাবেন, অতএব আমাকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হবে বলিয়া বাড়ীর লোকজনকে আমার বর্দ্ধমান যাত্রার সকল সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন।

ঐ সংবাদ শুনিয়া প্রথমে আমার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইল। এই অল্প বয়সে নিজের বাড়ী, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া যাওয়া; আধ অবস্থায় বিদ্যাশিক্ষা ত্যজিয়া পরের দাসত্ব করা; পরের বাড়ীতে পরের সঙ্গে থাকা; অপরিচিত লোকদের সঙ্গে মিশা; এমন তরুণ ও অনভিজ্ঞ বয়সে নিজেকে সংসারের আপদ ও প্রলোভনের মুখে ফেলা; দূরে সামান্য কেরাণীগিরির কঠোর জোয়াল ঘাড়ে করিয়া জীবনের নানাপ্রকার ভ্রান্তি, প্রমাদ, উদ্বিগ্নতা, ব্যাকুলতাকে আলিঙ্গন করা;— এই সকল চিন্তা আমার মনপটে আঁকিতে লাগিলাম। ভবিষ্যৎ জীবনের ঐরূপ বিষণ্ণ চিত্র আমার অন্তরে জাগরূক হইল। ভাবিলাম, কি কল্পিয়া-ছিলাম, আর কি সম্পূর্ণ ভিন্ন দশা উপস্থিত!

আবার ক্ষণকাল পরে বিষাদ গিয়া হর্ষ উপজিল। মনে করিলাম, বেশ ত, চিরযৌবন ছাত্রের অবস্থায় থাকার অপেক্ষা একটা যথার্থ গুরু-কর্ম্ম করা অনেক ভাল; কেবল বইপড়া ত আমাদের জীবনের প্রধান কাজ নয়; বহুদিন পিতার গলগ্রহ হইয়া থাকা বড় হেয় ও নিন্দনীয়; নূতন সংসারে পা দিব, কত নূতন জিনিস দেখিব, কত নূতন সঙ্গী হবে, কত নূতন প্রাজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা লভিব; আর নিজে চাকরী করিয়া স্বাবলম্বন শিখিব, ইহার অপেক্ষা অধিক আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? এতদিনের পর যথার্থ স্বতন্ত্রতা পাইব এই চিন্তায় মন নাচিয়া উঠিল। স্বাধীন ও নিজে নিজের প্রভু হইয়া সকলই করিতে পারিব, এইরূপ বিশ্বাসিলাম; আমার এত গুণ, এত বিদ্যা, এত জ্ঞান তবে কিসের

ভাবনা? একবার আরম্ভের প্রয়োজন মাত্র। একবার হাত পা ছড়াইয়া আকাশে উড়িলেই হয়, অমনি আমার আকাশকুসুম তুলিয়া নিজ মাথায় বসাইব।

মনে কত রকম মুগ্ধকরী কল্পনা আসিল। ভাবিলাম, সামান্ত কেরাণী থেকে ক্রমে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে আরো ভাল কাজ পাইব, সময়ে মহারাজার অধীনে সর্ব্বপ্রধান দেওয়ানী কর্ম্ম পর্য্যন্তও নিজায়ত্ত করিব। আর আমি আঠার বৎসরে পড়িয়াছি, আমার এখন উঠন্ত যৌবন; আমি বিশেষ সুন্দর পুরুষ না হলেও আমার শরীরের একটা সৌন্দর্য্য ও মনোহারিতা আছে। আমার বদন মধুর গম্ভীর, আমার শরীর সবলসুন্দর; আমাতে সতেজ ও সলজ্জ কান্তির বিকাশ, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নবযৌবনের প্রকাশ; আমার চালচলনে চমৎকারিতা, আমার ভাবভঙ্গীতে হৃদয়গ্রাহিতা—এ সকল যাহার আছে, তাহার কপালে কি না সম্ভবে? হয় ত একদিন মহারাজার যুবতী কন্যা আমার রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া আমার প্রেমে পড়িবে, হয় ত আমি তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া যুবতীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হব। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের উভয়ের ভালবাসা জন্মিবে, মহারাজাও বা দুজনকে বিবাহসূত্রে বাঁধিয়া দিবেন, আর আমি একদিন মহারাজার আসনে উপবেশন করিব। এইরূপ বহুবিধ আশা আমার যুবক হৃদয়ে জাজ্বল্যমানরূপে উজ্বলিতে থাকিল।

আমার যাবার বন্দোবস্ত সব ঠিক হলে, বাড়ীর সকলের নিকট বিদায় লইয়া বিশ্বম্ভর বাবু ও আমি একত্র বর্দ্ধমানে গেলাম। তিনি আমার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া নিজের বাড়ীতে আমার থাকিবার সমস্ত সংস্থান করিলেন, আর পর দিন মহারাজার নিকট আমার সম্বন্ধে সকল বিষয় জানাইয়া আমার চাকরীর ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। তিনি পরে আমাকে রাজার বাড়ীতে সঙ্গে লইয়া গিয়া, দুই চার জন

লোকের কাছে আমার আলাপ পরিচয় করাইয়া দিলেন ও আমাকে নূতন নিয়োগে দীক্ষিত করিলেন। আমিও সেই অবধি,আমার নূতন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলাম।

বিশ্বম্ভর বাবু অতি ভদ্রলোক, সাধু, সদালাপী, ও অমায়িক ছিলেন; তাঁহার অন্তরে কপটতা, হিংসা, দ্বেষাদি কোন প্রকার কুৎসিত প্রবৃত্তি স্থান পাইত না। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপ্রিয় ছিলেন; হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার অটল ভক্তি, ক্রিয়াকর্ম্মে বিশেষ অনুরাগ; আর ধার্ম্মিক হউন বা নাই হউন, তিনি ঠাকুর পূজা ও মালাজপে বিশেষ অনুরক্ত থাকিতেন। তিনি গোঁড়া হলেও আমার কোন ক্ষতি ছিল না। তিনি ধর্ম্ম লইয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেন ও নানা প্রকার ধর্ম্মের উপদেশ দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। তিনি আমার যথাসাধ্য যত্ন ও আদর করিতেন, আমার অত উপকার করিলেন, তবে একটা বিষয়—তাহা আবার মন্দ বিষয় নয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে—লইয়া তাঁহার উপর কেন অসন্তুষ্ট হব? না, আমি কৃতঘ্নতা কাহাকে বলে জানিতাম না, আর যে লোক আমার যত্ন ও আদর করিত, তাহার হৃদয়ে কোন প্রকার ক্ষোভ জন্মাতে বা কোন রকমে তাহাকে কষ্ট দিতে আমার কথনই মন সরিত না। এই সকল কারণেই বিশ্বম্ভর মহাশয় আমাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতেন, আমি সবই মান্য ও ভক্তি-ভরে শুনিতাম, তাঁহার সকল উপদেশে সায় দিয়া যেতাম। আমার ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকুক আর নাই থাকুক, ঐরূপ করাতে আমার বিশেষ মন্দাচরণ হত বলিয়া বুঝিতাম না। লোকের মনস্তুষ্টি করা সকল সময়ে দোষ নয়; বরং উহা, বিশেষ যুবা লোকদের মধ্যে, অনেক সময়ে ভাল গুণের চিহ্ন। কেহ আমাদের প্রতি ভদ্র আচরণ করিলে তাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ জন্মে; তাহার উপকার করিবার জন্য বা নিজের স্বার্থ সাধিবার

অভিপ্রায়ে আমরা তাহার মনস্তুষ্টি করি না। আর কিসের জন্যই বা বিশ্বম্ভর মহাশয় আমাকে উপদেশ দিতেন? কেবল আমার ভালর জন্য। তবে তাঁহার কথায় সায় দেওয়াতে আমার কোন অপরাধ হয় নাই।

আমিও অধার্ম্মিক ছিলাম না। আমার বয়সে ও আমার অবস্থায় যেরূপ ধর্ম্মভাব হবার কথা, সেইরূপই আমার অন্তরে ছিল। ভদ্র ও হিন্দু পরিবারে আমার জন্ম, উপযুক্ত শিক্ষাও পাইয়াছিলাম; মাতা বিলক্ষণ ধর্ম্মভীরু, পিতা ধর্ম্মভীরু না হলেও ধর্ম্মকর্ম্মে আসক্ত ছিলেন; আর বাড়ীতে রোজ ঠাকুরসেবা হত, সরস্বতী, কালীর পূজাও হইয়া থাকিত; চারদিকে ঐ সকল ধর্ম্মভাব দেখিয়াও কিরূপে আমার মনে অধর্ম্মভাব হবে?

বাস্তবিক আমার ঐ বয়সে যেরূপ ধর্ম্মভাব হওয়া উচিত, তাহাই আমার ছিল। উহা অপেক্ষা বরং অধিক ছিল বলিলে যথার্থ কথা কহা হয়, কারণ এস্থলে কেনই বা আমার মনোগত ভাব লুকাইয়া রাখিব? আমি যাহা দেখিতাম, যাহা শুনিতাম, তাহাতেই শ্রদ্ধা করিতাম না, আমার চিন্তিবার একটা ক্ষমতা ছিল। আর আমার শৈশব কাল কখনই সাধারণ লোকের শৈশব কালের ন্যায় ছিল না; অতি বাল্যকাল অবধিই আমি বয়স্থ মানুষের মত বোধ ও চিন্তা করিতাম। আমি দিন দিন বাড়িতাম বলিয়াই সাধারণ শিশুদলের মধ্যে গণনিত হইয়াছিলাম, কিন্তু জন্মিয়াই সে শ্রেণীর বহির্ভূত ছিলাম। নিজেকে নিজেই একটী অপূর্ব্ব অত্যদ্ভুত লোকভাবে বর্ণিতেছি, সেজন্য অনেকে হাসিবেন। বেশ; কিন্তু যখন তাঁহাদের হাসি শেষ হবে, আশা করি, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার অকালপক্কতাকে একবার মনে স্থান দিবেন, আর এমন একটী শিশুকে দেখাবেন যে, যে পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময় রামায়ণ মহাভারত পাঠে আসক্ত ও শোকহর্ষের অনুভবে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়। হাঁ, তখন আমার মিথ্যা অভিমান বুঝিব, তখন আমার

ভ্রম স্বীকার করিব। শিশুকাল হতে বরাবরই আমার নিজে চিন্তা করিবার শক্তি ছিল। দুই তিন বৎসর জড়ভরতের মত ছিলাম বটে, কিন্তু আমার চিন্তাশক্তি রহিত হয় নাই, স্থগিত ছিল মাত্র; আবার যখন ঐ শক্তিকে ফিরিয়া পেলাম, তখন উহা অতিশয় প্রখর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি নিজে সকল বিষয়ের ভালমন্দ বিচার করিতাম। আর একটা কথা,—আমার বোধ হয়, যে ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে আমাদের জন্ম হয়, বাল্যকালে ও বয়স্থ অবস্থায় রীতিমত সেই ধর্ম্মানুসারে চলিলেই আমাদের মনে ধর্ম্মভাব থাকে, ইহাই লোকের বিশ্বাস, কিন্তু আমার মতে সেরূপ সংস্কার ভ্রমাত্মক। কারণ ধর্ম্মানুসরণ ও ধর্ম্মভাব কথনই এক বস্তু নয়।

আমি যে অত কথা লিখিলাম, তাহার মর্ম্ম হতেছে এই যে, অতি বাল্যকালেই পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মে আমার সমস্ত বিশ্বাস লোপ পাইয়াছিল। জ্ঞান হইয়া অবধিই শিলা, পুতুল, প্রতিমাদির প্রতি আমি ভয়ঙ্কর বিদ্বেষী ছিলাম; আর ঠাকুরপূজা, মালাজপ বা কোনপ্রকার বাহ্য আড়ম্বর দেখিলেই আমি জ্বলিয়া উঠিতাম। আমি কোন বিশেষ ধর্ম্ম ব্যবস্থায় আসক্ত ছিলাম না, কিন্তু আমার অন্তরে বিলক্ষণ ধর্ম্মভাব ছিল। আমি কোন কালে কোন বিশেষ ধর্ম্ম ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী থাকি নাই; ও সম্বন্ধে কখন মনে বাদানুবাদও করি নাই; কি যে মানিব বা কি যে না মানিব, তাহা লইয়া মনে কখন অশান্তি আনি নাই। কিন্তু আবার বলিতেছি যে, সাধারণের মতে আমি ধার্ম্মিক না হলেও আমি কখন অধর্ম্মের পথবর্ত্তী থাকি নাই ও কাহাকেও অধর্ম্মাচারী হতে উপদেশ দিই নাই। আমার মনে যখন যে ধর্ম্মভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা অবিকল এই পুস্তকে লিখিলাম। আমার ধর্ম্মসম্বন্ধে এখন সমস্তই প্রকাশিয়া বলিয়াছি; আর ও বিষয়ে কোন কথার উত্থাপন করিব না।

বিশ্বম্ভর মহাশয় আমাকে কলিকাতার লোকদের ধর্ম্মে অভক্তি, মন্দাচার, নাস্তিকতা সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেন ও হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত নানা উপদেশ দিতেন, আমি সে সব অম্লানবদনে শুনিতাম, তাহার কোন প্রত্যুত্তর করিতাম না। বিশ্বম্ভর বাবু ভাবিতেন যে, আমি তাঁহার সকল কথা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহারই মতে চলিব, আমিও তাঁহার এ ভুল বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাকে কোন কষ্ট দিতাম না। এইরূপে আমরা বেশ মিত্রভাবে এক সঙ্গে থাকিতাম। বিশ্বম্ভর বাবু অতি সুশিক্ষিত, আর সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। তিনি দেখিলেন যে, সংস্কৃতে আমার কিছুই ব্যুৎপত্তি হয় নাই, অতএব আমাকে ভাল করিয়া সংস্কৃত শিখাবেন, স্থির করিলেন। আমি রোজ সকাল বেলা তাঁহার নিকট গিয়া সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও কালিদাসের শকুন্তলা পড়িতে আরম্ভিলাম। সংস্কৃতের উপর আমার বড় বিদ্বেষ ছিল, স্কুলে যাহা পড়িয়াছিলাম, তাহা এক রকম মুখস্থ করিয়া সারিয়াছিলাম, আর উহার ব্যাকরণ পাঠে আমার রক্ত জল হইয়া যাইত। তবুও বিশ্বম্ভর বাবুর পড়াবার গুণে ও উৎসাহে আমার ঐ সময়ে অল্প অল্প সংস্কৃত শিখিতে ইচ্ছা গেল; আমি মনোযোগ দিয়া তাঁহার পাঠ শুনিতাম।

মাস খানেক ঐরূপে কাটিয়া গেল। ওদিকে আমি নিয়মমত রাজার বাড়ী গিয়া আমার চাকরী করিতাম। সকল দিকেই বেশ চলিতে ছিল। অল্প দিনের মধ্যে কাজ শিখিয়া লইলাম ও যেরূপ শীঘ্র বড় বড় হিসাব চুকাইয়া ফেলিতাম তাহা দেখিয়া সকলের তাক্ লাগিয়া গেল। সকলেরই বিশ্বাস হল যে, আমি কয়েক মাসের মধ্যেই একটা বড় কর্ম্ম পাব ও ভবিষ্যতে আমার অনেক ভাল হবে। আমার সমকর্ম্মী আর দুজন ছিল, তাহারাও আমার মত জমীদারীর হিসাবপত্র ঠিক দিত। তাহাদের এক জনের নাম জম্বুদাস, আর একজনের নাম বলরাম।

জম্বুদাস নামেও যেমন, কাজেও সেই রকম ছিল। সে বড় আস্তে আস্তে কাজ করিত আর অনেকটা হাবা গোবার মত ছিল; কিন্তু লোকটা বড় ধীর, বিশ্বাসী ও সচ্চরিত্র, আর সে যাহাই করিত, তাহাতে সমস্ত মনপ্রাণ দিত। বলরাম, জম্বুদাসের মত পাড়াগাঁর লোক হলেও বড় ধূর্ত্ত, চালাক ও চট্‌পটে ছিল। তাহার জ্ঞানবিদ্যায় বিশেষ অধিকার না থাকিলেও, তাহাকে আমার অপেক্ষা অনেক চতুর বলিয়া বোধ হত। তাহার মন অনেকটা আমার মত উড়া উড়া ছিল, সে কল্পনা দেবীর একটা বিশেষ আশ্রিত লোক, তাহার অন্তরে নানারকম খেয়াল চাপিত। আমার সঙ্গে তাহার এই বিষয়ে মিল হত বলিয়া, আর বোধ হয় আমি অত্যন্ত লাজুক ও সে অত্যন্ত মুখর, এই কারণেও বা তাহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিল; জম্বুদাসকে আমরা এক পাশে ফেলিয়া রাখিতাম।

আমি যথাসাধ্য মন দিয়া কাজ করিতাম, পিতামাতাকে আমার সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ দিলাম, বিশ্বম্ভর বাবু পিতাকে আমার অনেক সুখ্যাতি করিয়া এক পত্র লিখিলেন। তাঁহারা আমার প্রতি মহা সন্তুষ্ট হলেন ও ভাবিলেন যে, এত দিনের পর তাঁহাদের হুঁতোরাম একটা মানুষ হতে চলিল। আমিও বেশ প্রফুল্ল মনে রহিলাম, আর এইবার সত্য সত্যই বা আমার আকাশকুসুম ফুটিতে প্রস্তুত, এইরূপ চিন্তিলাম। কিন্তু সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়। দুই মাস পরে আমি ক্লান্ত হইয়া আসিলাম, আমার কাজের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ জন্মিল। রোজ সেই এক রকম কাজ, রোজ সেই দুচোক, চারচোক, খাস্ জমী, খাস মহল করিতে করিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল। আর আমার স্বভাবই ঐরূপ, আমি কখন গাধার খাটুনী বা ক্রমাগত দাসত্ব সহিতে পারিতাম না। আমার মন তখন উড়িতেছিল। আমি অসংসাহসের কর্ম্ম সম্পাদিয়া ভাগ্যলক্ষ্মীকে নিজায়ত্ত করিব ভাবিয়াছিলাম; বহুবিধ অলৌকিক, অসামান্য, অশ্রুত-

পূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপের কল্পনায় আমার মাথা পরিপূর্ণ ছিল; নায়িকার প্রেম অনুসন্ধানে বিব্রত, রাজকন্যার হৃদয়লাভে অধীর হইয়াছিলাম। কিন্তু এ কি এক সামান্য হিসাব রাখার কাজে জীবন খোয়াতে বসিয়াছি; অসংসাহসিক কর্ম্মের মধ্যে কেবল এক কলম চালানই দেখিতেছি; কোথায় বা রাজকন্যা, আর কোথায় বা নায়িকার প্রেম; কেবল সেই জম্বুদাস ও বলরামের সঙ্গে বাড়ীর দরজার কাছে এক অন্ধকার ঘরে মাথা বকিয়া সকের প্রাণকে একেবারে মাটী করিয়া ফেলিতেছি—এইরূপ নানাপ্রকার বিষণ্ণ চিন্তায় আমার মন অতিশয় অধীর ও আকুল হইয়া উঠিল। ইংরেজী বই আমার ভালবাসার জিনিস ছিল, তাহা বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়ীতে আদবেই নাই; সেজন্য কোন বই পড়িয়া নিজের মনকে সুস্থির করিতে পারিতাম না। আর রোজ সেই এক লোক, এক স্থান, এক জিনিস দেখিয়া আমি পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেলাম।

ঐ সময়ে আমার সম্বন্ধে এক বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা লিখিতেছি। পূর্ব্বলিখিত কারণে আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছিল, কোন রকমে উহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতাম না। এক পুস্তক পাঠে আমি ভুলিয়া থাকিতাম, কিন্তু এখন সে উপায়েরও অভাব, কি করিব কিছুরই ঠিকানা রহিল না। এক দিন রাজবাড়ী থেকে কাজ শেষ করিয়া একলা বাড়ী আসিতেছি, দেখি না এক পাশের ঘরে মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ বই পড়িতে আমার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল, আমি কোনমতে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না; আর কোন লোকজন নাই দেখিয়া আমি গোপনে সেই বইখানা লইয়া বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম ও লুকিয়া লুকিয়া পড়িতে থাকিলাম।

পরদিন রাজার বাড়ীতে খোঁজ পড়িল। এতদিন কোন জিনিস

হারায় নাই, এখন আমি আসিবার পর বইখানা চুরি গিয়াছে, অতএব সকলেরই আমার উপর সন্দেহ জন্মিল। পরদিন আমি যথারীতি কাজ করিতেছি, রাজার দেওয়ান গোপনে বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়ী লোক পাঠালেন। সমস্ত বাড়ী অন্বেষণের পর, আমি যে কুলুঙ্গির ভিতর বইখানা রাখিয়াছিলাম, সেইখানে মেকলের ইতিহাস পাইয়া লোকটা তাহা দেওয়ানের কাছে উপস্থিত করিল। দেওয়ান মহাশয় আমাদের কাজের ঘরে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, আমি কোথা থেকে ঐ বই পাইয়াছিলাম। আমি দেখিয়াই একেবারে হতজ্ঞান, মুখ দিয়া কথা বেরুল না। মুখচোক লজ্জা ও ভয়ে বিবর্ণ। অবশেষে অতি কষ্টে বলিয়া উঠিলাম—জম্বুদাস আমাকে ঐ বইখানা দিয়াছিল।—দেওয়ান মহাশয় ঐ প্রশ্ন জম্বুদাসকে জিজ্ঞাসিলেন। জম্বুদাস অবাক্, থতমত খাইয়া গেল; আমার দিকে এক কটাক্ষপাত করিল, সে কটাক্ষে দানবদেরও মন টলিত, কিন্তু আমার নিষ্ঠুর হৃদয়ে কোন আঘাত লাগিল না। সে অতি ভয়ে আস্তে আস্তে কিন্তু দৃঢ়ভাবে ঐ অপবাদ অস্বীকার করিল। কিন্তু আমার তখন কি মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছিল, অতি জঘন্য নির্লজ্জভাবে আবার সেই অপবাদ করিলাম ও তাহার মুখের সামনে জোরে বলিলাম যে, সেই আমাকে বইখানা দিয়াছিল। আমার এইরূপ পৈশাচিক ধৃষ্টতা হবে ইহা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। দেওয়ান মহাশয় আমার জোরাল, অটল উত্তর শুনিয়া, ও সম্বন্ধে গূঢ়তত্ত্বের অবধারণ না করিয়া, জম্বুদাসকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন। সেই দিনেই জম্বুদাসের রাজার বাড়ীতে চাকরী শেষ হল।

বেচারীর যে তার পর কি ঘটিল, তাহা আমি জানি না; বোধ হয় ঐ কলঙ্কের পর শীঘ্র তাহার কোন কর্ম্ম যুটে নাই। ব্যাপারটা অতি সামান্য ছিল বটে, কিন্তু ঐ অপবাদে তাহার সমস্ত জীবনে মহা কলঙ্ক

রহিয়া গেল। আমার পক্ষে উহা কি ভয়ঙ্কর পাপ হল! আমার চুরি করিবার কোন মানস ছিল না, বইখানা পড়া হলেই আবার ফিরিয়া রাখিতাম, তবুও না বলিয়া লওয়াতে চুরি করা হইয়াছিল। শুধু চুরি নয়, মিথ্যা কথা, মিথ্যা অপবাদ ও একজন লোকের সর্ব্বনাশ—এ সকল অপরাধের আমি অপরাধী। আমরা নিজে দোষ করিলেই সচ্চরিত্রতার মূল্য বুঝিতে পারি; আমরা যদি সর্ব্বদা বিবেকীর ন্যায় কাজ করি, তাহা হলে আমাদের সচ্চরিত্রতার আবশ্যক হয় না। কিন্তু প্রথমে সহজে যাহা দমিতে পারি, এমন প্রবৃত্তির দ্বারা আমরা অবাধে আকৃষ্ট হইয়া থাকি; যৎসামান্য প্রলোভনের বশবর্ত্তী হই, আর সেগুলিকে বিপদশূন্য বলিয়া প্রথমে তুচ্ছ বোধ করি। এইরূপ অজ্ঞানে আমরা সঙ্কটময় অবস্থাতে আসিয়া পড়ি; আমরা প্রথমে সহজেই যে দশাকে অনায়াসে নিবারিতে পারিতাম, পরে বীরযোগ্য প্রয়াস দ্বারাও তাহা হতে নিজেদের মুক্ত করিতে সক্ষম হই না। ক্রমে ভীষণ গুহায় গড়াইয়া যাই ও অবশেষে পরমেশ্বরকে বলি,—আমাকে কেন এত দুর্ব্বল করিয়াছ?—কিন্তু তিনি যেন আমাদের অন্তরাত্মাকে বলিতে থাকেন,—তোমাকে গুহা হতে উঠিবার সময় অতি দুর্ব্বল করিয়াছি সত্য, কারণ গুহার মধ্যে যাহাতে না পড়, তাহার জন্য তোমাকে প্রথমে যথেষ্ট সবল করিয়াছিলাম।

আমি একখানা সামান্য পুস্তকের জন্য কি বিষম পাপ করিলাম। আমার এত জ্ঞান, এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, এত নীতিশিক্ষা, এত ধর্ম্মভাব, সবই এক অতি তুচ্ছ সামান্য পদার্থের জন্য হারালাম। আমার চরিত্রে কি অসামঞ্জস্য! আমি কি তখনও শৈশব অবস্থায় ছিলাম? অত বয়সের বৃদ্ধিতে কি উপকার হল? কেনই বা ঐ দুরপণেয় পাপ করিলাম? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। কখন

কথন যেন আমার মন বলে যে, বাল্যকাল অবধি ভগ্নাশা ও ভগ্নোৎসাহ যাহার জীবনের প্রধান পুষ্টি, তাহার ঐ তরুণ বয়সে কি না সম্ভবে ?

ঐ নিষ্ঠুর কর্ম্মের স্মরণে আমি চিরকাল অবিরত কষ্ট পাই, এই প্রৌঢ় অবস্থায়ও আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি, জম্বুদাস আমাকে অতি মৃদুস্বরে বলিতেছে—হুঁতোরাম! তোমাকে আমি সাধু বলিয়া জানিতাম, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিলে; কিন্তু আমি তোমার ঐরূপ কথন করিব না।—শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় আমি ঐ বিষয় লইয়া অধিক মনবেদনা পাই না বটে, কিন্তু আমার ঝড়ময় জীবনে ঐ স্মৃতি আমার সমস্ত শান্তিকে হরিয়া লয়। ইহার দ্বারা আমি বেশ বুঝিতেছি যে, লোকের ভাল অবস্থায় অনুতাপ নিদ্রিত থাকে, কিন্তু মন্দ অবস্থায় উহা জাগিয়া তীব্রভাব ধরে। এ পর্য্যন্ত আমি কাহাকেও এ পাপের কথা বলিয়া আমার হৃদয়ের বোঝা নামাই নাই, এ বোঝা চিরকাল একভাবে আমার অন্তরাত্মাকে পিষিতেছে। আমার বৃত্তান্ত লিখিবার একটী প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, এই গুরুভার নিক্ষেপিয়া আমার হৃদয়ের লঘুতা সম্পাদন করি।

কিন্তু আবার বলি যে, আমি স্বভাবতঃ কূটবুদ্ধি নই, আর যে সময়ে আমার সমকর্ম্মীর উপর দোষারোপ করি সে ক্ষণেও আমি তাহার মন্দ সাধিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। আমি লজ্জায় একেবারে অজ্ঞান, বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলাম, জম্বুদাসকে সুমুখে দেখিয়া হঠাৎ নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাহাকে দোষী করিলাম। আমি শাস্তিকে ভয় করি নাই, লজ্জাই আমার বিষম ভয়ের কারণ ছিল। মৃত্যু অপেক্ষা, পাপ অপেক্ষা, সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষা আমি লজ্জাকে বেশী ভয় করি। আবার ঐ পাপাচরণ অপেক্ষা, এক জনের সর্ব্বনাশ করিলাম, ইহাতে আমি অধিক মর্ম্মবেদনা সহিতেছি। ভাই জম্বু! যদি তুমি এখনও এ পৃথিবীতে থাক, বা এখনও তোমার আত্মা ত্রিজগতে যদি কোথাও বর্ত্তমান থাকে, তাহা

হলে আমার দোষ ক্ষমা করিবে। যদি এ সংসারে আমার পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে, তাহা হলে আমার চল্লিশ বৎসরের জীবনে যে যন্ত্রণা ভুগিয়াছি, তাহাতে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।—যাক্, ও সম্বন্ধে এখন সমস্তই প্রাণ খুলিয়া বলিলাম।

ঐ আচরণের পর আমি আরও বিষণ্ণ হলাম, রাজবাড়ীর কর্ম্মে আমার আরো অধিক বিরক্তি জন্মিল। বলরামেরও সে কর্ম্মে আসক্তি ছিল না; সেও, আমার মত, লোকের বশ্যতায় জীবন কাটান অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয় ভাবিত। আমাদের উপরে রাজার যে লোক ছিল, সে আমাদের সঙ্গে বড় ভাল ব্যবহার করিত না ও হিসাবে অতি সামান্য ভুল হলে আমাদের অতি কটু কথা বলিত। অতএব এ সম্বন্ধে বলরাম ও আমার একপ্রকার বেশ সমভাব ছিল। আমি একদিন বলরামকে নির্জ্জনে সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম, সেও তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গে ঐ বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য প্রকাশিল। আমরা দুজনে কিরূপে আমাদের উদ্ধার সাধিব, তাহা পরামর্শিতে লাগিলাম, রাজবাড়ীর কাজ শীঘ্র ছাড়িব, ইহাতে দুজনেই স্থিরনিশ্চয় হলাম। অবশেষে আমরা অনেক দিন ভাবিয়া এক মন্ত্রণা নির্দ্ধারিলাম।

বলরাম বড় আমোদে ছিল, নানারকম ক্রীড়া কৌতুক শিখিয়াছিল ও অবকাশ সময়ে সেই সব লইয়া ব্যস্ত থাকিত। উহার মধ্যে ভেল্কি-খেলায় তাহার অধিক পটুতা ও অনুরাগ দেখিতাম। তাহারও মন, আমার মত অসংসাহসিক কর্ম্মের অন্বেষণে ঘুরিত; সেও দেশ দেখিতে ভালবাসিত, আমিও ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়িয়া ভ্রমণকাতর হইয়াছিলাম। সে বর্দ্ধমানের আশ্‌পাশ্‌ চারদিক্‌কার দেশ বেশ জানিত, আমিও অনেক বই পড়িয়া এক রকম জ্ঞানী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। বলরাম আমাকে প্রস্তাবিল যে, আমরা দুজনেই রাজবাড়ীর কর্ম্ম ছাড়িয়া বর্দ্ধমান থেকে

একদিন গোপনে অন্তর্হিত হব, কাহাকেও কোন কথা বলিব না; আর রাস্তায়, ঘাটে, গ্রামে, নগরে ভেল্কি খেলিয়া জীবিকা আহরিব। বলরাম অতিশয় চতুর, সেই সব করিবে, আমি তাহার সহায় স্বরূপ থাকিব। আমার তখন মনে কি হুচুক চাপিল, আমি বলরামের প্রস্তাবে সম্মত হলাম। ভাবিলাম, ভেল্কি খেলার মত টাকা উপার্জ্জিবার আর ভাল উপায় কি আছে? প্রতি গ্রামে চাষা ও অন্য লোকদের জমাইয়া—মামীর মার খেল্, মামীর মার খেল্, লাগ্ লাগ্ লাগ্—বলিয়া গোলা লুফিতে থাকিব আর সকলেই আমাদের দুচার পয়সা দিবে। এইরূপে বেশ রোজগার করিয়া আমরা যেথায় ইচ্ছা থাকিব, যেথায় ইচ্ছা যাব; কোন ভাবনা নাই, কোন চিন্তা নাই, আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হব। আর এ রকমে আমরা সমস্ত বাঙ্গালা, কাশী, লাহোর, সমস্ত পৃথিবী দেখিয়া বেড়াব। অতএব এই মতলবে আমাদের যাত্রার সব ঠিক করিলাম।

দুই চার দিন পরে আমরা একদিন সন্ধ্যার সময় কাহাকেও বিন্দুমাত্র না বলিয়া বর্দ্ধমানের বাহিরে চলিয়া গেলাম। বিশ্বম্ভর বাবু, রাজবাড়ী, চাকরী, আশাভরসা, দেওয়ানি, রাজকন্যা রাজাসন সব এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনা কষ্টে বিদায় দিয়া বলরাম আর হুঁতোরাম দুজনে দুই ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া ঐ মহা উদ্যমের ব্যাপার সাধনের উপলক্ষে প্রস্থান করিলাম। আমাদের সঙ্গে আর বেশী কিছুই ছিল না; বেতনের অধিক ভাগ পিতাকে পাঠিয়া দিতাম, যাহা কিছু বাকি ছিল সেই অল্প টাকা আমার বগ্‌লিতে, আমার হৃদয়ে হর্ষ, আর মনে নানা প্রকার অপরূপ কল্পনা ও ভ্রমণ সুখের আশা।

লোকে ভাবিবে আমার মনে সহসা কি এক বিপ্লব ঘটিল যে নিশ্চিত পরিহরিয়া আমি অনিশ্চিতের আশায় ধাবিলাম, রাজার বাড়ীতে গুরু কর্ম্ম ত্যজিয়া ভেল্কির জীবনে প্রবৃত্ত হলাম, গদীর বিছানা ছাড়িয়া মাঠে

মাঠে শুইয়া বেড়াতে লাগিলাম। আরো আমাকে তিরস্কার করিবে যে, এ সকলই আমার নিজের কীর্ত্তি। কিন্তু ঐরূপ ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়। আমি জীবনে এই প্রথম দু মাসের বেশী কারারুদ্ধ হইয়াছিলাম ও সম্পূর্ণ বশ্যতার জ্বালায় জ্বলিতেছিলাম। পালানর পর আবার স্বাধীনতা পেলাম এই সুখকর ভাবে আমার মন পুরিয়া রহিল। স্বতন্ত্রতা কি মিষ্ট জিনিস! রাজা থেকে চাষা পর্য্যন্ত সকলেই স্বতন্ত্রতার মর্ম্ম বুঝে, সকলেই স্বাধীন হইয়া চলিতে চায়। এত দিনের দাসত্বের পর আমার নিজের ও নিজের কাজ কর্ম্মের উপর সম্পূর্ণ প্রভূত্ব হল; সুমুখে রাস্তা, খোলা মাঠ, যেথা ইচ্ছা অবাধে বিচরিব; আর আমার অমন ধীশক্তি, অমন গুণ, আর ওস্তাদ বলরাম আমার সঙ্গী তবে কিছুতেই বিফল হব না। সময়ের কোন অনটন নাই; আর বগলিতে যে কুড়িটী টাকা ছিল তাহা আমার পক্ষে অক্ষয় ভাণ্ডার বলিয়া মনে করিলাম। এই আমার প্রথম ধনসম্পাত্তি; আমার যথেচ্ছা ব্যয় করিব, কাহাকেও ইহার হিসাব দিতে হবে না। হতাশা বা রোদন দূরে থাকুক নিজের মন্দর বদলে ভালয় প্রবৃত্ত হলাম, এক কাজ ছাড়িয়া অপর কাজ অবলম্বিলাম মাত্র। কথনই নিজের প্রতি আমার ঐ সময়ের মত বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মে নাই। ভাবিলাম এই বার ভাগ্য আমার পার তলায়, আর উহার জন্য কাহারও নিকট বাধিত থাকিব না।

নগর হতে বেরিয়াই আমরা মাঠে মাঠে ঘুরিতে লাগিলাম। চাষারা চাষ দিতেছে, গরুগুলা চরিতেছে; ছেলেরা খেলিতেছে, এই সকল দেখিতে একেবারে মত্ত থাকিলাম। কয়েক দিন ভেল্কি খেলা সব ভুলিয়া গিয়া স্বতন্ত্রতা সুখে ও ঔৎসুক্য পরিতৃপ্তির আনন্দে মনপ্রাণে ব্যাপৃত রহিলাম। ক্রমে আমাদের বগলি হাল্‌কি হইয়া আসিল, আমরা কসিয়া চলিতে লাগিলাম। কিন্তু খাওয়াদাওয়াতে আমাদের কোন কষ্ট বোধ

হয় নাই। আমি এ জীবনে চাষাদের সরল সামান্য খাদ্য অপেক্ষা কোন আহারকে কথনই ভাল বলিয়া জানি না। টাট্‌কা দুদ্, দই, গাছপাড়া ফলমূল অপেক্ষা কি খাদ্য বেশী তৃপ্তিকর? আর যথন খোলা বাতাসে, খোলা মাঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তীক্ষ্ণ ক্ষুধা আমাদের জঠরে জ্বলিতে থাকে, তথন সুধু সিদ্ধ আলু আর মোটা চালের ভাত কি মিষ্ট! বাস্তবিক ঐ সময়ে তিন চার পয়সার যে খাদ্য খেতাম, পরে তিন চার টাকার আহারেও সে সুখের অনুমাত্র বোধ করি নাই।

আমাদের টাকা কিছু ফুরিয়া আসিলে আমাদের চেতনার উদয় হল। সকল সরঞ্জাম বাহির করিয়া আমাদের বাঞ্ছিত কর্ম্ম আরম্ভিলাম। চাষা, চাষী, ছেলে, মেয়ে, গরু, ছাগল পর্য্যন্তও আমাদের চারদিকে ঘেরিয়া ভেল্কি খেলার ধূম দেখিতে লাগিল। আহা! তাদের সরল মুথ, অকপট হৃদয়, আন্তরিক আনন্দ আমার মনে চিরকাল জাগরুক রহিয়াছে। তাহারা কেমন তুচ্ছ জিনিসে খুসী হয়, কেমন সামান্য পদার্থে সন্তুষ্ট হয়, আর তাদের গালভরা হাসি এ জীবনে কথনই ভুলিব না। কিন্তু আমাদের আসল কাজ বেশী এগুতে ছিল না। সকলেই আমাদের ভেল্কি খেলায় মহা আনন্দিত, কিন্তু টাকা পয়সার থবর নাই। আর তাহারা আমাদের আব্‌ভাব্ দেথিয়া, আমরা কেবল তাদের আমোদের জন্যই খেলিতেছি ঠিক করিল, ও বরং আমরা তাহাদের দুচার পয়সা দিই, তাহাই কথন কথন আশা করিল। বাস্তবিক গরীব বেচারিদের দেথিয়া আমার মনে বড় দয়া হত, ছোট ছোট কপ্‌নিপরা ছেলেরা যথন আমাদের পিছনে পিছনে ঘুরিত, আমি, নিজের বগ্‌লি থেকে তাদের দুচার পয়সা না দিয়া থাকিতে পারিতাম না।

ক্রমে আমাদের অক্ষয় ভাণ্ডারের হ্রাস হতে লাগিল। আমরা এক দিন একটী ছোট গ্রামের ভিতর গিয়া মহা ভেল্কি খেলা লাগিয়া দিয়াছি,

ভয়ানক ভিড়, আর দুই একটা পয়সাও পড়িতে লাগিল; এমন সময়ে হঠাৎ দেখি না আমার খুড়া মহাশয় ভিড় ঠেলিয়া মহা ব্যস্তে আমাদের দিকে আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি যে কি লজ্জা পেলাম তাহা বর্ণিতে পারি না। পুকুরে ঝাঁপ দিতে কিম্বা মাটীর ভিতর মুখ পুতিয়া রাখিতে ইচ্ছা হল। বলরামের চালে বেশী পরিবর্ত্তন দেখিলাম না, কিন্তু আমি লজ্জায় বিহ্বল হইয়া গেলাম। খুড়া অধিক কিছু না বলিয়া অতি ভদ্রভাবে তাঁহার সঙ্গে আমাদের যেতে বলিলেন; আমি নীরবে তাঁহার পাশে পাশে চলিলাম, মুখে একটীও কথা নাই। আমরা আবার বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলাম। বলরামকে তাহার বাড়ীতে রাখিয়া আমরা একেবারে কলিকাতার অভিমুখে রওনা হলাম।

আসিতে আসিতে খুড়ার মুখে শুনিলাম যে আমাদের বাড়ীতে আমার সমস্ত সংবাদ গিয়াছে, বিশ্বম্ভর বাবু মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছেন, আর পিতা-মাতা সকলে আমার জন্য যার পর নাই কাতর হইয়াছেন। পিতা খুড়াকে আমার অন্বেষণে পাঠাইয়াছেন, আর তিনি অনেক স্থান ভ্রমণের ও অনেক লোককে জিজ্ঞাসার পর অবশেষে ঐ স্থানে আমাদের পাইলেন। তিনি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসিলেন না, অতি নম্রভাবে ও মিষ্ট কথায় আমাকে অনেকগুলি উপদেশ দিলেন। খুড়ার প্রতি আমার আন্তরিক ভালবাসা ছিল, জন্মাবধি তাঁহাকে যথেষ্ট সম্ভ্রম করিয়া আসিতাম, আর তাঁহার কথা চিরকাল শিরোধার্য্য করিতাম। তিনি যাহা বলিলেন, আমি অতি মনোযোগের সঙ্গে তাহা সকলই শুনিলাম।

খুড়া বলিলেন, আমার অনেক গুণ ও বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে, আমি বেশ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু আমি জীবনের মূলতত্ব কিছুই জানি না। বিদ্যা ও জ্ঞান দুইটা স্বতন্ত্র বস্তু, বিদ্যা শিখিলেই লোকের যথার্থ জ্ঞান জন্মে না, এ পৃথিবীতে একজন অজ্ঞান বিদ্যাবান অপেক্ষা একজন জ্ঞানী

মূর্খ সহস্র গুণে শ্রেয়। আমি এখনও বালকমাত্র, আমি অনেক পুস্তক পড়িয়াছি বটে কিন্তু পুস্তকপাঠে প্রাজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না। আমি এই মাত্র সংসারে পা দিতেছি, আমার এখন অতি সাবধানে চলা কর্ত্তব্য; কোন অভীজ্ঞ, বিবেকী, বয়স্ক ব্যক্তির উপদেশের অনুবর্ত্তী হওয়া আমার একান্ত বিধেয় ও যুক্তিযুক্ত। সকলেই অসংসাহসিক কর্ম্ম অনুষ্ঠিতে পারে না, আর যাহারা যথার্থ অসংসাহসিক কর্ম্ম সম্পাদিয়াছে, তাহারা অন্য লোকদের অপেক্ষা অধিক সুখী বা অধিক জ্ঞানী নহে। তিনি আমাকে আর একটী কথা বলিলেন, তাহা চিরকাল বার বার আমার স্মরণে পড়ে। তিনি কহিলেন, যদি কেহ প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবেশিতে পারে, তাহা হলে সে দেখিবে যে, এ সংসারে যাহারা ছোট থেকে বড় হতে চাহে, তাহাদের অপেক্ষা, যাহারা বড় পদ থেকে নীচে নামিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের সংখ্যা অধিক।

খুড়ার উপদেশ শুনিয়া আমি অনেকক্ষণ স্থিরভাবে রহিলাম, ভাবিলাম খুড়া যাহা বলিলেন তাহা সবই সত্য। আমার ধৃষ্টস্বভাব বশতই ঐরূপ আচরিয়াছিলাম, আর আমি দুই বৎসর আগে যে আকাশকুসুম কল্পিয়া-ছিলাম, তাহাতে ত কোন অসংসাহসের কর্ম্ম ছিল না। আমি নিজেই বুঝিয়াছিলাম যে অনেক দূর উঠিলে সর্ব্বদা পড়িবার সম্ভাবনা, কিন্তু যে মাঝামাঝি থাকে সেই অধিক দিন স্থির থাকে। এইরূপ চিন্তার পর খুড়াকে বলিলাম,—খুড়ামহাশয়! আপনি আমার যে উপদেশ দিলেন তাহা এজন্মে কখন ভূলিব না। আমি অতি অবিবেকীর ন্যায় কাজ করিয়াছি, আপনার নিকট তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি, কিন্তু আবার পিতামাতার কাছে এ মুখ কি করিয়া দেখাব?—তিনি বলিলেন, তাহার নিমিত্ত আমার কোন উদ্বেগের আবশ্যক নাই, আমাকে কেহ কিছু বলিবে না, সে বিষয়ের ভার তিনি লইবেন।

ঐরূপ নানা কথাবার্ত্তা করিতে করিতে আমরা কলিকাতার বাড়ীর নিকট পৌঁছিলাম। উঃ বাড়ী দেখিয়াই আমার দুই পা কাঁপিতে লাগিল! আমার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, চোকের সামনে যেন কাল মাকর্সার জাল দেখিলাম; কিছুই পরিষ্কার দেখিতে পেলাম না, শুনিতে পেলাম না, কাহাকেও যেন চিনিতে পারিলাম না। কতবার নিশ্বাস ফেলিবার ও মনকে সুস্থির করিবার জন্য চলিতে চলিতে থামিলাম। এ কি প্রহার বা ভৎ র্সনার ভয়ে আমার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল? না, প্রহারের পাঠ অনেক দিন উঠিয়া গিয়াছিল, আর খুড়া আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, কেহই আমাকে ভৎ র্সিবে না; আমি কেবল লজ্জায় বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলাম, আর নিজেকে মনে মনে ক্রমাগত ধিক্কার দিতেছিলাম। বাড়ীতে পৌঁছিয়া কাহারও সঙ্গে দেখা না করিয়া একেবারে মার কাছে সোজা চলিয়া গেলাম। মা আমার শব্দ পাইয়াই ঘর হতে বাহিরে আসিলেন ও অনুকম্পার স্বরে আমাকে বলিলেন—বাছা! ঘরে এসেছিস, তবুও ভাল; আমি জানিতাম তোর এখনও বয়স হয় নাই; যাক্ আরো মন্দ খবর শুনি নাই তাহাতেই যথেষ্ট।—আমি লজ্জায় একেবারে মরিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু মার অমন দয়া ও স্নেহের কথায় আমার ধড়ে প্রাণ আসিল। আমার আহারাদির পর তিনি আমাকে আমার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে বলিলেন; আমি কিছু কিছু, বিশেষ জম্বুদাসের কথা, বাদ দিয়া প্রায় সবই বলিলাম। পিতা আমার সঙ্গে আদবে দেখা করেন নাই, আর আমিও তাঁহাকে এড়াইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম।

কয়েকদিন চলিয়া গেলে আমি আবার স্থির হলাম, পুস্তকপাঠে মনকে সান্ত্বনা দিলাম ও সকল চিন্তা অন্তর হতে তাড়ালাম। পিতা-মাতা ও খুড়া প্রভৃতি সকলে পরামর্শিয়া আমার আবার বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। আমি কলিকাতার প্রধান বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি

হলাম। লেখাপড়ায় আবার আমার মন গেল; মন স্থির করিয়া বিদ্যা-শিক্ষায় ও বিবিধ পুস্তক পাঠে নিমগ্ন রহিলাম।

কয়েক মাস কাটিয়া গেল, আমার বয়স পূর্ণ আঠার বৎসর হল; আমি এক মনে পড়াতেই ব্যস্ত থাকিলাম। ওদিকে মাতা পিতার নিকট আমার বিবাহের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, আমার বিবাহের বেশ সময় হইয়াছে, আর আমার মন যেমন উড়া উড়া তাহাতে বিবাহ দেওয়াই বিধেয়। পিতা তাহাতে স্বীকৃত হলেন, কিন্তু একটা বিশেষ আপত্তি রহিল এই যে, আমার মেজদাদার তথন পর্য্যন্তও বিবাহ হয় নাই। মেজদাদা কথন দাম্পত্য সুখের অভিলাষী ছিলেন না, অতএব পিতা অগত্যা মেজদাদাকে ছাড়িয়া আমার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। চারদিক হতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, এমন রূপের ও গুণের বর, কত লোকে আমাকে কন্যা দিবার জন্য পিতাকে সাধাসাধি করিল। বিবাহে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি স্বভাবতঃ লাজুক বলিয়া উহাতে মতামত কিছুই প্রকাশ করি নাই বরং অনেক সময়ে আমার অনিচ্ছা দেখাইয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, আমার হৃদয় ঐ সময়ে কামিনীর হৃদয়ের প্রতি সম্পূর্ণ প্রবণ ছিল, প্রেমের আধার না থাকিলেও আমার অন্তর প্রেমরসে টলমল্ করিতেছিল, আর ভাবিলাম, রাজকন্যা নাই হল, আমার একটা অর্দ্ধাঙ্গের অত্যন্ত আবশ্যক, অতএব যে কন্যাকে পাব তাহারি হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া দিব।

ঐ সময়ে পিতার একজন বিশেষ বন্ধু তাঁহার কাছে প্রস্তাব করিল যে, রাজসাহী জেলার রামপুর নগরের নিকটে কাজলা গ্রামে তাঁহার একটী আলাপী অতি সম্ভ্রান্ত লোক বাস করেন, তিনি মধ্যে মধ্যে সপরিবারে কলিকাতায় থাকেন, তাঁহার একটী বেশ সুন্দরী কন্যা আছে। লোকটী বড় ভদ্র, আর সকল দিকে ভাল, তিনি

আমার সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে অতিশয় ইচ্ছুক। ঐ পরিবার আমার বিবাহের সম্বন্ধের সময় কলিকাতায় ছিল; পিতা কন্যা দেখিয়া আসিলেন, তাঁহার পছন্দ হল। দূরে পাড়াগাঁয়ে বিবাহ দিতে পিতার প্রথমে মন সরিল না, কিন্তু আমার পাড়াগাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্তি, আর মার বাপের বাড়ী কলিকাতার বাহিরে; সকল দিকে সব ভাল কেবল ঐ একটা আপত্তি। অবশেষে তাঁহারা দিনকতক ভাবিয়া শুনিয়া ঐ কন্যার সঙ্গেই আমার বিবাহ সাব্যস্ত করিলেন। সমস্ত ঠিকঠাক হবার পর ঐ কাজলানীর সঙ্গে আমার বিবাহ হল।

যাহারা বলে আমাদের মধ্যে পরস্পর কোন সমভাব নাই, তাহাদের উক্তি নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক। তাহা না হলে কিরূপে কাজলানীর প্রতি আমার প্রথম সাক্ষাতে, প্রথম কথায়, প্রথম চাহনে একেবারে দৃঢ় অনুরাগ জন্মিল? আর এ পর্য্যন্ত যে অনুরাগের এক দিনের তরেও বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই, যে ভালবাসা আমাদের দিন দিন বাড়িতেছে, যে প্রণয় আমাদের মৃত্যুকালের শেষ শ্বাস পর্য্যন্ত একভাবে থাকিবে; যে প্রেম পরলোকেও বিনাশ পাইবে না—সে আসক্তি কিরূপে এক দণ্ডের মধ্যে জন্মিল? প্রথম দিনে, প্রথম মুহূর্ত্তে স্ত্রীর মুখ দেখিবামাত্রই কিরূপে হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিলাম? কিরূপেই বা তাহার কথা শুনিতে না শুনিতেই একেবারে আমার সমস্ত মন প্রাণ তাহাকে সঁপিলাম? বিজ্ঞেরাই এ সকল প্রশ্নের উত্তর করুন, এ সম্বন্ধে কোন কালে আমার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই। আমি এই মাত্র জানি যে, এ পৃথিবীতে যদি যথার্থ প্রেম কাহারও অন্তরে থাকে, তাহা হলে সে প্রেম আমার; যদি কেহ নিজ স্ত্রীকে কখন যথার্থ ভালবাসিয়া থাকে, তাহা হলে আমিই বিবাহ অবধি আমার স্ত্রীকে যথার্থ ভালবাসিয়াছি।

সপ্তম অধ্যায়।

জগদম্বা।

আমি এখন মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছি। অনেকে মনে করিতেছেন যে এইবার আমার নববিবাহিত স্ত্রীর রূপ বর্ণিব ও তাহার সম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিব, কিন্তু আমি ত এই পুস্তকে কাহারও রূপ বর্ণিতে বসি নাই; কেবল নিজের সকল কথা লেখাই ইহার এক মাত্র উদ্দেশ্য। আর যদি বলি আমার স্ত্রী অতি রূপসী তাহা হইলে লোকে বলিবে—লোকটা নিজের স্ত্রীর সুখ্যাতি করিতেছে—আবার যদি লিখি আমার স্ত্রী কুরূপা, তাহা হলে হয়ত আমার সহধর্ম্মিনীর অন্তরে আঘাত লাগিবে; আর পৃথিবীতে এখন আমার যে একমাত্র ভালবাসার, একমাত্র স্নেহের একমাত্র আদরের সামগ্রী আছে তাহাকে পর্য্যন্তও অসুখী করিব। এখন কি উপায়?—আর একটী কথা, আমার স্ত্রী রূপবতী ও গুণবতী হউক বা না হউক, আমার নিকটে তাহার সবই রূপ ও সবই গুণ। ভালবাসার লোকের সবই ভাল। আমি যদি স্ত্রী সম্বন্ধে কিছু লিখি, ভাল বই মন্দ কখন আমার কলম হইতে বাহির হইবে না। এরূপ ঘটিলে আমার মিথ্যা কহা হবে, কিন্তু আমি সত্য ব্যতীত কখন অসত্য বলিব না তাহা এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্টায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এ আমার দ্বিতীয় মহাসঙ্কট। এরূপ অবস্থায় নীরব থাকাই শ্রেয়, তবে কাহারও মনে যদি উৎকট ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে, তাহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অতি সংক্ষেপে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর সম্বন্ধে দুই চারটা কথা বলিব।

আমার স্ত্রীর নাম জগদম্বা, বিবাহের সময় তাহার বয়স দশ বৎসর ছিল। রূপের বিশেষ ছটা না থাকিলেও লোকে তাহাকে সুন্দরী বলিত; সৌন্দর্য্যের প্রচুরতা না থাকিলেও তাহার একটা স্বাভাবিক মাধুরী ছিল। তাহার জন্ম ভদ্রবংশে; সে অতি মৃদুস্বভাব কিন্তু সরল, ধীর কিন্তু শীঘ্র চেতন, হৃদয়ের বৃত্তি সকল তীব্র না হলেও সেগুলি স্নেহাত্মক। তাহার মন তীক্ষ্ণ নয় কিন্তু সুবুদ্ধি, মনের অবস্থা সকল সময়ে সমান না থাকিলেও উহা সতেজ ও স্বাভাবিক, আব্ভাব্ হৃদয়গ্রাহী নয় কিন্তু উহা অন্তরের সচেতন আত্মার স্পষ্ট পরিচয় দেয়। প্রথম সাক্ষাতে লোকে তাহাকে কিছু গ্রাহ্য করিবে না, কিন্তু বিনা মনের কষ্টে কেহই তাহার নিকট হতে বিদায় লইতে পারে না। যে সকল গুণ তাহার নাই, সেগুলি অন্য অনেকের আছে; যে সকল গুণ তাহার আছে, সেগুলি অন্য অনেকের অধিক পরিমাণে থাকিতে পারে; কিন্তু সুখময় স্বভাবের উপযোগী গুণচয় তাহার ন্যায় কাহারও ঐরূপ পরিপাটীরূপে নাই। তাহার অনেক দোষ আছে, কিন্তু সে সর্ব্বাঙ্গীন দোষশূন্য হলে অমন চমৎকার দোষশূন্য স্ত্রী হতে পারিত না।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন—আচ্ছা তোমার জগদম্বা তোমার পক্ষে ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহার সঙ্গে তোমার কথা না কহিতে কহিতেই, আলাপ না হবার পূর্ব্বে ঐরূপ দৃঢ় ভালবাসা জন্মিল কি প্রকারে?—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বিশেষ কঠিন ব্যাপার নয়। দুইটা তড়িত্‌ময় তারের মাঝে স্থূল অন্তরায় থাকিলেও তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণ বা বিকর্ষণের কথা কে না জানে? সেইরূপ, বিদ্বেষ বা মমতা দেখা সাক্ষাৎ না হবার পূর্ব্বে ঘটিবে ইহাতে কোন বিচিত্রতা নাই, বরং ঐরূপ দৃষ্টান্ত আমরা সচরাচর প্রায়ই দেখিতে পাই। এই হুঁতো-রামের বৃত্তান্ত পাঠে আমার প্রতি কাহারও কাহারও ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ

হইতে পারে, নিকটে না থাকিলেও তাঁহারা আমাকে কোপের জলন্ত আগুনে পুড়াইয়া ছাই করিতে ইচ্ছুক হবেন। আবার কোন কোন সুন্দরী বা এই পাগলের কোমল কথা পড়িয়া, স্নেহের বলে—আমার হুঁতোমণি—বলিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিবেন। কিন্তু তাঁহাদের বলিতেছি যে, আমার কোমলতা থাকিলেও আমার সমস্ত ভালবাসা একজনের প্রতি গিয়াছে, আর আমি এখন একটা বুড়া হাড়হাবাতে পাগলমাত্র, তাহাতে আবার একটা মস্ত স্ত্রী; তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি যেন ঐরূপে স্নেহ প্রকাশিতে ইচ্ছা না করেন।

নূতন প্রেমের বেগ কি দুর্দ্ধর্ষ! বর্ষাকালে জোয়ারের সময় নদীর বাঁধ খুলিয়া দিলে যেমন উচ্চণ্ডভাবে নদীর জল বহিতে থাকে, তোলপাড় করিয়া সমস্ত জিনিস স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া লইয়া যায়; সেইরূপ মহাবেগে আমার হৃদয় একবার প্রসর পাইয়া জগদম্বার হৃদয়ের দিকে ধাবিতে লাগিল। তাহাকে ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুই সে সময়ে আমার অন্তরে রহিল না। সমস্ত জগৎ প্রেমময় হল; যেদিকে চাই সেদিকেই জগদম্বার প্রেমময়ী মুখ দেখিতে লাগিলাম। আমার নিকট পৃথিবী যেন অন্য এক নূতন ভাব ধরিল, সকল দ্রব্যই যেন উজ্জ্বল বোধ হতে লাগিল। আমার কঠিনতা চলিয়া গিয়া আমি সাক্ষাৎ কোমলতা হলাম। যে জিনিসগুলিকে আগে কর্কশ ভাবিতাম, সেগুলি হঠাৎ অতিশয় স্নিগ্ধ হইয়া আসিল; যাহা পূর্ব্বে নীরস বলিয়া বোধ হত, তাহাতে অতি মিষ্ট রস অনুভবিলাম; যাহাতে এক কালে আমার মনে বিষম বিদ্বেষ জন্মাত, তাহা এখন অতিশয় ভালবাসিতে লাগিলাম। মনের কি বিচিত্র গতি! ভালবাসার কি মোহিনী শক্তি!

যখন জগদম্বার কাছে থাকিতাম, তখন হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রশান্ত হইয়া আসিত; কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইত না। এক মোহময় শান্তি

দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিতাম, কি এক অনুপম সুখ ভোগ করিতাম তাহা জানি না। এক মুহূর্ত্তের জন্য কোন কষ্ট না পাইয়া এইরূপে আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত অনন্তকাল কাটাতে পারিতাম। অবিচ্ছিন্নে মুখামুখি করিয়া কতক্ষণ একসঙ্গে বসিয়া থাকিতাম, তাহার মুখই অবলোকিতাম, কথা বাহির হত না; আর যখন তার দুই একটা আধটানা কথা শুনিতে পেতাম, তখন সমস্ত স্বর্গের সুখকে অতি তুচ্ছ ভাবিতাম। কখন কখন তাহাকে চিন্তায় নিমগ্ন দেখিতাম। আমি তাহাকে অবাধে সুখস্বপ্ন ভাবিতে দিতাম; নীরবে তাহার মুখকান্তি আলোচিতাম; ত্রিজগতে সকলের অপেক্ষা নিজেকে সুখী বোধ করিতাম।

কিন্তু যখন তাহাকে দেখিতে পেতাম না, তখনই তাহার প্রতি আমার অনুরাগের যথার্থ তেজ বুঝিতে পারিতাম। তাহাকে দেখিলে আমার মন সন্তুষ্ট থাকিত কিন্তু তাহার অদর্শনে একেবারে বিহ্বল হয়ে বেড়াতাম। পড়াশুনা প্রায় সবই স্থগিত হইয়া গেল। কি করিয়াই বা পাঠে মন দিব? বই খুলিতে না খুলিতেই তাহার সুন্দর বদন আমার হৃদয়ে জাগরুক হত; প্রতি অক্ষরে যেন তার ছায়া দেখিতাম। বিদ্যালয়ে অধ্যাপক পড়াতেছেন তাহা কিছুই শুনিতে পেতাম না, একমনপ্রাণে সেই হৃদয়েশ্বরীর ধ্যান করিতাম; কেবল মধ্যে মধ্যে ঘড়ী দেখিতাম কখন বাড়ী ফিরিবার সময় হবে। বাড়ীতে আসিয়া আবার কেবল মিনিট গুণিতাম, কতক্ষণে সেই কমণীয় কান্তির আলোচনায় হৃদয় পরিতৃপ্ত করিব কেবল তাহাই ভাবিতাম। সে সময়ে যে আমার কি এক অনির্ব্বচনীয় মোহাবেশ হইয়াছিল তাহা বর্ণিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। এখন তাহা মনে পর্য্যন্তও ধরিয়া উঠিতে পারি না।

কি করিয়া জগদম্বাকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা দেখাব কিরূপে তাহার প্রতি আমার যথার্থ মনের ভাব প্রকাশিব, তাহার জন্য কত

কল্পনা উদ্ভাবিতাম। কিন্তু সকলই বিফল হত, তাহাকে দেখিবামাত্র আমার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া যাইত, আমি অনিমেষ দৃষ্টিতে কেবল তাহার মুখপানে তাকাইয়া থাকিতাম। একদিন মনে করিলাম যে, আমার মনে যাহা হইতেছিল সব একখানা কাগজে লিখিয়া ধরিয়া রাখিব, কিন্তু কাগজে কলম সরিল না, গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম। কবিতার প্রতি আমার বিশেষ আসক্তি হল, প্রেমিকের ভাব কেবল কবিতাতেই প্রকাশ করা যায় ভাবিয়া নানাপ্রকার ছন্দ-বিন্যাসে নিরত থাকিতাম। সে সকল কবিতা এখন স্মরিলে কেবল হাসি পায়, কিন্তু সে সময়ে সেগুলি কি যত্নের, কি আগ্রহের সঙ্গে রচিতাম! লিখিতে লিখিতে তখনকার একটী কবিতার দুই চার ছত্র মনে আসিতেছে, উহা হতে পাঠকেরা আমার সেই সময়ের মানসিক অবস্থার দৌড় অনেকটা বুঝিতে পারিবেন—

জগদম্বে! একবার আমারে দেখা দাওরে,
বুক ফাটে দেখ এসে তোমার হুঁতো যে মরে;
তুমি এসংসারে আমার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা
তোমা বিনা অন্য আর যে নাই আমার ত্রাতা।

আমাদের বিবাহের কয়েক সপ্তাহ পরে জগদম্বা ও তাহার পিতামাতা প্রভৃতি সকলে কাজলায় চলিয়া গেল। আমি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে প্রথমে একটুও বিচ্ছেদের যাতনা অনুভব করিতে পারি নাই, আমার সর্ব্বদা মনে হত যেন সে আমাদের বাড়ীতে আমার নিকটেই ছিল। তখন আমি একেবারে জগদম্বাময়; কখন ভাবিতে পারিতাম না যে তাহার ও আমার ভিন্ন প্রাণ। এজন্য সে চলিয়া গেলেও সে বিষয়ে আমার চৈতন্যের উদয় হয় নাই। সরল ভাষায় যে অবস্থাকে ভীমরতি বলে ঐ সময়ে আমার সেই দশা উপস্থিত হইয়াছিল, নচেৎ অল্পকালের মধ্যে বিরহ

যন্ত্রণায় আমার প্রাণ বেরিয়া যাইত। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক পড়িতে আরম্ভিলাম, কিন্তু সেগুলি বড় কঠিন বলিয়া বোধ হল, স্কুলে যে সকল সামান্য অঙ্ক শিখিয়াছিলাম তাহা পর্যন্তও ভুলিয়া গেলাম; যে সকল বইতে আমার একান্ত আসক্তি ছিল সে গুলিতে তখন আমার অত্যন্ত বিরক্তি ধরিল। আমি একপ্রকার নিরুৎসাহ, নিস্পৃহ ও নির্জীব হইয়া গেলাম।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল, তখনও আমার সাড় হল না। কিন্তু সকল বিষয়েরই শেষ আছে। ক্রমে অনেক দিন নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া আমার ক্লান্তি বোধ হতে লাগিল। আগে যে সকল বই পড়িতাম সে সব ফেলিয়া বিশ্বম্ভর বাবুর নিকটে যে সংস্কৃত শকুন্তলা পড়িতে আরম্ভিয়াছিলাম তাহার প্রতিই আমার মন গেল। আমাদের পাড়ায় একজন সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকিত, তাহার কাছে গিয়া আমি অল্প অল্প শকুন্তলা পড়িতাম। সেই সময়ে আমার দুইটীমাত্র আদরের দ্রব্য হল; ভাবিবার মধ্যে জগদম্বা, আর পড়িবার মধ্যে শকুন্তলা। প্রথমে অতি আস্তে আস্তে পড়া হত, অনেক কষ্টে ও অনেক লাঠালাঠির পর প্রথম অঙ্কের কয়েক পৃষ্ঠা পড়িলাম। একে আমার সংস্কৃত ভাষায় কোন ব্যুৎপত্তি জন্মায় নাই, তাহার পর আবার জগদম্বা আমার মাথায় দিবারাত্র ঘুরিতেছে—কি করিয়াই বা বেশী পড়া হইবে!

যাহা হউক, দুই তিন মাস এইভাবে চলিয়া গেল, আমিও দুই চার ছত্র করিয়া শকুন্তলার দুই অঙ্ক শেষ করিলাম। ক্রমে উহা অনেকটা বুঝিতে পারিলাম, উহার রস অল্পে অল্পে আমার হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। কালিদাসের প্রাঞ্জল ভাষায় প্রবেশিতে অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না, আর তাঁহার সুমধুর রচনার কি এক মোহিনী শক্তি, তাঁহার সুললিত কবিতায় কি এক দীপ্তিময় সৌন্দর্য্য আছে যে, কেহই তাঁহার

নাটকের মর্ম্ম না বুঝিয়া থাকিকে পারে না। শকুন্তলা কবির অদ্বিতীয় সৃষ্টি, ইহার ন্যায় সরল, সরস ও সমগ্র সুন্দর পুস্তক আমি এ পর্য্যন্ত কোনও ভাষায় পড়ি নাই। ক্রমে যত নাটকের অর্থ বুঝিতে পারিলাম ততই যেন আমার চিন্তাশক্তি আবার ফিরিয়া পেলাম। শকুন্তলা আমার সঞ্জীবনী হইয়া দাড়াইল। যত পড়িতে থাকিলাম ততই যেন আমার অন্তরে এক বিচিত্র ভাব ধ্বনিতে লাগিল। থেকে থেকে আমার মন চমকিয়া উঠিল। কখন ভাবিতাম শকুন্তলায় কি আছে যে উহা আমাতে এক অপরূপ সমভাব সঞ্চারিতেছে; কখন ভাবিতাম এ কি শকুন্তলা পড়িতেছি না আমার জগদম্বা পড়িতেছি। আবার যখন শোক ও বিরহ সূচক বাক্যগুলিতে আসিলাম, আমার মন একেবারে দ্রব হইয়া গেল। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আর থামাইয়া রাখিতে পারিলাম না। একটা অপূর্ব্ব, অদ্ভুত চেতনার আবির্ভাব হল; চোকের জলে সময়ে সময়ে পুস্তকখানিকে ভাসাইয়া দিতাম। শিশুকালে পুস্তকপাঠে রোদিতাম, এখন আবার শকুন্তলা পাঠে অশ্রু বিসর্জ্জিলাম, কিন্তু এই দুই অবস্থায় প্রভূত প্রভেদ। যৌবনকালে সকলই ভিন্ন মূর্ত্তি ধরে, আন্তরিক প্রবৃত্তিগুলিরও যৌবনাবস্থা হয়। শিশুকালের শোক মৃদু, সরল, অমায়িক; যৌবনকালের শোক তীব্র, তীক্ষ্ণ, মর্ম্মান্তিক। তাহাতে আমার এই প্রথম বিরহ, আর সে বেদনা অল্পে পেলাম না, উহা যেন তড়িতের ন্যায় অকস্মাৎ আমার হৃদয়ে ঝনিল।

আমার পাঠে বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটিল, আমার মনে অসাধারণ রূপান্তর হল। বিরহের অনেক অবস্থা আছে, কিন্তু আমি সে সময়ে এক অবস্থাতেই ছিলাম। অনবরত এক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকিলাম। কেবল উন্মাদ, উন্মাদ, উন্মাদ। সে সময়কার সকল কথা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না, আর সে সব কথা শুনিয়া লোকে কেবল হাসিবে ও আমার উপর

নানা বিদ্রূপ করিবে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমার পক্ষে সে সময় হাসির সময় ছিল না, আমার তখন প্রাণ লইয়া টানাটানি। আর যখন সকল কথা লিখিতে বসিয়াছি তখন নাচ্‌তে বসে ঘোমটা টানায় কি দরকার? পাঠক! বোধ হয়, তুমি ইহার মধ্যেই আমার প্রেম কাহিনীতে ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছ, আর এ অধ্যায়টিকে স্ত্রীময় দেখিয়া আমার উপর কিছু কিছু বিরক্তও হইয়াছ। কিন্তু এ বিষয়ে আমি নাচার, আমি সেই সময়ে স্ত্রীতে স্ত্রীময় ছিলাম, তবে এ অধ্যায়টীও স্ত্রীময় হবে তাহাতে আমার কি দোষ বল। যখন বাস্তবিক ঘটনা বর্ণিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন যাহাতে তোমার ক্লান্তি বা বিরক্তি না হয় এরূপ কেবল ভাল মনোহর বিষয়গুলি সাজাইয়া একটা কল্পিত উপন্যাস রচিলে আমার কর্ত্তব্য পালন করা হয় না। ঐ সকল কথা অতি তুচ্ছ ও হাস্যকর তাহা আমি কোটিবার স্বীকার করি, আমারও উহা লিখিতে বিষম লজ্জা বোধ হয় ও সময়ে সময়ে উহা মনে করিবামাত্র হাসিয়া হাসিয়া আমার শরীর ফাটিয়া যায়, কিন্তু—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—এ বাক্যটী তুমি ত জান। আর ভাই! এ পৃথিবীতে আমিই কেবল স্ত্রীদোষে দোষী নই, বোধ হয়, আমার জাত ভাই খুঁজিতে বেশী প্রয়াস পাইতে হয় না। তবে যত সংক্ষেপে পারি আমার উন্মাদ অবস্থার দুই একটী কথা বলিয়া শেষ করি।

কাজলানী আমাকে একেবারে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। সমস্ত ছাড়িয়া সেই জগদম্বার ধ্যানে মগ্ন রহিলাম। বাড়ীতে বাঙ্গালা, ইংরেজী যত মানচিত্র ছিল সব আনিয়া কেবল কাজলা গ্রামের চিহ্নের অন্বেষণে বিব্রত থাকিতাম। কিন্তু কোথায় বা কাজলা? কোনটীতেই ঐ গ্রাম খুঁজিয়া পেতাম না, কাজলা—কাজলা—করিয়া আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। জঘন্য কুষ্মণ্ড মানচিত্রগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হত। কাজলা নাই এমন মানচিত্র ছাপাবার

কি আবশ্যক? বিনা কাজলায় মানচিত্রকে অপমানচিত্র বলিয়া বোধ হত। ক্রোধ বশে ঐরূপ যে কত মানচিত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলাম তাহার ঠিকানা নাই। অবশেষে রামপুর লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতাম, আন্দাজে কাজলার নির্দ্দেশ করিতাম। একটা ভিন্ন কাগজে পেন্সিল দিয়া কলিকাতা হতে কাজলা যাইবার পথ আঁকিলাম, পড়িবার সময় তাহাই বইয়ের উপর রাখিয়া একমনে আলোচিতাম, আহার নিদ্রার সময়ে তাহা আমার বুকে করিয়া রাখিতাম। প্রাণটা অবিরত হু হু করিত। কখন মনে করিতাম দুইটা ডানা বাঁধিয়া প্রেয়সীর কাছে উড়িয়া গিয়া পড়ি; কখন ভাবিতাম একটা চীলের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে কাজলা অভিমুখে যাই; কখন বা দুপর বেলা ছাদে রৌদ্রে বসিয়া সূর্য্যকে সম্ভাসিয়া বলিতাম—হে সূর্য্য! এখানে তুমি রৌদ্র বিস্তারিতেছ, কাজলায়ও সেই তোমার রৌদ্র, তুমি আমাকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া তোমার রৌদ্রের সঙ্গে মিশাইয়া দাও, আমি আর কিছু চাহি না; সেই ছাই নিশ্চয় তোমার রৌদ্রের সঙ্গে কাজলায় গিয়া জগদম্বাকে স্পর্শিবামাত্র সজীব হইয়া উঠিবে।

রাত্রিতে আমার যন্ত্রণা একেবারে অসহ্য হইয়া আসিত। প্রেয়সী বিরহে সবই আমার পক্ষে কাঁটাময় বোধ হত, সকলই শূন্য দেখিতাম, ঘরে শুইতে যাইতে পা সরিত না। আমার জগদম্বা সে বিছানায় শুইয়াছিল ভাবিয়া কতবার বিছানাকে চুমা খেতাম; বিছানার মশারী, খাটের পায়া, সমস্ত ঘরের জিনিসপত্র—তাহার সুন্দর হাত সে সকল স্পর্শিয়াছিল ও সে সেই ঘরে ছিল বলিয়া—কতবার সেগুলাকে জড়িয়া ধরিতাম; কতবার তাহার রাঙ্গা পা দুখানি ঘরের মেজে মাড়িয়েছিল স্মরিয়া ধড়াশ করিয়া মেজের উপর পড়িয়া যেতাম। কত মাস চলিয়া গেল তবুও যেন জগদম্বার গন্ধ বালিশে শুঁকিতাম, বালিশকে চোকের জলে ভাসাইয়া

দিতাম, আর হা জগদম্বে—হা জগদম্বে—বলিয়া ফুঁফিয়া ফুঁফিয়া কাঁদিতাম। ছয় মাস পরে তাহার আবার আমাদের বাড়ী আসিবার কথা শুনিলাম, কিন্তু আমার যন্ত্রণা না কমিয়া বরং আরো তীব্র হইয়া উঠিল। দিন গুলা আর ফুরায় না, এক এক মুহূর্ত্ত এক এক যুগ বোধ হতে লাগিল। আসিবার যত দিন বাকি ছিল ততগুলা কাগজ সাজাইয়া কাঁচি দিয়া কচ্ কচ্ করিয়া কাটিয়া ফেলিলাম, ভাবিলাম দিনগুলারও ঐরূপে একদমে লোপ পাইল।

অবশেষে আবার জগদম্বাকে ফিরিয়া পেলাম, আবার হুঁতোরাম সজীব হইয়া উঠিলেন, আবার যেন পৃথিবীর নূতন সৃষ্টি হল। বুঝিলাম জগদম্বাকে যে ত্রাতা বলিয়া উদ্দেশ করিতাম তাহা সম্পূর্ণ অমূলক উদ্ভ্রান্ত উক্তি নয়, কেননা এতদিনের পর যেন অন্ধকার থেকে আলোয় আসিলাম। বিনা জগদম্বে সকলই অন্ধবার বোধ হত, এখন সজগদম্বে সকলই স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম। এই বার আমার মুক্তি সাধন হল ভাবিয়া যার পর নাই হর্ষে উথলিয়া পড়িলাম।

প্রথম বারে স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ প্রায় হয়ই নাই, এইবার প্রথম দিনেই বেশ কথাবার্ত্তা করিলাম। দেখিলাম আমার জগদম্বা অনেকটা শিয়ানা হইয়াছে, লজ্জাভয় কতক কমিয়াছে, তাহাকে আমার প্রতি বিশেষ স্নেহপ্রবণ বোধ হল। ভাবিলাম আমার মত তাহারও প্রথম সাক্ষাতে বিলক্ষণ প্রণয় জন্মিয়াছিল, তাহারও হৃদয় প্রথম ঘাতেই বাজিয়াছিল। না হয়, নিশ্চয়ই আমার দুঃখের কথা, আমার বিরহ-ব্যথা, আমার অন্তরের প্রেমোচ্ছ্বাস, আমার সরোদন নিশ্বাস বাতাসে উড়িয়া গিয়া তাহার কান স্পর্শিয়াছিল। তাহা না হলে এবার তাহাতে অত ভালবাসা দেখিলাম কেন? কেনই বা তাহার কথা অমন মিষ্ট বোধ হল? আর তার ত কথা নয়, যেন এক একটী অমৃতের ফোঁটা আমার

শীর্ণ হৃদয়ে পড়িতে লাগিল। এক এক বার মনে হল, বুক চিরিয়া আমার হৃদয়ের সকল ভাব একেবারে জগদম্বাকে দেখাইয়া দিই, তাহা হলে সে বুঝিতে পারিবে যে, সে হৃদয় তখন আমার ছিল না, সে হৃদয়ে তখন তাহারই একাধিকার। কিন্তু তাহা অসাধ্য। ভাবভঙ্গিতেই যতদূর পারিলাম অন্তরের ভাব প্রকাশিলাম, কথা পর্য্যন্তও সে সময়ে যুটিল না। আহা! যথার্থই যদি আমরা বুক চিরিয়া লোককে আন্তরিক ভাব দেখাতে পারিতাম, তাহা হলে কত ক্লেশ, কত কথা কত সময় বাঁচিত।

এইরূপে কয়েক দিন কাটিল, আমার ভালবাসার প্রথম স্রোত বহিয়া গেল। ক্রমে জগদম্বার লেখাপড়ার কথা ভাবিলাম। সে একেবারে মূর্খ ছিল না, পাড়াগাঁয় মেয়ে হলেও তাহার কিছু কিছু বাঙ্গালা শিক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু সে যৎসামান্য বিদ্যা কোন উপকারে আসিবে না, বা পরে আমাদের মনে মনে মিলিবে না এই শঙ্কায় তাহাকে আমি নিজে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাব নির্দ্ধারিলাম। নিজের পয়সায় দুই চার খানা সরল বাঙ্গালা বই কিনিয়া তাহাকে পড়িতে দিলাম। নিজের পড়াশুনা ছাড়িয়া কি করিয়া তাহাকে শীঘ্র শিখাব, কি করিয়া তাহার পাঠে মন বসিবে, তাহারই উপায় কল্পিতে লাগিলাম। রাত্রিতে ঘুমাবার আগে তাহাকে কিছু কিছু পড়াতাম, কিন্তু পড়ান দূরে থাকুক সে যেই প্রদীপের আলোর সামনে বই হাতে করিয়া পড়িতে আরম্ভিত, আমি সব ভুলিয়া গিয়া তাহার মুখপানে তাকাইয়া একমনে তাহার মুখই আলোচিতাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বই টই সব বন্ধ হইয়া যাইত, হৃদয় যখন প্রেমরসে থই থই করে তখন কি আর কিছু ভাল লাগে? উচ্চণ্ড প্রেমের ভরে সময়ে সময়ে কিই বাড়াবাড়ি না করিতাম!

এ সুখস্বপ্ন অধিক দিন থাকিবার নয়। দুই মাস পরে জগদম্বার

দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় আসিল, আমার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হল। আবার পূর্ব্বের বিরহযন্ত্রণা সকল একে একে মনে পড়িল, ভাবিলাম এইবার নিশ্চয়ই আমার প্রাণবিয়োগ ঘটিবে। ক্রমে সে ক্রূর কাল যত নিকটে আসিতে লাগিল ততই আমি উতলা হইয়া উঠিলাম। স্ত্রীর লেখাপড়া সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি হয় নাই, কিন্তু আমার কপালটা অতি ভাল যে, সে অল্প অল্প লিখিতে ও পড়িতে পারিত। তাহাকে বাপের বাড়ী যাবার আগে আমাকে প্রায় পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলাম। কি করিয়া পত্র লিখিতে ও কিরূপে চিঠী মুড়িতে হয় তাহা বার বার তাহাকে দেখাইয়া দিলাম; কতকগুলা খামে আমার নাম, ঠিকানা লিখিয়া তাহার হাতে দিলাম ও বলিলাম—জগদম্বে! দেখিও, এই চিঠীতে আমার প্রাণ রক্ষা হবে, চিঠী লিখিতে কথন ভুলিও না।—আবার বলিলাম—দেখিও, ভুলিও না;—সে আমাকে নিশ্চয় পত্র লিখিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, আর যখন আমাকে বলিল—দেখিও, তুমি আমাকে লিখিতে ভুলিও না—তখন আমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দমিয়া না রাখিতে পারিয়া তাহার গাল চুমায় ভরিয়া দিলাম।

জগদম্বা আমায় ছাড়িয়া চলিয়া গেল, আমি আরার বিষাদে ডুবিলাম। বাড়ী শূন্য বোধ হল, সমস্ত পৃথিবীকে অরণ্যময় দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু এবারের ও পূর্ব্বের বিচ্ছেদে অনেক প্রভেদ ছিল। এবার তাহার সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, তাহাকে মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছি আর সেও আমাকে তাহার অনুরাগ প্রকাশিয়াছে। নদীর বেগ রুদ্ধ থাকিলেই আশপাশ সমস্ত তোলপাড় করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়, একবার বহিলে সে বেগ শান্ত ও ধীর হইয়া আসে। আমার ভালাবাসারও বেগ সেইরূপ এবার অনেকটা ধীর ভাব ধরিল। আর এবার পত্রের দ্বারা আন্তরিক উচ্ছ্বাস কতক অংশ বাহির করিয়া দিলাম। সে সময়ের

পত্র কি মিষ্ট ছিল, এক একখানি পত্র দশবার কুড়িবার করিয়া পড়িতাম, তবুও প্রাণের তৃপ্তি হত না। যত পড়িতাম তত আবার পড়িতে ইচ্ছা যাইত। সেই জগদম্বার আঁচড় পিঁচড় কাটা লেখা তখন কেমন চমৎকার বোধ হত। পড়িতে পারিতাম আর নাই পারিতাম, কিছু লিখিত আর নাই লিখিত, আমি তাহার মনের ভাব বুঝিয়া লইতাম। আমিই বা সেই সময়ে কি বিচিত্র পত্র রচিতাম। এখন সে সব স্মরিলে না হাসিয়া থাকিতে পারি না, কিন্তু তখন পত্র আমার প্রাণ ছিল। কখন বা অতি ঘোর ঘটায় লিখিয়া তাহাকে চমকাইয়া দিতাম, কখন বা অতি সরলভাবে মনের কথা ব্যক্ত করিতাম। ঐ সময়ে নাটক, উপন্যাস ছুই চারখানা পড়িতাম; আর নূতন বাঙ্গালা প্রেমের বই বাহির হইতেছিল, তাহার অনুকরণে আমারও প্রেমের মহা সংরম্ভ বিকাশিবার অভিপ্রায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমাজ ঘটিত বাক্যসংযোগে পত্র রচিতাম। জগদম্বা সে সকলের মর্ম্ম গ্রহিত কি না তাহা জানি না, তাহাকে কখন সে বিষয়ে ভাল জিজ্ঞাসিও নাই। আবার কখন বা বাগাড়ম্বর ফেলিয়া দিয়া নিজের কথায় নিজের মনের মত চিঠী লিখিতাম। আমাদের সঙ্গে সেই সময়কার কয়েকটী পত্র এখনও আছে, ছুই রকমের ছুইখানা থেকে কতক ভাগ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

একটী—

হে অমলকমলদলসম্ভারসন্নিভমনোহরচারুচিকোরাননধারিনি! তব বিরহদাবানলেভস্মীভূতাবশিষ্টমাত্র হুঁতোরামের প্রতি একবার কৃপা-কটাক্ষপাত করিবা। তুমি এ বিচ্ছেদমহাসাগরডুবিত হতভাগ্যের এক-মাত্র পরিত্রাণকারিণী, তুমি সেই বিষাদ সমুদ্রগর্ভস্থলতলাৎ এই যমপুরী-গচ্ছমানসন্নিমৃত্যু মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দড়ি দিয়া উত্তোলন না করিলে আমি মর মর হই।—ইত্যাদি।

আর একটী—

জগদম্বে!

তুমি এখান থেকে গিয়া অবধি আমার যে কি পর্য্যন্ত মনে কষ্ট হতেছে তাহা তুমি নিজের মনেই বুঝিতে পারিতেছ। আমরা একদিন পাশাপাশি বসিয়া বলিয়াছিলাম—আমরা দুজনে ঠিক এক গাছের জোড়া জামের মত, একটী শুকালে অন্যটী শুকিয়া যাবে, এক আধখানাকে কাটিয়া ফেলিলে আর আধখানাটা ঝরিয়া যাবে—সে কথা কি এখন মনে পড়ে? —ইত্যাদি

এইরূপ কয়েক মাস কাটিয়া গেল, আমার বিষাদ আর ফুরায় না। বাজনা শুনিতে আমি বাল্যকাল হতে বড় ভালবাসিতাম, কিন্তু এখন কোন প্রকার মৃদু বাজনা শুনিবামাত্র আমার অন্তরে ঝনাৎ করিয়া এক রকম আঘাত লাগিত, আমি অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িতাম, চেতনা থাকিতেও আমি অচেতনের মত হইয়া যেতাম। একদিন বসন্তকালে ভোরে ছাদে বেড়াইতেছি, মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে, উপরে নীলবর্ণ আকাশ, নীচে সমস্ত পৃথিবী ঘুমে অবসন্ন, এমন সময়ে কোথা হতে হঠাৎ বেহালার অতি সরু স্বর আসিয়া আমার কানে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ মোহাচ্ছন্ন হইয়া গেলাম, আমার হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হল, আমি কি এক অপরূপ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। মনে হল, চারদিকে সুন্দর সবুজ ক্ষেত বিস্তৃত রহিয়াছে, নূতন সূর্য্যের গোলাপী কিরণে গাছপালা সব হাসিতেছে; রাখালেরা গরুর পাল লইয়া নিজ নিজ কুটীর হতে মাঠে বাহির হতেছে; সুমুখে একটা পুকুর, তাহাতে হাঁস ও সারস অতি আনন্দে খেলিতেছে; বড় বড় গাছে পাখীরা বসিয়া হৃষ্টভাবে গাইতেছে। দূরে এখানে একটা সেখানে একটা বাড়ী তাহার মধ্যে একটার দিকে আমার চোক পড়িল, দেখিলাম আমার

জগদম্বা একটা জানালার কাছে বসিয়া গালে হাত দিয়া ঐ দৃশ্য দেখিতেছে আর কি ভাবিতেছে—বেহালার বাজনা থামিল, আমি সহসা চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম।

ঐ সকল কথা আমার এখন যখনই মনে পড়ে, দুঃখে আমার বুক ফাটিয়া যায়, মনে হয় তখন কি সুখের কাল ছিল আর এখন আমার কি দশা উপস্থিত। এজন্মে আমার সকল সুখস্বপ্ন চলিয়া গিয়াছে, আমি এখন কঠোর সংসারে ভাসিতেছি। ক্রমে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পরীক্ষার সময় নিকটে আসিল। এতদিন লেখা পড়া প্রায় একেবারে বন্ধ ছিল; যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হই তাহা হলে বড় অপমান হবে, লজ্জায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারিব না, মনে বড় ভয় জন্মিল। ঐ সকল বিষাদচিন্তা মন থেকে অল্পে অল্পে দূর করিয়া আমি প্রাণপণে আমার পরীক্ষার পাঠ পড়িতে ব্যস্ত থাকিলাম।

অষ্টম অধ্যায়।

ইতিহাস।

ছয় মাস অন্য সব চিন্তা দূরে ফেলিয়া কেবল পরীক্ষার পাঠ অভ্যাসে নিবিষ্ট রহিলাম। পরীক্ষা আসিল, আমি উত্তীর্ণ হলাম। অনেকে ভাবিবেন যে, ইহাতে আমার বীরপনা দেখাইতেছি, এতদিন কেবল স্ত্রী লইয়াছিলাম, এখন অতি অল্প দিনের মধ্যে মনকে সম্পূর্ণ বদলিয়া কঠিন পাঠে প্রবৃত্ত হলাম ও অনায়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উৎরিলাম। বোধ হয়, তাঁহারা আমার স্বভাবকে উত্তমরূপে জানিলে ঐরূপ ভাবিবেন না। আমি স্বভাবতঃ উষ্ণ ও উদ্ধত, কিন্তু আবার স্বভাবতঃই জড় ও মন্থর; সহসা কোন কার্য্যে অগ্রসর হই না কিন্তু একবার ধরিলে তাহাতে এক মনে নিমগ্ন থাকি। আমাতে যেন দুইটা ভিন্ন ব্যক্তি মিশ্রিত রহিয়াছে। কখন আমি মহাঝড়ের মত প্রচণ্ড, কখন বা নিশ্চল পুকুরের মত ধীর ও শান্ত। এই আমি এতদিন একেবারে স্ত্রীময় ছিলাম, এখন আবার পরীক্ষার অঙ্কুশে জাগিয়া উঠিয়া একমনে একপ্রাণে পড়িতেই থাকিলাম। ঐ দুই সময়ে আমার মনের অবস্থা দেখিলে কে বিশ্বাস করিবে যে আমি সেই এক ব্যক্তি? কোন নূতন ভাব বিদ্যুতের অপেক্ষা ঝটিত আসিয়া আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাপিয়া ধরে; কিন্তু তাহা আমার মনের স্বচ্ছতা সম্পাদনের পরিবর্ত্তে উহাকে ঝলসিয়া দেয় ও পুড়িয়া ফেলে। আমি সকলই টের পাই অথচ কিছুই দেখিতে পাই না। জড়-বুদ্ধির মত ঐ ভাবের দ্বারা আমি সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত থাকি; কিন্তু যখন

আমার উষ্ণতা উপশান্ত হইয়া আসে আমি আবার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া পাই, আবার সকল দ্রব্য পরিষ্কার দেখিতে থাকি।

এইরূপ বৈষম্যের দরুণ সময়ে সময়ে আমি বিলক্ষণ কষ্ট পাই। আমার সজীব অবস্থায় মনে রাশি রাশি ভাব এক সঙ্গে আবির্ভূত হয়; বিনা জ্ঞানে সেগুলি সঞ্চালিতে থাকে; মনকে অত্যন্ত উত্তেজিয়া আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে। আর আমি ঐ গোলযোগের মধ্যে কিছুই পরিপাটীরূপে দেখি না, একটী ভাবও কথায় প্রকাশিতে পারি না; আমায় কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হয়। ক্রমে ঐ মহা আলোড়ন বিলীন হইয়া আসে, গোলযোগ অল্পে অল্পে মিটিয়া যায়; অনেক বিলম্ব ও অনেক প্রক্ষোভনের পর আবার সকল দ্রব্যকে নিজের নিজের স্থানে দেখিতে পাই। এই কারণেই কোন বিষয় লিখিতে প্রথম আমার যারপরনাই কষ্ট বোধ হয়। আমার মনে সময়ে সময়ে যেরূপ চমৎকার ভাব উঠে সে সব যদি আমি কাগজে প্রকাশিতে পারি, তাহা হলে অতি অল্প গ্রন্থকার আমাকে অতিক্রমিতে পারেন। কিন্তু যেই কাগজ কলম সম্মুখে লইয়া বসি অমনি সব একে একে পালিয়া যায়।

এই আমার নিজের বৃত্তান্ত লিখিতে আমাকে যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিতে হইতেছে তাহা অতি অল্প লোকই বুঝিবেন। প্রথমে আমার জড়তা ভাঙ্গিতেই আমি মুমূর্ষু প্রায় হই, তাহার পর কত সাধ্য-সাধনার বলে মনকে প্রস্তুত করি; এত প্রয়াসের পর বা যদি আমি স্থিরভাবে টেবিলের সাম্নে বসি তা মনের ভাবগুলি সংগ্রহিতে আবার মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়। যখন একবার গরম হই, কলম সড়্ সড়িয়া চলিতে থাকে, কিন্তু একবার আরম্ভিতে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা, মহামারি ব্যাপার উপস্থিত হয় তাহা আমিই জানি আর বিধাতাই জানেন। এত কষ্টেরও পর যে মনে কিছু শান্তি পাই তাহা নয়। সময়ে সময়ে সব

লেখা পুড়িয়া ছারখার করিতে যাই। ভাবি এ পাগলের কথায় কে আস্থা লইবে, কেই বা এই ছাই ভস্ম পড়িবে, মিথ্যা এত কষ্ট সহিতেছি কেন? হয় ত যদি ইংরেজিতে এই সব কথা লিখিতাম তাহা হলেও বা দুই চার জন ঔৎসুক্যের জোরে পড়িতেন, কিন্তু পোড়া বাঙ্গালা ভাষায় লিখিলে কেহ একবার দৃষ্টিপাতও করিবে না বলিয়া বোধ হইতেছে। তার পর আবার আমার ভাষার যে শ্রী, না আছে মাথা, না আছে মুণ্ড—কেহই এই বই ছুঁইবে না। আবার মনে হয়, যখন একবার লিখিতে বসিয়াছি তখন মাঝখানে ছাড়িয়া দেওয়া বা বই শেষ না করা অতি কাপুরুষের কাজ, আর ইংরেজীতেই লিখি বা বাঙ্গালাতেই লিখি জিনিসটাত একই; বাঙ্গালীদের জন্য এই বই রচিতেছি, আমি নিজে বাঙ্গালী, তবে নিজের ভাষায় নিজের জাতিকে মনের ভাব প্রকাশিলে দোষ কি? প্রায় সকলেই পরীক্ষাকে ভয়ঙ্কর, জঘন্য, সর্ব্বনাশক সামগ্রী বলিয়া ভাবেন, আমিও পরীক্ষার নামে জর্জ্জরিত হতাম; কিন্তু পরীক্ষাই আমাকে, ঐ সময়ে প্রাণান্তক জড়তা থেকে পরিত্রাণ করিয়াছিল। পরীক্ষার নিমিত্ত পড়িতে পড়িতে আমি আমার পড়ার আসক্তিকে আবার ফিরিয়া পেলাম। পরীক্ষার পর আমার স্ত্রীনেষা কমিয়া আসিল, আমি আবার মনের মত বই পড়িতে আরম্ভিলাম।

ঐ সময়ে ইতিহাস আমার অতি প্রিয় পাঠ্যবস্তু ছিল। বাল্যকালে ইতিহাসকে কেবল ঘটনা ও তারিখের রাশি ভাবিয়া বিষম ঘৃণার চোকে দেখিতাম, কিন্তু এখন বড় হইয়া নিজে নিজে পড়িবার সময় উহার যথার্থ উদ্দেশ্য অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। ইতিহাসে কি না শিক্ষা দেয়? কোন জাতির ইতিহাস পড়িলে, আমরা সে জাতির উৎপত্তি, উদয়, অবনতি, ও পতন সমস্তই জানিতে পারি। কেমন অল্পে অল্পে একটা জাতির সৃষ্টি হল, কোন্ গুন সকল বা কোন্ দোষ সকল থাকাতে সে

জাতি উন্নতি বা অবনতি লভিল, তাহার সমাজের প্রকৃতি ও সংস্থান, যে সকল নিয়মে সে সমাজ বদ্ধ হইয়াছিল, ও যে সকল কারণে তাহা হ্রাস পাইল—এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে ইতিহাস আমাদের একমাত্র শিক্ষক। পুরাকালীন লোকদিগকে পাথরের প্রতিমূর্ত্তি না ভাবিয়া, আমাদের ন্যায়, রক্তমাংসের শরীরবিশিষ্ট মানুষ জ্ঞান করি; আর বর্ত্তমান লোকদের মত তাহাদেরও রাজনীতি, ব্যবস্থা, ও ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করি। আমরা যে সকল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলি, যে সকল রিপু আমাদের হৃদয়কে বিক্ষোভিত করে, যে সকল সামান্য কুসংস্কার, ভ্রম ও প্রমাদে আমাদের মন আচ্ছন্ন হয়—ইতিহাস পাঠে বুঝিতে পারি যে, আমাদের পূর্ব্বগামীরাও সেই সকল প্রবৃত্তির অধীন ছিল, সেই সকল রিপু দ্বারা তাহাদেরও অন্তর মথিত হইয়াছিল, সেই সকল তুচ্ছ কুসংস্কার, ভ্রম ও প্রমাদ তাহাদেরও মনে হীনতা ও অবসাদ জন্মাইয়াছিল। তাহাদের ভুল দেখিয়া আমরা তাহাদের দোষ পরিহরিতে শিখি, তাহাদের ভাল দেখিয়া তাহাদের গুন অনুকরিতে থাকি। অতীত কাল আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই কালেরই উপদেশক। পূর্ব্বকালের ব্যবস্থা সকলের দোষগুণ বিচারে আমরা বর্ত্তমান কালের বিধানসমূহের ভালমন্দ নির্ণয়ে সক্ষম হই, আর ভবিষ্যতে আমরা কোন্ প্রকার প্রথানুসারে চলিলে উপকার বা অপকার ঘটিবে, তাহা অবধারণের জ্ঞান পাই।

আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস পাঠে আমরা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সমাজবন্ধন, রাজনীতি, ব্যবস্থা, ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পরস্পর তুলনা করিয়া কত নূতন জ্ঞানের অধিকারী হই। কেনই বা এক জাতির উন্নতি ও কি কারণেই বা আর এক জাতির অবনতি হয়; কোন্ গুণদোষের সদ্ভাবে এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কি কারণে এক দেশের প্রভৃতি প্রকৃতি প্রসন্ন থাকিলেও তাহার লোকেরা হীনাবস্থ ও দুঃখী; কি কারণে

আর এক দেশ স্বভাবত অফলদ ও অনুর্ব্বর হলেও তাহার লোকেরা সমৃদ্ধ ও সুখী; কেনই বা দুই দেশের মধ্যে প্রায় সকল বিষয়ে সাদৃশ্য সত্বেও সেই সেই দেশের বাসীদের অবস্থার মধ্যে অতিশয় রূপান্তর ঘটিয়া থাকে; কি কারণে এক জাতি বলিষ্ঠ ও দিগ্বিজয়ী, অন্য জাতি ক্ষীণ ও হীনপ্রভ; কেনই বা এক জাতি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, আর অন্য জাতি পরাধীন ও পরদলিত—এ সকল বিষয়ে আমরা পরস্পরের ইতিহাস উত্তমরূপে মিলাইয়াই সম্যক ব্যুৎপন্ন হতে পারি। স্বদেশ ও বিদেশের যথার্থ প্রভেদ জানিবার জন্য স্বদেশ ও বিদেশের ইতিহাস পড়াই প্রকৃত উপায়।

আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন কথা জানিয়া কোন্ ভারতবাসীর হৃদয় আহ্লাদে না উথলিয়া উঠে? পৃথিবীতে যখন অন্য প্রায় সকল জাতি একেবারে মূর্খতা ও অসভ্যতায় আচ্ছন্ন ছিল, আমাদের ভারত তখন বিদ্যা ও সভ্যতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধার বলিয়া পরিগণিত হত। অন্য জাতিদের মধ্যে যে সকল গুণ অতি বিরল দেখা যাইত, প্রাচীন হিন্দু জাতি সেই সকলে অগ্রগণ্য ও জগদ্বিখ্যাত ছিল। বিদেশীয়েরা তৎকালে হিন্দুদের গুণ, সৎস্বভাব, বুদ্ধিকৌশল প্রভৃতি দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। মেগাস্থিনিস নামে গ্রীসের এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত হিন্দুদের সম্বন্ধে যীশুখ্রীষ্টের তিন শ বৎসর আগে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে তিনটী অতি শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বিষয় স্পষ্ট দেখা যাইত—দাসত্বের অসদ্ভাব, স্ত্রীলোকদের সতীত্ব ও পুরুষদের সাহস। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, হিন্দুরা শৌর্য্যে সমস্ত আসিয়াবাসীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাদের বাড়ীর দরজায় কখন চাবিতালার আবশ্যক হত না; আর এ সকলের অপেক্ষা তাহাদের আরও ভাল গুণ এই যে, তাহারা কখন মিথ্যা কথা কহে না। পরিমিতাচারী ও পরিশ্রমী, উৎকৃষ্ট কৃষিবিৎ ও নিপুণ কৌশলজ্ঞ, হিন্দুরা কখনই মোকদ্দমার জন্য বিচারালয়ে যাইত না আর

নিজেদের রাজার ভক্ত প্রজা থাকিয়া অতি সুখস্বচ্ছন্দে ও শান্তভাবে জীবন যাপন করিত। বিদেশীয়েরা যখন এইরূপে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণ কীর্ত্তিয়াছেন, তখন ইহার অপেক্ষা অধিক সম্মান ও গৌরবের বিষয় আর কি আছে ?

অপর অর্থাৎ মন্দ দিকে ভারতের পুরাবৃত্তে জানিতে পারি যে, অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিকে অল্প স্থানে হিন্দুদের অধিকার ছিল, আর তাহা প্রায় এক শ কুড়িটা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর মিল থাকার পরিবর্ত্তে উহাদের মধ্যে প্রায় কলহ বিবাদ ঘটিত; গ্রীসীয়দের আক্রমণকালেও ভয়ঙ্কর দলাদলির প্রভাব দেখা গিয়াছিল। হিন্দুদের সভ্যতা রাজনীতি, জ্ঞান, বিদ্যা বরাবরই প্রায় একভাবেই ছিল, বরং দুই একটী বিষয়ে তাহাদের স্পষ্ট অবনতি হইতেছিল। ইতিহাস পাঠে হিন্দুদের সম্বন্ধে আর একটী বিষয় অবগত হওয়া যায়। তাহাদের বিলক্ষণ সাহস ও শৌর্য্য থাকিলেও কোন যুদ্ধে তাহাদের নায়ক বা সেনাপতি আহত বা হত হলেই তাহারা একেবারে ভগ্নোৎসাহ ও ভগ্নবীর্য্য হইয়া যাইত শত্রুপক্ষ তখন অনায়াসে তাহাদের বিধ্বস্ত করিত। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে —কি হিন্দুদের কালে, কি মুসলমানদের সময়ে কি ইংরেজদের রাজত্বে— আমরা অনবরত দেখিতে পাই।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তপাঠে যেমন পরম সুখ অনুভব করি, আমাদের দেশের আধুনিক ইতিহাস পড়িয়া সেইরূপ তীব্র দুঃখ পাই। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসকে বেদনার ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেশের বর্ণনা পড়িয়া দেশের দুরবস্থার প্রতি আমার প্রথমে চোক ফুটিল। স্বদেশ ও বিদেশের ইতিহাস হতেই স্বদেশ ও বিদেশের অবস্থার প্রভেদের কারণ যথার্থ বুঝিতে পারিলাম।

ঐ সকল প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কেবল একজন লোকের সঙ্গে কথা কহিতাম, কিন্তু তাহারও নিকটে কখন যথার্থ আন্তরিক ভাব প্রকাশিতে পারিতাম না। অনৃত নামে একজন সমবয়স্কের সঙ্গে কোন সূত্রে ঐ সময়ে আমার আলাপ হয়। ক্রমে তাহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিল, পরে সে ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বে পরিণত হন। লোকটা আমাকে চিরকাল বড় ভালবাসে, আমিও তাহাকে বরাবর ভালবাসি। অনু অতিশয় অমায়িক লোক, সকল বিষয়ে বিচক্ষণ না হলেও তাহার হৃদয়ের সমস্ত গুণ আছে। আমিও আগে লোকের অন্তরের অবস্থা দেখি; যাহার অন্তর ভাল, আমি তাহাকেই আন্তরিক আদর করি ও ভালবাসি। অনু যে আমার কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না, কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই করিতে পারি নাই। আমি তাহার নিকট চিরবাধিত রহিয়াছি, এ জন্মে যে কখন তাহার ঋণ পরিশোধিতে পারিব তাহার আশাও নাই। কি সম্পদে, কি বিপদে, অনু আমাকে কখন ছাড়ে নাই। আমার কষ্টের সময় তাহাকে অধিক কিছু বলি নাই, কিন্তু সে আমার জন্য তাহার যথাসাধ্য কোন কাজ সাধিতে কখন ত্রুটি করে নাই। লোকটী আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত, কিন্তু মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেও আমার যন্ত্রণা জানাইয়া তাহার হৃদয়ে পীড়া দিতে আমি ইচ্ছুক নই। আমার অনেক কষ্ট তাহার নিকট হতে গোপনে রাখিয়াছি, সে দোষে আমি দোষী, কিন্তু আমার জন্য পরপ্রাণে ব্যথা দিতে আমার মন কখন অগ্রসর হয় না।

অনৃতের সঙ্গে বসিয়া দেশ বিদেশ সম্বন্ধে নানা আলাপ করিতাম, দুজনে মিলিয়া কত দেশভক্তির গান গাহিতাম, কখন বা নিজের মনের দুঃখ কিছু কিছু তাহার কাছে প্রকাশিতাম। যখন আমি বিষন্ন থাকিতাম সে আমাকে প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা পাইত; যখন সে ক্ষুণ্ন হত, আমি

তাহাকে প্রসন্ন করিতে উদ্‌যুক্ত থাকিতাম। অনু অন্য কাজে ব্যাপৃত ছিল, বিদ্যালয় ত্যজিয়া তাহার পিতার কর্ম্মে তাহাকে যোগ দিতে হইয়াছিল, এজন্য বই পড়িবার বা অন্য বিষয় চিন্তিবার তাহার সময় থাকিত না। আমি কখন কখন তাহার নিকটে আমার প্রিয় পাঠ্য বস্তু ইতিহাস পড়িয়া শুনাতাম; দেখিতাম আমার মনে যে সকল ভাবের উদয় হত, তাহারও অন্তরে প্রায় সেই সকল ভাব উপজিত। কিন্তু তাহার সময়ের অভাবে ঐ সকল বিষয় লইয়া তাহার সঙ্গে অধিক কথাবার্ত্তা করিতে পারিতাম না।

কত সপ্তাহ ঐ প্রকারে কাটিল, জগদম্বা তথনও বাপের বাড়ীতে; নানা প্রকার ইতিহাসের বই পড়িয়া আমার উষ্ণ প্রকৃতিকে শান্ত রাখিতাম। ভারতবর্ষের কথা পড়িয়া যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হতাম বা যখন উহার অবনত অবস্থার আলোচনায় মন অতিশয় বিষন্ন ভাব ধরিত, তখন নিজ দেশ পরিহরিয়া অন্য দেশের ইতিবৃত্ত পাঠে নিজের ধীরতা ও বিম্লনতা সম্পাদনে চেষ্টা পেতাম। পুরাণ দেশের মধ্যে মিসর, গ্রীস ও রোমের ইতিহাসে আমি অধিক আস্থা লইতাম। মিসর আর ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পুরাকালে ভারতবর্ষে যেমন সিন্ধু নদীর তীরে প্রথম সভ্যতার আবাস, মিসরে নীল নদীর তীর সেইরূপ সভ্যতার প্রথম আশ্রয় ছিল। হিন্দুদের মধ্যে যাজক ও সৈনিকদের অধিক প্রভুত্ব ছিল, মিসরীদের মধ্যেও প্রথমে যাজকদের একাধিপত্য ছিল, পরে সৈনিকেরা তাহা নিজায়ত্ত করিয়া লইল। সমাজবন্ধন, আচার ব্যবহার, কুসংস্কার, ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুদের ও মিসরীদের অনেকাংশে সমতুল্যতা দেখিলে অতিশয় বিস্মিত হতে হয়। দুই জাতির স্বভাবে ও চরিত্রে অনেক বিষয়ে স্পষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

মিসরীদের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি উত্তমরূপে পর্য্যালোচিলে, এক কালে

তাহাদের দেশ কেমন ধনী ও সমৃদ্ধ, আর কি কারণে তাহাদের ঐরূপ উন্নত অবস্থা ছিল, তাহা অবধারণ করিতে পারি। যে পর্য্যন্ত তাহারা বিদেশীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই তত কাল তাহাদের দেশ অপ্রতিহত সুখাবস্থায় ছিল। বড় পিরামিডের নির্ম্মাণ কাল থেকে পারসীকদের আক্রমণ পর্য্যন্ত প্রায় তিন হাজার বৎসর মিসরে এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক বসতি ছিল, আর তখনকার সঙ্কীর্ণ দেশের পক্ষেও সে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বোধ হয় নাই। আসিরীয় ও পারসীকদের সঙ্গে বহুকালব্যাপী, ভীষণ ও সর্ব্বনাশক সংগ্রামে মিসরীদের সম্পদের মূলে বিষম ঘা লাগিল। অনেক কাল উর্ব্বরা ভূমিতে সুখাবস্থায় বাস করিয়া তাহাদের অন্তরে যে কোমলতা জন্মিয়াছিল, ঐ কালে সে কোমলতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। বিপক্ষদের বলবিক্রমে বিধ্বস্ত হইয়া মিসরীরা চিরকালের জন্য বিলুপ্তপ্রায় হল। গ্রীস থেকে মাসিডোনীয়েরা আসিয়া অনায়াসে মিসর অধিকার করিল, তাহাদের পরে উহা রোমীয়দের বশ্যতা পাইল। রোমীয়দের অধিকার কালে নানা রাজকীয় কারণে দেশটা ছারখার হইয়া গেল ও লোকসংখ্যা অনেক কমিয়া আসিল; রোমীয়দের পরে মুসলমানেরা মিসরদেশকে নিজায়ত্ত করিল; তাহাদের সময়ে উহার বিলক্ষণ অবনতি ঘটিল। ফাতিমাদের রাজত্বকালে কয়েক দিনের নিমিত্ত মিসর দেশের শ্রী ফিরিয়াছিল, আবার যখন উহা তুর্কিদের হাতে গেল, চারদিকে কেবল নিয়মিত অত্যাচার ও কুশাসন লক্ষিত হল। নেপোলিয়ন অতি কম সৈন্যের সাহায্যে, অল্প প্রয়াসে সেই সময়কার মিসরের শাসকদের হারাইয়া দিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দতে মিসর বরাবর তুর্কিদের অতিরিক্ত করগ্রহণ, বল পূর্ব্বক লোক নিয়োগ ও অনাবশ্যকীয় যুদ্ধে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছে। আজকাল মিসর ভিন্ন ভিন্ন

ইউরোপীয় জাতিদের লোভের সামগ্রী হইয়াছে। ইউরোপীয়েরাই এখন মিসর দেশে সর্ব্বেসর্ব্বা।

প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতা প্রায় সমস্তই আসিয়া কিম্বা মিসর হতে আসিয়াছিল। কিন্তু গ্রীকদের চরিত্রে অধিক তেজ ও কঠিনতা, তাহাদের অন্তরে অধিক উদারতা ও মহানুভবতা ছিল। দেশভক্তি কাহাকে বলে, প্রাচীন গ্রীকেরা তাহার চূড়ান্ত উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছে। গ্রীকদের মধ্যেই দেশভক্তি প্রথম সঞ্চার হয়। নিজদেশের জন্য প্রাণ দেওয়া গ্রীকেরাই প্রথম শিখাইয়াছিল। শিল্পকর্ম্মে তাহারা অদ্বিতীয় ছিল; ইউরোপে তাহারাই সভ্যতার প্রথম প্রবর্ত্তক। কিন্তু আন্তরিক বিবাদে ও নানা কারণে গ্রীসীয়দের অবনতি হতে লাগিল; অবশেষে রোমীয়েরা গ্রীস অধিকার করিল। রোমীয়দের পর ইউরোপের শিক্ষয়িত্রী গ্রীস, বিজাতীয়, বিধর্ম্মীদের উৎপীড়নে অনেক শতাব্দ মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। এককালে গ্রীস যেমন সভ্য ছিল, ক্রমে সেইরূপ অসভ্য অবস্থায় আসিল; কেহই ভাবে নাই যে, সে গ্রীস ইহকালে আবার উদ্ধার পাবে। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে উহা আবার মাথা তুলিল, গ্রীস আবার স্বতন্ত্রতা লভিল।

রোমের ইতিহাস কি বিচিত্র! কি সামান্য অবস্থা থেকে কি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। রোম গ্রীসের নিকট সভ্যতা শিখিয়া সমস্ত ইউরোপে তাহার বিস্তার করে। বিখ্যাত রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন অতি অদ্ভুত ব্যাপার, মানুষের ইতিহাস উহাতে যেমন শিখা যায়, আর কিছুতেই সে প্রকার শিখা যায় না। টুইড নদী হতে নীল নদী পর্য্যন্ত যে মহাসাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, তাহা জনকতক বর্ব্বর সৈন্য নিলামে চড়াইয়া দিল। ইহার অপেক্ষা বিচিত্র বিষয় আর কি আছে? বিলাস ও অলসতায় যখন রোমীয়দের মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইয়া আসিল,

তখন সাম্রাজ্যে কি বিশৃঙ্খলা ঘটিল! আবার একবার যখন ধ্বসিতে আরম্ভিল, ঐ মহাবিস্তৃত ও দিগ্বিজয়ী রাজ্য অতি অল্প কাল মধ্যে অসভ্য জাতিদের দ্বারা সমূলে নির্ম্মূলিত হল। যে রোমের নামে সমস্ত জগৎ কাঁপিত, যে রোমের সভ্যতা ও সুশাসনে সকলেই এককালে স্তম্ভিত থাকিত, পরে তাহার কি দুর্গতি ঘটিল! এক ইটালি দশ বারটা ছোট রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল, বিদেশীয়েরা আসিয়া সেখানে আধিপত্য স্থাপিল। অনেক শতাব্দ ঐ প্রকারে পরের বশে থাকিয়া কিম্বা নিজেদের মধ্যে কলহ করিয়া ইটালীয়েরা সদ্‌গুণ সকল হারাইয়াছিল। কিন্তু সে ইটালি আবার বর্ত্তমান শতাব্দতে এক হল, সে ইটালি আবার স্বাধীনতা লভিল; সে ইটালি আবার অন্য ইউরোপীয় জাতিদের দ্বারা সম্মানিত ও সমাদৃত হইতেছে।

আধুনিক ইতিহাসের মধ্যে ইংলণ্ডের ইতিবৃত্তই অধিক পড়িতাম। ইংলণ্ডের ইতিহাস স্বাধীনতার ইতিহাস, এই জন্য বোধ হয় উহাতে আমার মন অধিক আকৃষ্ট হত। উহার প্রতি অধ্যায়েই ইংরেজরা কিরূপে স্বাধীনতা পাইল, তাহা বর্ণিত আছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা উহারা বিনা কষ্টে, বিনা আয়াসে কখন পায় নাই। প্রথমে সম্ভ্রান্ত লোকেরা অনেক যুদ্ধ ও গোলযোগের পর রাজার একাধিপত্য হরিল, তাহার পর সাধারণ লোকেরা অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর সে রাজ-ক্ষমতা নিজায়ত্ত করিল। কিন্তু আবার বলিতেছি, প্রতি পদেই অনেক হাঙ্গামা, অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়াছিল। বিনা উৎসাহে, বিনা কষ্টে, বিনা রক্তপাতে কেহই এ পৃথিবীতে স্বাধীনতা লভে নাই। ইতিহাসের প্রতি অক্ষরে ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় অতি সামান্য অবস্থা থেকে ইংলণ্ডের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এক সামান্য ছোট দ্বীপের অতি অল্প সংখ্যক বাসীরা পৃথিবীর চারদিকে

সাম্রাজ্য স্থাপিয়াছে, ইহা কি কম কর্ম্মিষ্ঠতার—কম বলিষ্ঠতার কাজ; আর ইহাতে কি কম গৌরব! কি গুণে কি কারণে ইংরেজরা অতি হীন অসভ্য অবস্থা থেকে এত বড়, এত সভ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরা কেবল ইতিহাসেই তাহার শিক্ষা পাই।

পোলণ্ড নামে এখন আর ভিন্ন দেশ নাই, এককালে সে পোলণ্ড কত বড় ও কত ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। পোলদের তেজ, বীরতা ও দেশভক্তি জগদ্বিখ্যাত; ভীষণ মুসলমানেরা যখন সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, পোলেরাই প্রথম তাহাদের গতিরোধ করে। কিন্তু তাহাদের বিপদকালে কেহই তাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হল না। দেশগৃধ্নু রুসেরা পোলণ্ডের উৎসেধ সাধিল। কিন্তু বাহিরের শত্রু অপেক্ষা ভিতরের শত্রু ঐ দেশের অধিক অপকার করিয়াছিল। দলা-দলি ও বিশ্বাসঘাতে দেশটা একেবারে অবসন্ন হইয়াছিল, এমন সময়ে তিন দিক হতে তিন দুর্দ্দান্ত রাক্ষস আসিয়া পোলণ্ডকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। এখন মানচিত্রে পোলণ্ডের চিহ্নমাত্রও নাই। পোলণ্ডের ইতিহাস পাঠে আমি মর্ম্মান্তিক বেদনা পেতাম। বিখ্যাত দেশভক্ত বীর কোসি-য়স্কো যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজের হাত থেকে তরওয়াল ফেলিয়া দিয়া চীৎকারস্বরে বলিলেন—পোলণ্ড! এই তোমার শেষ—সে কথা চিরকাল আমার হৃদয়ে বাজিতেছে।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্সের স্বাধীনতা লাভের বৃত্তান্ত কি চমৎকার! অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ দেশের কি আশ্চর্য্য উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। একশ বৎসরের মধ্যে উহার লোক সংখ্যা চল্লিশ লাখ থেকে প্রায় চার কোটী দাঁড়াইয়াছে, আর উহার ধন ও সমৃদ্ধি দিন দিন কত শীঘ্র যে বাড়িতেছে, তাহা বর্ণনার অসাধ্য। স্বাধীনতার কি সঞ্জীবনী শক্তি! দেখিলে বোধ হয় যেন ইংরেজদের সমস্ত ভাল

গুণগুলি গিয়া আমেরিকায় বাস করিতেছে। পৃথিবীতে অন্য কোন দেশের অত দ্রুত উন্নতি ঘটে নাই।

সমস্ত ইতিহাসে ফরাসীদের রাজবিপ্লবের ন্যায় অদ্ভুত ও অনুপম ঘটনা আর কিছুই নাই। ফরাসীদের সহসা মনের উত্তেজনা, হৃদয়ের সমুচ্ছ্বাস দেখিয়া বাক্‌শূন্য হতে হয়। বহুকালের গভীর নিদ্রা থেকে যেন অকস্মাৎ উহারা জাগিয়া উঠিল। পনর শ বৎসরের ব্যভিচার, উৎপীড়ন, ও স্বেচ্ছাচার উহারা পনর দিনে দূর করিল। যখন অন্য সকল ইউরোপীয় জাতিরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিল, তখন উহারা বলিল—আমরা আড়াই কোটী লোক, আড়াই কোটী লোকে কি না করিতে পারে?—ঘরে শত্রু, বাহিরে শত্রু, চারদিকে শত্রু, তথাপি উহারা বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া একাকী সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। ইহার অপেক্ষা অধিক তেজের বিষয় আর কোথায়? নিজেদের স্বতন্ত্রতা বাঁচাতে, প্রত্যেকে নিজদেশের জন্য প্রাণ দিতে ক্ষণমাত্রও কুণ্ঠিত হল না। যে জাতিরা সগর্ব্বে ফরাসীদের নূতন তেজকে ধিক্কার করিয়াছিল, যাহারা সদর্পে বলিয়াছিল যে, তিন মাসের মধ্যে ফরাসীদের রাজবিপ্লব ঘুচাবে, তাহারা অবশেষে প্রায় সকলেই একে একে ফরাসীদের দ্বারা পরাজিত হল, আর অতি বিনীতভাবে তাহাদের নিকট সন্ধি মাগিল। একা ফরাসি, (একাও নয়, উহার ভিতরকার শত্রুর সংখ্যা অনেক ছিল) আর সমস্ত ইউরোপ তাহার বিপক্ষে, সেই একা ফরাসী সমস্ত ইউরোপের উপর বিজয়ী!

ঐ রাজবিপ্লবের সময় কত অসামান্য ও কত জঘন্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। চার দিকে যেমন জাজ্বল্যমান বিজয় দ্বারা ফরাসীরা সকলের মনে থরহরিকম্প জন্মাইয়া দিল, ফ্রান্স সেইরূপ বীভৎস রক্তস্রোতে প্লাবিত হইল। যে স্বাধীনতার জন্য ফরাসীরা অত লালায়িত হইয়াছিল,

সে স্বাধীনতার নামে কত লোকের হত্যা ঘটিল, কত কত পরিবার সমূলে ধরাশায়ী হল। অবশেষে, নানা রকম আতস বাজীর মধ্যে হাউইয়ের মত, বোনাপার্টের জ্যোতি দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া রহিল, কিন্তু গৌরব ও স্বতন্ত্রতা এক সামগ্রী নয়। ফরাসীরা যে স্বতন্ত্রতা অত ক্লেশে লভিল, যে স্বতন্ত্রতার তেজ চার দিকে বিক্ষেপিল, পরে সে স্বতন্ত্রতা সব একজন অলোকসামান্য বীরের হাতে অর্পিল। ফরাসী রাজবিপ্লবের কথা সবই অলৌকিক, কিন্তু একটী কথা আমার মনে বার বার ধ্বনিতেছে। যখন ফরাসী সেনাপতি ডুমুরিয়ে রাজাদের সৈন্যদলকে প্রথম বিধ্বসিয়া পারিসে ফিরিয়া আসেন, বিখ্যাত জাকোবিন্ সভার একজন প্রধান সভ্য তাঁহাকে এই ভাবে উদ্দেশিল,— ডুমুরিয়ে, তুমি কর্ত্তব্য পালিয়াছ, উহাতেই তোমার বেশ পুরস্কার হইয়াছে; বীর সেনাপতি বলিয়া তোমাকে প্রশংসিতেছি না; তুমি একজন ফরাসী সৈন্য, ফ্রান্সের রক্ষক, তাহাতেই তোমার গৌরব। বল দেখি, সাধারণ-তন্ত্রের সৈন্য শাসন করা কি চমৎকার; ঐ সৈন্য আর অত্যাচারীর সৈন্যে কত প্রভেদ? ফরাসীদের কেবল সাহস আছে, তাহা নয়; তাহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ বুঝিয়া ক্ষান্ত হয় না, কারণ কে মৃত্যুকে ভয় করে? কিন্তু ঐ যে লিল ও থিয়ভিল নগরের অধিবাসীরা লাল গোলার বৃষ্টির মধ্যেও একবার টলিতেছে না, প্রকাণ্ড গোলার ছটক ও নিজেদের বাড়ীর ধ্বংসের মধ্যেও তাহারা যে নিশ্চল, নিষ্কম্প রহিয়াছে, উহাতেই কি সমস্ত গুণের পরাকাষ্ঠা হয় নাই? হাঁ ঐ গুণ—সকল বিজয়, সকল উল্লাস অপেক্ষা শ্রেয়। যত দিন স্বাধীন প্রাণে নিজের রক্ষায় ধাবিবে, ততদিন অত্যাচারীরা কিছুই করিতে পারিবে না। আমাদের অনেক জাত ভাই স্বাধীনতার জন্য মরিয়াছে—তাহারা মরিয়াছে, কিন্তু তাহারা আমাদের স্মরণে জীবিত আছে। তাহাদের দৃষ্টান্ত চিরকাল আমাদের হৃদয়ে জীবিত থাকিবে।

যাহাদের হাতে ফরাসীরা হত হইয়াছিল, তাহারাই কি বাঁচিয়া আছে? না—তাহাদের দলগুলা রণভূমিতে শবের রাশি হইয়া রহিয়াছে, স্বাধীনতা-সূর্য্যও উহাদের পূতিগন্ধ নিবারিতে পারে না।

ডুমুরিয়ে, মনে থাকে যেন একজন রাজা নয়, তোমার সমনাগরিকেরা তোমাকে সেনাপতি বলিয়া ডাকিতেছে। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, পুরাকালে যখন থেমিষ্টক্লিস্ সালামিসের রণে নিজ দেশকে বাঁচায়, তাহার সমনাগরিকেরা তাহার নামে মিথ্যা অপবাদ রটিয়াছিল; ঐ মিথ্যা অপবাদে তাহার অন্যায় সাজা হয়। থেমিষ্টক্লিস বিপক্ষদলের কাছে আশ্রয় লইল, কিন্তু সে তথাপি থেমিষ্টক্লিস্ই রহিল। লোকে যখন তাহাকে নিজদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে প্রস্তাবিল,—আমার অসি কখন অত্যাচারীদের সেবা করিবে না—এই বলিয়া থেমিষ্টক্লিস্ সেই অসি নিজ বুকে বসাইল!

নবম অধ্যায়।

শ্বশুর বাড়ী।

এখন আমার জীবনের অতি সুখময় কালের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ঐ সময়ের দ্রুতগামী কিন্তু সুমিষ্ট মুহূর্ত্তগুলি, আমি যে সজীব, সে জ্ঞান আমার মনে জন্মাইয়া দিয়াছিল। শ্বাস ফেলিলেই বাঁচিয়া থাকা হয় না; কাজ করাকে, যাহা দ্বারা আমাদের অস্তিত্বের জ্ঞান পাই, সেই সকল শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের চালনাকেই আমি বাঁচিয়া থাকা বলি। যে বেশী বৎসর গুণিয়াছে, সে বেশী দীর্ঘায়ু নয়; যে জীবন অধিক ভোগ করিয়াছে, সেই যথার্থ বহুদিনজীবী।—আঃ সুখময়, অমূল্য মুহূর্ত্তগণ! আমার জন্য আবার তোমাদের সুখময় গতি আরম্ভ কর; যদি সাধ্য হয় ত, যথার্থ যত দ্রুতবেগে চলিয়া গিয়াছিলে, তার অপেক্ষা ধীর গতিতে আমার স্মরণপথে উপস্থিত হও। এস, তোমাদের মনে ধরিয়া আবার সেই যৌবনকালের সুখ অনুভবি।—আমার ইচ্ছা যে ঐ কালের সরল ও হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা যথাসাধ্য দীর্ঘ করিয়া লিখি, সেই সকল কথা ক্রমাগত ফিরে বলি। কিন্তু সেগুলি যদি বাস্তব ঘটনা, কার্য্য বা বাক্য হত, তা হলেও কোন প্রকারে বর্ণিতে পারিতাম; কিন্তু যা ঘটে নাই, কাজে করি নাই বা কথায় বলি নাই—যেগুলি কেবল নিজ অন্তরে অনুভবিয়াছি, সে সব কিরূপেই বা প্রকাশিব?

ঐ সময়ে আমার মানসিক ও আন্তরিক বৃত্তিগুলি প্রায় পূর্ণ অবস্থা পাইয়াছিল। আমার বয়স তখন একুশ বৎসর, আমার শরীর সুস্থ ও

সবল। কোন দিকে আমার কষ্টের কারণ ছিল না। পিতামাতা সম্পূর্ণ কুশলে ছিলেন, অন্য আত্মীয়জনদেরও সংবাদ ভাল। আমার স্ত্রী কাজলায় থাকিলেও, পূর্ব্বের ন্যায় তাহার জন্য তেমন কাতর হতাম না; কেননা প্রেমের বাঁধ একবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আর তাহার সঙ্গে প্রায় চিঠী লেখালেখি চলিত। আমার নূতন বন্ধুর আলাপসুখ ভুগিতেছিলাম। আমি একমনে যথেচ্ছা বই পড়িতাম; অন্য স্থানে অভাব হলে বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে আমার পাঠতৃষ্ণা মিটাতাম। পড়িতে পড়িতে আমার মনে কত নূতন ভাব উঠিত, সকল বস্তুই যেন বেশী উজ্জ্বলভাবে দেখিতাম। আমি কখনই অলস, জীবনশূন্য থাকিতাম না। বই পড়িয়া ক্লান্তি বোধ করিলে নানা প্রকার সংকল্প রচিতাম। একটা না একটা চিন্তা সর্ব্বদা আমার মনে বিরাজিত; একটা না একটা বিষয় নিরন্তর আমাকে ব্যাপিয়া থাকিত। সকল চিন্তায় ও সকল কর্ম্মে আমার সমস্ত হৃদয় অর্পিতাম, সকল বিষয়েই অতি প্রবল অনুরাগ ও উৎসাহের সঙ্গে ধাবিতাম।

ঐ সময়ে আমার অন্তরে যৌবন, আবার বাহিরে যৌবন। শীতকাল গিয়া তখন বসন্তকাল উপস্থিত। সমস্ত প্রকৃতি প্রফুল্ল বদন ধরিয়াছিল। লোকে বলে বিপদ যখন আসে, তখন একেবারে হুড়্‌হুড়িয়া আসে, আমার বোধ হয় সম্পদও একেবারে দলে দলে আসে। তাহা না হলে ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুখের সময়ে মা আমার শ্বশুরবাড়ী কাজলায় যাবার কথা তুলিলেন কেন? একে স্বভাব দেখিতে আমি চিরকাল অত্যন্ত ভালবাসি, তাহাতে আবার আমার জগদম্বা সেখানে বিরাজমান। মার ঐ প্রস্তাব উল্লেখের আগেই আমার মন উহাতে সম্পূর্ণ সম্মত ছিল। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। কাজলায় যাবার দিনের অপেক্ষায় ও কাজলানীর আলোচনায় মগ্ন থাকিলাম। অবশেষে সমস্ত নির্দ্ধারিত

হলে একজন লোক সঙ্গে করিয়া আমি নির্ণীত দিনে কাজলার অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

কলিকাতা ছাড়িবার পর আমার কাছে সকলই রমণীয় বোধ হতে লাগিল। মন যখন ভাল থাকে, তখন কি না ভাল লাগে? জগদম্বাকে প্রায় আট মাস দেখি নাই, মহা আগ্রহের সঙ্গে তাহার দর্শনসুখ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। মিলনের পূর্ব্বেই তাহার সঙ্গে একত্র বাসের সুখ মনে অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে উন্মত্ততা তখন ছাড়িয়া গিয়াছিল। আমার মন তখন ধীর ও শান্ত ছিল। পথের দৃশ্যগুলি আমার চোক আকর্ষিল; গাছ, মাঠ, পুকুর, নদীর প্রতি আমার মন ধাবিল; আমি স্বাভাবিক শোভার আলোচনায় নিমগ্ন রহিলাম। ভ্রমন্ত জীবন আমার সুখের জীবন। ভাল কালে ও ভাল দেশে, নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে যাত্রা, আর যে যাত্রার পরিণাম আমার মনোমত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার অপেক্ষা আমার অধিক আনন্দময় জীবন আর কি আছে?

অতি ভোরের বেলা আমি কাজলার নিকট উপস্থিত হলাম। গ্রামের চারদিকে শস্যভরা ক্ষেত, অল্প অল্প বাতাস বহিয়া শস্যরাশির উপর ঢেউ খেলাইতেছে; আশ পাশে বড় বড় গাছ, তাহাদের উপর নানারকম পাখী বসিয়া অবাধে গাইতেছে। মাঠের ধারে ধারে কত ফুল ফুটিয়াছে; কোথাও বা সিমুল, কোথাও বা ভুঁইচাঁপা, এখানে অনেক-পলাস, সেখানে রাশি রাশি আকন্দ; বসন্ত তাহাদের রূপের শোভা বিস্তারিয়া মন মোহিতেছে। তাহাতে আবার অরুণকিরণ পড়িয়া অতি মনোহর, অনুপম সৌন্দর্য্য ধরিয়াছে। প্রাতঃকালের বাতাস সুস্নিগ্ধ, সুগন্ধময়, মাদকতুল্য; পাখীদের কূজন সুমধুর, সুশ্রাব্য, স্বর্গীয় বাদ্যতুল্য। বুলবুলের মধুর ধ্বনি, কোকিলের কুহু কুহু রব, ডাহুকের ডাহা ডাহা ডাকে আমার কান ভরিয়া গেল। বট, অশ্বত্থ তমাল প্রভৃতি বড় বড়

গাছের ডালে বসিয়া দৈয়াল, পাপিয়া, চাতক আদি পাখীরা পরম আনন্দে পরস্পর কথাবার্ত্তা করিতেছে বা প্রকৃতিকে সম্ভাষিতেছে। সমস্ত প্রকৃতিতে বসন্তের চিহ্ন, মাঠের মাটী থেকে নীল আকাশ পর্য্যন্ত সকলেই বসন্ত রসে টলমল করিতেছে। যত গ্রামের নিকটবর্ত্তী হলাম, তত মনোহর বাগান দেখিতে পেলাম। বাগানে মল্লিকা মালতী, জুঁই জাঁতী, বেল, বকুল, ঝুমকালতা, অপরাজিতা ফুটিয়া চারদিক আলো করিতেছে, তাহাদের মধ্যে চাঁপা আর গোলাপ সকলের উপর টেক্কা দিতেছে। ওদিকে আম, কাঁটাল, নিচু, জামরুল প্রভৃতি ফলের গাছে নূতন ফল গজাইতেছে। দূরে দুই একটী জলভরা পুকুর, মৃদুমন্দ বাতাস ভরে ঈষৎ চঞ্চল। সকলই মনোরম, তৃপ্তিকর, আনন্দদায়ী। তখনও লোকজন উঠে নাই, গরু ছাগলের শব্দ তখনও শুনা যায় নাই।

প্রকৃতির এই কমনীয় কান্তি আলোচিতে আলোচিতে আমরা গ্রামের ভিতর পৌঁছিলাম। দূর থেকে অতি অল্প বাড়ী দেখিতে পাইতেছিলাম; ভাবিলাম, এ কি জনশূন্য স্থানে আসিয়া পড়িলাম, কিন্তু গ্রামে প্রবেশিয়া আমার সে ভ্রম দূর হল। দেখিলাম যে, উহা একেবারে নির্জ্জন নয়, বড় বড় কোটা বাড়ী ও কুঠী অনেকগুলা আছে, আর ছোট ছোট মাটীর ঘর, খড়ের চালা গ্রামের চারদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ক্রমে আমরা লোকজনের শব্দ শুনিতে পেলাম, কিছুক্ষণ পরে শ্বশুরবাড়ীতে উঠিলাম।

মনে করিয়াছিলাম যে, বরাবর নিজেকে ধীর রাখিব, কিন্তু জগদম্বাকে দেখিবার লালসায় আমার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। আট মাসের প্রাণের কথা সব এক মুহূর্ত্তে প্রকাশিতে ইচ্ছা গেল। রাত্রি ভিন্ন সে ইচ্ছা পূরাইবার অবসর পাইলাম না। দিনের বেলা আমাকে স্ত্রীর সম্পর্কীয় লোকেরা মৌমাছির মত ঘিরিয়া থাকিত; আর শুধু বাড়ীর লোক নয়,

যেন সমস্ত গ্রাম ভাঙ্গিয়া যত স্ত্রীলোক আমাকে এক অপরূপ জন্তুভাবে অতি ঔৎসুক্যের সঙ্গে দেখিতে লাগিল। আমি কলিকাতার লোক, আমার নিকটে এ অতি বিচিত্র বোধ হল। ভাবিলাম, আমি শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছি, আমি ত একটা চিড়িয়াখানার জানোয়ার নই। কালে বুঝিলাম যে আমি সুধু শ্বশুরের জামাই নই, আমি সমস্ত গ্রামের জামাই, সকল গ্রামবাসীর আদরের সামগ্রী, সমস্ত লোকের নিমন্ত্রিত ব্যক্তি। শ্যালী, শ্যালাজেরা আমার সঙ্গে নানাপ্রকার ঠাট্টা কৌতুক করিত। আমি রহস্য ব্যবসায় কখন পারদর্শী নই, আর আমি স্বভাবত লাজুক, তাহাতে দিনরাত্রি রাশি রাশি বিচিত্র লোক,—আমি উঠিতেছি বসিতেছি, আমার দিকে এক ভাবে তাকাইতেছে—দেখিয়া আমি বাক্‌শূন্য হইয়া গেলাম। তাহারা কখন ভাবিত, আমি একটা বোকা, কখন বা ঠিক করিত, আমি একটা গোবেচারী ভালমানুষ, ঠাট্টার মর্ম্ম আদবেই জানি না; কিন্তু আমি তাহাদের তুক্‌তাক্ সবই বুঝিতাম, কেবল কোন উত্তরাদি করিতাম না, তাহাদের যাহা ইচ্ছা ভাবিতে দিতাম।

প্রথম দিনকতক আমি আদবে বিশ্রাম পাই নাই। নিমন্ত্রণের উপর নিমন্ত্রণ, রোজ পাঁচ ছয় বাড়ী আমার আহারের জন্য অভ্যর্থনা হত। কিন্তু আমি একলা মানুষ, আর এ সব বিষয়ে আমার পাঠ ছিল না, আমি কয়েক দিনের পর অতিশয় জ্বালাতন হইয়া গেলাম। আমার বিরক্তি কর্ত্তৃপক্ষদেরও ঈষৎ জানালাম, আর গ্রামীরাও আমার দর্শনে কিছু ক্ষান্ত হইয়া আসিল। ক্রমে আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম ও দুই এক দণ্ড স্থিরভাবে জগদম্বার সঙ্গে কথা কহিবার অবসর পেলাম। আমার মনের স্ফূর্ত্তি আবার ফিরিয়া আসিল।

একদিন শ্যালী শ্যালাজদের কথাবার্ত্তায় ত্যক্ত হইয়া জগদম্বার ঘরে গেলাম। তাহার ঘরের দরজা আধ-ভেজান ছিল; যাহাতে লোকের

না পায়, এমনভাবে অতি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিলাম। সে জানালার নিকট বসিয়া দরজার উল্টা দিকে দিয়ালের পানে মুখ করিয়া সেলাই করিতেছিল; আমি যে ঘরে আসিয়াছি, তাহা সে কিছুই জানিতে পারিল না। ঐ দিনে তাহার পোষাক অতি পরিপাটী ছিল আর তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটা নূতন মনোহারিতা দেখিতে পেলাম। তাহার লাবণ্য দেখিয়া আমি একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। আমাতে আবার হুঁতোরামের নেষা চড়িয়া গেল। আমি নিঃশব্দে মেজের উপর হাঁটু পাতিয়া বসিলাম আর তাহার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া জোড় করিয়া থাকিলাম। মনে ঠিক জানিলাম যে, জগদম্বা আমার সাড়া পায় নাই; একবারও ভাবি নাই যে, সে কখন আমার কীর্ত্তি দেখিতে পাবে। কিন্তু সেই দরজার উল্টাদিকের দিয়ালে এক বিশ্বাসঘাতক আর্শী ঝুলিতেছিল, উহা আমার সমস্ত বিদ্যা জগদম্বাকে জানাইয়া দিল। আমার ঐ ভাব দেখিয়া তাহার মনে কি হল জানি না, কিন্তু আমার ঐখানেই শেষ; আমার নড়নচড়নশক্তি বন্ধ হল, মুখ দিয়া একটাও কথা বেরুল না, তাহার দিকে চোক তুলিতে পর্য্যন্তও পারিলাম না। কয়েক মুহূর্ত্ত বোবা জড়ের মত ঐ হাঁটুগাড়া অবস্থাতেই রহিলাম। অবশেষে জগদম্বা হাসিয়া আমার দিকে আসিলে আমার ধড়ে প্রাণ আসিল, আমি মুখ মুছিতে মুছিতে তাহার কাছে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। একথাটী জগদম্বা কখন ভুলে নাই; যখনই আমাদের মানসিক অবস্থা একটু ভাল থাকে, সে আমার ঐ কীর্ত্তির নকল করে আর আমি এই বুড়া বয়সে লজ্জায় মরিয়া যাই।

বাড়ীর ভিতর থাকিয়া বিরক্তি জন্মিলে আমি বাড়ীর বাহিরে বাগানে ও পুকুরধারে বেড়াতাম। গাছে নূতন ফুল ফুটিতেছে দেখিয়া আমার যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হত তাহা বলিতে পারি না। বসন্তের বাহারে

আমি স্বর্গের সুখ অনুভবিতাম! আবার যখন কোকিলের মধুমাখা কুহু কুহু স্বর আমার কান স্পর্শিত, আমি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া এক বিচিত্র মোহে জড়ীভূত হতাম। ভাবিতাম, আবার যেন আমার বাল্যকাল উপস্থিত, আবার যেন আমি নবজীবন পেলাম, আবার যেন সেই নির্ম্মল কোমল হৃদয় আমাতে বিরাজমান। শিশুকালে ভূতো ও আমি যেরূপ বাল্য ক্রীড়ায় নিমগ্ন থাকিতাম, আবার সেইরূপ খেলা ধূলায় আমার অন্তর ধাবিল। বাগানে এ গাছটা, সে গাছটা দেখিয়া বেড়াতাম, এ ফুল থেকে সে ফুল শুঁকিতাম, এধার থেকে ওধার ঘুরিতাম। কখন মাটী খুঁড়িতাম, কিন্তু বার কতক কোদালের ঘার পর আমি ক্লান্ত হইতাম, দর্‌দরে আমার ঘাম ছুটিত, আমি আর পারিতাম না। কখনও বা, এক পায়রার ঘর ছিল, সেখানে গিয়া পায়রাদের কাছে বসিতাম। তাহাদের দেখিতে আমি এত ভালবাসিতাম যে, কখন কখন বিনা কষ্টে ক্রমাগত দুই তিন ঘণ্টা সেখানে কাটাতাম। পায়রারা বড় ভীরু, আর তাহাদের পোষ মানান বড় কঠিন, কিন্তু আমি তাহাদের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিলাম যে, তাহারা আমার পিছনে পিছনে চার দিকে ঘুরিত আর আমাকে অবাধে তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতে দিত। তাহাদের কাছে গেলেই তাহারা কেহ আমার বাহুর, কেহ আমার মাথার উপর বসিত, কাহাকেও বা আমি হাতের ভিতর লইতাম। আমি চিরকাল ছেলেদের ও জন্তুদের বড় ভালবাসি; তাহাদের অন্তর কি সরল, আর তাহাদের হাবভাব কি মনোহর!

বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামের ভিতরে কত বার বিচরিতাম। আমার বয়স ভুলিয়া গিয়া আবার সেই ছেলেবেলার মত বড় বড় গাছে উঠিতে যেতাম, দুই চার আছাড়ও খেতাম। একটী প্রকাণ্ড বট গাছ ছিল, চারদিকে তার বড় বড় ডাল, ডাল থেকে কত ছোট ডাল, তাদের

আবার অনেক ফেঁকড়ি, আর সব নূতন সবুজ পাতায় ঢাকা; ডালগুলা থেকে কত বড় বড় গুঁড়ি নামিয়াছে, কেহই ভাবিবে না যে, সে একটা গাছ। উহা দেখিয়া বোধ হল, যেন প্রকৃতি এক প্রকাণ্ড চাঁদোয়া খাটাইয়া যজ্ঞ করিতে বসিয়াছে, আমিও সেই বট গাছের তলায় বসিয়া প্রকৃতির মাহাত্ম্য আলোচিতাম। হায় সে সুখের দিন! সময়ে সময়ে কতবার আমি যৌবন কালের সুখময় কাল ধ্যান করি। সে মুহূর্ত্তগুলি কি মিষ্ট, কি বিরল, কি ক্ষণস্থায়ী; আর কি অল্প মূল্যে সে সুখ পেতাম।

এক দিন ভোরের বেলা এমন চমৎকার বোধ হইয়াছিল যে, আমি তাড়াতাড়ি পোষাক করিয়া সূর্য্য-উঠা দেখিবার জন্য গ্রামের বাহিরে চলিয়া গেলাম। এ ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ; সূর্য্য-উঠা ঐ সময়ে যত রমণীয় হতে পারে, তাহা ঐ দিনে হইয়াছিল; আমিও সে সুখ প্রাণ ভরিয়া অনুভবিলাম। পৃথিবী ফুল ও শস্যের অতি মনোহর আভরণে অলঙ্কৃতা; কোকিলেরা প্রাণভরে কূজিতেছে; যত পাখী সব মিলিয়া একতানে সম্ভাষণস্বরে বসন্তের আগমনী গাইতেছে;—সেরূপ দিন আমার জীবনে আর দেখিতে পাই না, সে বিচিত্র শোভা, কঠোর নগরের ভিতরে থাকিয়া কেহ দেখে না।

আবার এক দিন মাঠে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূর গিয়া পড়িলাম, মনের আনন্দে এদিক ওদিক বেড়াইয়া অবশেষে আমার পথ হারালাম। দুই তিন ঘণ্টা মিথ্যা ঘুরিবার পর, অতি ক্লান্ত আর তৃষ্ণা ও ক্ষুধায় একান্ত অবসন্ন হইয়া এক চাষার কুটীরে উপস্থিত হলাম। আমার সঙ্গে কিছু পয়সা ছিল, তাহাই তাহাকে দিতে চাহিলাম আর অতি নম্রভাবে কিছু আহার মাগিলাম। চাষা প্রথমে আমাকে যেন কি সন্দেহ করিল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে আমাকে এক ভাঁড় দুদ ও এক কুন্‌কে ধান মিশান খই দিল আর বলিল যে, তার ঘরে আর কিছু নাই।

আমি সে দুধ অতি আগ্রহের সঙ্গে পান করিলাম। সে খই, ধান, খোসা সবই অতি আদরে খেলাম। কিন্তু আমি একজন পথশ্রান্ত যুবা, উহাতে আমার তৃপ্তি হল না, আমি চাষাকে সব ভাঙ্গিয়া বলিলাম। সে আমার ভাব দেখিয়া ও খানিকক্ষণ ভাবিয়া নিশ্চয় করিল যে, আমি সত্যবাদী, আমি জমীদারের লোক নই। তখনি সে ঘর খুলিয়া ভিতর থেকে চমৎকার চিড়ামুড়কি, গাছে পাকা চাটিমকলা ও এক সরা দই (যাহা দেখিয়া আমার হৃদয় হর্ষে নাচিতে থাকিল) আনিয়া আমার সুমুখে কলাপাতে ঢালিয়া দিল। আমি প্রাণ ভরিয়া সে সব খেলাম ও তাহাকে অন্তরে যে কত ধন্যবাদ দিলাম, তাহা প্রকাশিতে অক্ষম। খাওয়া শেষ হলে তাহার নিকট আমার আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাহাকে আবার পয়সা দিতে চাহিলাম। চাষা পয়সা লইল না, বলিল, একজন পথহারা, শ্রান্ত, অকপট ব্যক্তিকে ঐ সামান্য খাদ্য দিয়াছে, তাহার কিছু দাম দিতে হবে না, আমি যে তৃপ্তি লভিয়াছি, উহাতেই তাহার যথেষ্ট পুরস্কার হইয়াছে। আমি তাহার সরলতা, নিঃস্বার্থতা ও সদাশয়তা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, যথার্থ দয়া মায়া ও সৌজন্য সামান্য গরীবদেরই অন্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বার্থ বা মিথ্যা অভি-মান তাহাদেরকে কখন কলুষিত করে না। আমি চাষাকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ দিলাম আর বলিলাম, তাহার আতিথ্য আমি এ জন্মে কখনও ভুলিব না। আমি চলিয়া আসিবার সময় সে বলিল যে, সে সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তাহার কারণ জমীদারের লোকেরা চাষাদের আহারাদি বিষয়ে স্বাচ্ছল্য দেখিলে বেশী খাজনা ও নজর লইয়া বড় উৎপীড়ন করে! তাহার কথা আমার হৃদয়ে লাগিল, ভাবিলাম, এমন সরল অমায়িক ব্যক্তিদের উপরে লোকে কিরূপে অত্যাচার করে। ঐ সময় থেকেই আমি বড় মানুষদের ও তাহাদের অনুচরবর্গের দুঃখী গরীব

লোকদের উপর অত্যাচারে যার পর নাই বিরক্ত ও ঘৃণাযুক্ত হইয়াছি। ঐ সকল ভাবিতে ভাবিতে আমি চাষার নিকট বিদায় লইলাম, তাহার একজন লোক কতকদূর আসিয়া আমাকে পথ দেখাইয়া দিল।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিলাম পাড়াগাঁর কৃষকজীবন কি সুন্দর, চাষাদের পরিশ্রম কি পরম আনন্দদায়ী ও উপকারক! সকলের অপেক্ষা তাহারা অধিক ফলদ কর্ম্মে নিরত থাকে। চাষই মানুষদের আদিম বৃত্তি, বিনা শস্য উৎপাদনে মানুষ কখন জীবিতে পারে না। চাষবাস ও ফসল দেখিয়া আমাদের মন কখনই অচেতন থাকে না। পাড়াগাঁর চাষী জীবনের সরলতায় একটা কি আছে যে, তাহাতে আমাদের হৃদয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। মাঠের উপর অনেক অনেক চাষা চষিতেছে ও গীত গাইতেছে; দূরে দল দল গরু ভেড়া চরিতেছে ও শুইয়া আছে; এদিকে ওদিকে রাশি রাশি শস্যের ফসল দাঁড়াইয়া আছে ও হাসিতেছে—এ সকল দেখিয়া কাহার মন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুগ্ধ না হয়? আবার প্রকৃতির মাহাত্ম্য আলোচিয়া অতি ক্রূর ব্যক্তিরও মন গলিয়া যায়, পাষাণ হৃদয়েরও অন্তর দ্রবীভূত হয়।

নগরের অধিকাংশ লোক পল্লিগ্রামকে ভালবাসিতে জানে না, তাহারা সেখানে থাকিতে চাহে না; সেখানে কি হইতেছে, তাহা পর্য্যন্তও খবর লয় না; নগরীরা চাষী-জীবনের পরিশ্রমকে ঘৃণা করে, উহার সুখে তাহাদের কোন অধিকার নাই। গল্প, গান বাজনা, খেলা, হাসি কৌতুক নগরবাসীদের সর্ব্বগ্রাস করিয়া থাকে। পাড়াগাঁয়ে গেলেও ঐ সকল তাহাদের মুখ্য কার্য্য হয়! যদি কখনও তাহারা মাছধরা বা শিকার করাতে প্রবৃত্ত হয়, সেগুলি এরূপ বিলাস ও আরামের সঙ্গে করে যে, পল্লী-জীবনের ক্লান্তিও বুঝে না সুখও বুঝে না। কলিকাতার লোকেরা পাড়াগাঁয়ে গিয়া সেই এক সময়ে এক আহার করিতে চায়, তাহাদের

জীবনে কোন বিভিন্নতা থাকে না; তাহাদের দেখিলে বোধ হয় যে, তাহারা কেবল এক রকমে জীবন কাটাতে ভালবাসে।

স্বাভাবিক দ্রব্য ও কৃষিজীবন দেখিয়া আমাদের মনে এক প্রকার মোহ জন্মে, আমরা এক মায়ায় আচ্ছন্ন থাকি। সমস্ত যন্ত্রণা, উদ্বেগ, লোকজন বিস্মরিয়া আমাদের মনে যেন পুরাকালের ঋষিদের সময়ে জীবিত আছি বলিয়া জ্ঞান হয়! আঃ সে কেমন নির্ম্মল ভালবাসার কাল; সে সময়ে মানুষেরা সরল ছিল আর সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিত। তাহারা ফল মুলাহারে কেমন পরিতৃপ্ত হত, নিজহাতের উৎপন্ন শস্য তাহাদের কেমন মিষ্ট লাগিত! তাহাদের পবিত্র জীবনে কখন অপবিত্র ভাব স্পর্শিত না, তাহাদের নির্ম্মল মনে কখন সমল চিন্তার উদয় হত না। সে সময়কার স্ত্রীলোকদের, সুস্থতা একমাত্র মাধুর্য্য, সরলতা একমাত্র ভূষণ, প্রসন্নতা একমাত্র আকর্ষণ ছিল।

শ্বশুরবাড়ীতে প্রায় দুই সপ্তাহ কাটিল; আমার কলেজের পড়ার ক্ষতি হইতেছিল, এজন্য আর বেশী দিন সেখানে থাকা ভাল বোধ হল না, কিন্তু এমন সুখের জীবন ছাড়িয়া যাইতেও আমার প্রাণ সরিল না। ঐ সময়ে পিতা শ্বশুরকে এক পত্র লিখিলেন; শুনিলাম, আমি সস্ত্রীক কলিকাতায় শীঘ্র ফিরিয়া যাই, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। শ্বশুরশাশুড়ী উহাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হলেন, কিন্তু আমি ঐ সংবাদে মহা আনন্দিত হলাম। ভাবিলাম, আমার সোনায় সোহাগা হল, সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিয়া যাব, ইহার অপেক্ষা অধিক উল্লাসের বিষয় আর কি হতে পারে। মনে মনে কত সুখস্বপ্ন রচিতে লাগিলাম, জগদম্বা ও আমি এক সঙ্গে গাড়ীতে, নৌকায় বসিয়া গল্প করিতে থাকিব, যাইতে যাইতে পরস্পরের অন্তরে অন্তর ঢালিয়া দিব। নাটক ও উপন্যাসে যে সকল ঐ অবস্থাপন্ন নায়ক নায়িকাদের কথা পড়িয়াছিলাম, তাহা সব একে একে আমার মনে আসিতে লাগিল।

আমাদের ফিরিয়া আসিবার বন্দোবস্ত সব ঠিক হলে জগদম্বা, আমি, ও আর তিনজন লোক কলিকাতা যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে জগদম্বার সঙ্গে আমার কথা কহিবার ভাল অবসর হয় নাই; কিন্তু কতকদূর নদীর উপর নৌকায় আসিতে হয়, সন্ধ্যার সময় সকলেই সুস্থির হইয়া নৌকায় বসিলাম, আমরা দুজনে আড়ালে থাকিলাম ও নানাপ্রকার গল্প করিতে করিতে ভাসিলাম। রাত্রিতে বেশ চাঁদ উঠিয়াছে, নীল আকাশে তারা নক্ষত্রগুলি ঝকিতেছে, সকলই নীরব; আমরা নিদ্রাকে বিদায় দিয়া মনের কথা কহিতে লাগিলাম। নদীর দিকে দেখাইয়া বলিলাম—দেখ, এই নদীর জল কেমন গভীর কিন্তু কেমন স্বচ্ছ, এই চাঁদের আলোতে আমরা উহার তলা পর্য্যন্ত অতি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি; আবার নদীর জল কেমন বেগবতী অথচ কেমন সহিষ্ণু, এক মুহূর্ত্তমাত্র স্থির থাকে না; ত্রিজগতে যাহাই ঘটুক না কেন, নদীর স্রোত চিরকাল একভাবে বহিতেছে; আমরা এত লোক এই নৌকা করিয়া উহার বুকে ভাসিতেছি, তবুও উহার কোন চাঞ্চল্য দেখিতেছি না।

কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, এক চক্রবাক অতি কাতরস্বরে তাহার সঙ্গিনীকে ডাকিতেছে, আমি জগদম্বাকে বলিলাম—দেখ, উহাদের প্রেম কি সুন্দর, উহারা একদণ্ড বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না, আমাদের ভালবাসা কি ঐরূপ হবে?—জগদম্বা উত্তরিল—হাঁ, যতদিন আমার শরীরে প্রাণ থাকিবে, ততদিন নিশ্চয় জানিও, এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের ভালবাসা টলিবে না; কি বিপদে, কি সম্পদে আমি তোমার চির-সহচরী থাকিব। আমি একটা সামান্য মূর্খ গ্রাম্য স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু দেখিবে এ কাঙ্গালানীর অপেক্ষা আর কেহ তোমায় বেশী ভাল বাসিবে না।—হাঁ, এখন ঐ কথা আমার মনে পড়িয়া কাঙ্গালানীর সমস্ত বাক্য সত্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে। সেই পাড়াগাঁর জগদম্বা আমার এখন

সব ; স্ত্রী বল, বন্ধু বল, সঙ্গী বল, সহায় বল, জগদম্বা একলাই এখন আমার সে সব।

আমি আসিতে আসিতে ঐ সময় তাহাকে কত উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একটাও বৃথা হয় নাই। অনেক কথার মধ্যে তাহাকে বলিয়াছিলাম—শরীরের সৌন্দর্য্য অতি ক্ষণস্থায়ী, বিধাতা স্ত্রীলোকদের রূপ প্রথমেই দেন, আবার রূপই প্রথম তুলিয়া লন। অন্তরের গুণই যথার্থ গুণ ; যে আন্তরিক ভাল, সে যথার্থ ভাল। চিরকাল মনে রাখিও যে, শরীরের ভালবাসা পদ্মপাতার জলের মত, কখন্ যায় কখন্ থাকে ; কিন্তু যখন অন্তরে অন্তরে মিল হয়, সে মিল পাষাণের মত দৃঢ়, অখণ্ড্য, অবিনশ্বর। এ পৃথিবীতে হৃদয়ই হৃদয়কে আকর্ষণ করে।

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে আমরা রাত্রি যাপিলাম। সকালবেলা নৌকা ছাড়িয়া কলের গাড়ীতে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম। দুই তিন দিন বিশ্রাম লইলাম ও পরে মন বদলিয়া আবার কলেজের পাঠে নিমগ্ন থাকিলাম।

দশম অধ্যায়।

বিদ্যাশিক্ষা।

শ্বশুর বাড়ী থেকে আসিবার পর আমি বন্ধু অনুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। অনু আমাকে দেখিবামাত্র বলিল—কি হে, খুব শ্বশুরবাড়ী ভোগ করে এলে, আমাদের আর মনে টনে পড়ে না বোধ হয়—না?

হুঁতো। হাঁ শ্বশুরবাড়ী বেশ ভোগ করেছি বটে, কিন্তু ভাই, তা বলে কি তোমাদের কথন ভুল্‌তে পারি। তুমি যদি আমাকে না ভুল, আমি তোমাকে কথন ভুলিব না, এ নিশ্চয় জানিও।

অনু। আচ্ছা, এখন বল দেখি, পাড়াগাঁ তোমার কেমন লাগিল?

হুঁতো। তা কি আবার জিজ্ঞাসিতে হয়, তোমাদের সহরের জীবন হতে আমি পাড়াগাঁর জীবনকে হাজারগুণে ভালবাসি।

অনু। হাঁ, তাত বটেই, শ্বশুরবাড়ীর কাদাও মিষ্টি, আর নূতন সবই ভাল লাগে; তার পর তুমি সেখানে কেবল পনর দিন ছিলে বই ত নয়, তুমি কেবল ভাল দিকটাই দেখেছ। মাস দুই তিন থাকিলে দেখিতে পেতে, পাড়াগাঁর বুনো, অসভ্য ও অশিক্ষিত লোকদের আর কলিকাতার শিষ্ট, সভ্য, ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কত প্রভেদ। স্বভাবের শোভা বল, স্বভাব সেই এক রকম, কতদিন স্বভাব ভাল লাগে?

হুঁতো। আমি তোমাদের কলিকাতার "শিষ্ট, সভ্য, ও শিক্ষিত" লোকদের ঠাট্টা বুঝি না। স্বভাবের নিন্দা করিতেছ, স্বভাবের শোভা যে একবার দর্শন করেছে, সেই স্বভাবের মহিমা বুঝে। তোমরা যেমন বল—

চাষা কি জানে মদের স্বাদ—আমিও বলি সহুরে কি জানে স্বভাবের স্বাদ? আর পাড়াগাঁর লোকদের তুমি বুনো, অসভ্য বলিয়া উড়াইয়া দিতেছ, আমি বলি কি, আগে পাড়াগাঁর সৃষ্টি হয়—না আগে সহরের সৃষ্টি হয়? আর যে পাড়াগাঁ না থাকিলে তুমি একদিনও বাঁচিতে না; যে পাড়াগাঁর লোকের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কল্যাণে তোমাদের এত বলবিক্রম; সকল দেশেই যে পাড়াগাঁর লোকদের সহুরেদের চেয়ে অনেক বেশী তেজ, বল, ও সাহস; যাহারা অমন সরল, অমায়িক, ও নিঃস্বার্থপর;—সেই পল্লী-বাসীদের সঙ্গে কপট, স্বার্থপর, মিথ্যাভিমানী নাগরিকদের তুলনা করিতেছ? তোমাদের "শিষ্ট, সভ্য, ও শিক্ষিত" লোকদের মুখে আগুন; আমি আবার বলিতেছি, আমি পাড়াগাঁকে তোমার সহর হতে হাজারগুণে ভালবাসি।

অনু। ওহে অত গরম কেন? তোমার উচ্ছ্বাসের স্রোতের কাছে আমি দাঁড়াতে পারি না। আমি ত পাড়াগাঁর নিন্দা করি নাই, আমি কেবল বলিতেছি যে. তুমি অতি শীঘ্রই পাড়াগাঁর জীবনে বিরক্ত হতে, আর দেখিতে যে, কলিকাতায় বাস অনেক সুখকর ও আরামদায়ী, পল্লীগ্রামে মধ্যে মধ্যে যাওয়াই ভাল। তোমার একটু একটু ছিট আছে. তাহা আমি চিরকাল জানি, আর তুমি একটী হুচুকের ভাণ্ডার। যাক্, ও কথা থাকুক, বল দেখি, তোমার এখন নূতন হুচুক কি?

হুঁতো। ছিট্ই বল আর হুচুকই বল, তোমার কাছে, ভাই, মনের কথা বলিব। আমি সাধারণের কাছে লাজুক ও বোবা বটে, কিন্তু অনু, তোমার সঙ্গে অনেক বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও তোমাকে আমি যথার্থ বন্ধুভাবে দেখি, তোমাকে আমি সব বলিব। আচ্ছা, তুমি পল্লীবাসীদের পছন্দ কর না, আমি বলিতেছি যে, পল্লীবাসী দূরে থাকুক, সভ্য লোকদের অপেক্ষা অসভ্য মানুষেরা অনেক ভাল।

অনু। হাঁ, এ একটা নূতন কথা বটে; আচ্ছা, তবে প্রকাশ করে বল।

হুঁতো। অসভ্য ও সভ্য লোকের হৃদয় ও প্রবৃত্তিতে এত প্রভেদ যে, যাহা একের মনে পরম সুখ উৎপাদন করে, তাহা অপরের অন্তরে একান্ত হতাশ জন্মাইয়া দেয়। অসভ্য ব্যক্তি কেবল বিশ্রাম ও স্বাধীনতার অন্বেষক, কেবল প্রাণধারণ ও অলসভাবে কালযাপন তাহার একমাত্র বাঞ্ছা, উদর পূর্ত্তি থাকিলে অন্য সকল বস্তুর প্রতি তাহার গভীর ঔদাস্যকে কেহ কোন প্রকারে বিচলিত করিতে পারে না। সভ্য ব্যক্তি, কিন্তু, সর্ব্বদা চঞ্চল, তাহার মন দিনরাত ছট্‌ফট করিতে থাকে, সে সর্ব্বদাই নূতন কর্ম্মের অনুধাবনে ধাবমান হয়; সে মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, কেবল জীবনধারণের জন্য জীবন নাশও স্বীকার করে, অনশ্বরতা পাইবার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দেয়। সভ্য লোকেরা বড় লোকদের প্রতি ঘৃণা ও ধনীদের অবজ্ঞা করিয়াও তাহাদের তোষামোদে প্রবৃত্ত হয়; তাহাদের সেবায় রত থাকিতে তাহারা কোন প্রয়াসের ত্রুটি করে না; নিজের নীচতা ও পরাশ্রয়কে অপরের নিকটে অতি গর্ব্বিত ভাবে ফলাইয়া বেড়ায়; আর নিজ দাসত্বে অহঙ্কৃত হইয়া যাহারা তাহার মত দশাগ্রস্ত নয়, তাহাদের ধিক্কার করে।

অসভ্য নিজের জন্যই বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু সভ্য লোক সর্ব্বদা পরের উপর নির্ভর করে; অন্যের মতামত বিনা সামাজিক লোক এক দণ্ডও কাটাতে পারে না, আর এইরূপে সে কেবল পরের অভিমত হতেই নিজের অস্তিত্বের জ্ঞান পায়। এই হেতু, আমরা কি প্রকার লোক, তাহা অপরদেরই নিকট জানিয়া ও ঐ সম্বন্ধে কখন নিজেদের মনে কিছু বিচার না করিয়া, এত বিজ্ঞান, দর্শন, শিষ্টাচার, সভ্যতা, নীতিবাক্যের মধ্যেও আমরা প্রবঞ্চক ও চপলবৃত্তির সমষ্টি মাত্র। আমাদের মান আছে কিন্তু

ধর্ম্ম নাই, যুক্তি আছে কিন্তু প্রজ্ঞা নাই, আহ্লাদ আছে কিন্তু সুখ নাই। অসভ্য ব্যক্তি নিজের আহারের পর সমস্ত প্রকৃতি ও সমস্ত স্বজাতীয়ের সঙ্গে মিত্রভাবে থাকে; যদি কখন খাদ্য লইয়া কাহারও সঙ্গে তাহার বিবাদ ঘটে, অন্যত্র আহার পেলে একান্ত পক্ষে অল্প ঘুসাঘুসির পরেই তাহাদের কলহ শেষ হয়; বিজেতা আহার করে, বিজিত অন্যত্র জীবিকার অন্বেষণ করে; এইরূপে সকলেই আবার শান্তিভাব ধরে। কিন্তু সভ্যদের মধ্যে সকলই অন্য প্রকার। তাহারা আবশ্যকীয় দ্রব্যের আহরণের পর, অনাবশ্যকীয় সামগ্রীর আহরণে ব্যাপৃত থাকে, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া বিলাসসামগ্রী, পরে ধনসম্পত্তি, পরে প্রজা-বর্গ, অবশেষে ক্রীত দাস সংগ্রহ করিতে সমুদ্যুক্ত হয়। তাহাদের এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম নাই, আর সকলের অপেক্ষা বিচিত্র এই যে, যে দ্রব্য-গুলি অতি অস্বাভাবিক ও অতি তুচ্ছ, সেইগুলারই অনুধাবনে তাহারা অধিক বিব্রত থাকে, আর তাহাদের সকল অভাব মিটিলেও, বহুকাল সমৃদ্ধ অবস্থায় প্রভূত ধনসম্পত্তি ভোগ করিয়াও সভ্য বীরেরা রাশি রাশি মানুষের প্রাণ বধিয়া অবশেষে সমস্ত বিশ্বের একাধীশ্বর হতে চাহে।

অনু। হাঁ তুমি বেশ বক্তৃতা করিলে বটে, কিন্তু আর কাহারও কাছে ঐরূপ কহিলে সে তোমাকে পাগল বলিবে। আচ্ছা, আমি স্বীকার করিলাম, তোমার অসভ্যই শ্রেষ্ঠ, তবে তুমি কি এইবার বনে গিয়া তোমার অসভ্যদের সঙ্গে বাস করিবে নাকি?

হঁতো। না, আমি ত তা বলি নাই, আমার কথার সামঞ্জস্যের প্রমাণের জন্য ঐ সকল যুক্তি দেখালাম। তুমি ভাই, একটী ঘোর পার্থিব, সাংসারিক জীব হইয়া পড়িয়াছ, তোমার সাংসারিক মস্তিষ্কে আমার যুক্তি প্রবেশ করান বড় ভার দেখিতেছি।

অনু। আমি সাংসারিক বটে, কিন্তু দিনকতক পরে দেখা যাবে, কে বেশী সাংসারিক হয়।

হুঁতো। ওহে আমার আর একটা নূতন হুচুক চাপিয়াছে। আমার বড় ইংলণ্ড যাবার ইচ্ছা হয়েছে। তুমি আমাকে ঠাট্টা করিবে বটে, কিন্তু তুমি কাহাকেও বলিও না, আমি কি করিয়া ইংলণ্ড দেখিব, প্রাণ-পণে তাহার একটা উপায় খুঁজিতেছি।

অনু। গৃহস্থের ছেলের আবার ইংলণ্ডে যাওয়া কি? আবার তোমার বিয়ে হয়েছে, এখন সংসারী হতে চলিলে, তুমি কি সমস্ত সংসার লইয়া বিলাতে যাবে নাকি? হুঁতো, ও সব পাগলামি ছাড়িয়া দাও। এস এখন দুই একটা ঘরের কথা কহি। আর ভাই, আমার একটা উপদেশ শুন, আজ আমাকে যে সকল কথা বলিলে, আর কাহারও কাছে তাহা প্রকাশিও না। একে লোকের বিশ্বাস, তোমার একটু ছিট আছে, তার পর যদি ঐ সকল কথা লোকে জানিতে পারে, তাহা হলে নিশ্চয়ই তোমাকে সকলে স্থির পাগল ঠাওরাবে।

হুঁতো।—পাগলই বলুক আর ছাগলই বলুক, আমি যদি কখন বই লিখি, তাহাতে ঐ সকল কথা লিখিব, দেখির তোমার সভ্যেরা কি বলে।

পাঠক! আমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে অনুর সঙ্গে কথোপকথন এই-খানে লিখিলাম, তোমার ভালমন্দ যাহা বোধ হয়, অবাধে বলিবে। এখন আমি শীঘ্র বি-এ উপাধি লইতে চলিলাম, এই অবসরে আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে দুই চারটা মনের কথা লিখি। অবশ্য আমার সময়ে সে বিদ্যা-লয়ের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাই বর্ণিতেছি; আজকাল বোধ হয়, উহাতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেজন্য আমার কোন ভুল হলে, যুবা পাঠক, তাহা উপেক্ষা করিবে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্বন্ধে একটী বিষয় আমার মনে লাগিত।

তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্টতা অতি অল্প দেখিতে পেতাম। সকলে এক বিদ্যালয়ে অধ্যায়ী বা সকলেই প্রায় সমবয়স্ক ছাত্র বলিয়া তাহাদের একটা বাঁধুনী ছিল না। ও সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান ছিল কি না, তাহাতেই সন্দেহ। সমস্ত বিদ্যালয়ের কেন, প্রতি শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেও পরস্পরের মিল ছিল না। আমাদের মধ্যে সমভাব স্বভাবতঃই অতি বিরল, তাহার পর যৌবন কালে, যে সময়ে মানুষের হৃদয় অধিক সমভাবপ্রবণ হয়, সেই সময়ে ঐরূপ—এক বয়স, এক অধ্যয়ন, এক বিদ্যা-লয়,—এত সুযোগ থাকিতেও ছাত্রদের মধ্যে কোন সংহতি বা একভাব জন্মে না, ইহা যারপরনাই আক্ষেপের বিষয়। ছয় আট জন করিয়া অনেক ছোট ছোট দল বাঁধা হয়, তাহারাই পরস্পর আলাপ পরিচয় করে, কিন্তু সাধারণতঃ কেহ কাহারও জন্য কিছু গ্রাহ্য করে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহারা বি-এ শ্রেণীতে পড়ে, তাহারা নিজেদের মস্ত মাতব্বর লোক ভাবিয়া নীচের শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে মিশিতে অপমান বোধ করে ; আবার আমাদের স্কুল, বিদ্যালয়ের একটা মহাদোষ দেখিতে পাই যে, কোন শ্রেণীর ভাল ছাত্রেরা নিজেদের দিগ্বিজয়ী মনে করিয়া, কম ভাল কিম্বা মন্দ ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুতা পাতাইয়া নিজেদের কলুষিত করিতে চাহে না। আমি তের বৎসর বরাবর ঐ বিষয় নজর করিয়াছিলাম, আর দেখিয়াছিলাম যে, অধিকাংশদের অন্তরে একটু বিদ্যা পড়িলেই বা তাহারা পরীক্ষায় একটু ভাল উত্তীর্ণ হলেই অমনি তাহারা গুমরে ফাটিয়া পড়ে। তাহারা একবারও ভাবে না যে ভাল ছাত্রদের মধ্যেই অনেকে বৎসর কয়েকের ভিতরেই একেবারে ধ্বসিয়া যায়, তাহাদের নামমাত্রও শুনা যায় না। আর তাহারা যাহাদের অমন ঘৃণার চোকে দেখিত, সেই 'মন্দ' ছাত্রেরা তাহাদের হতে ছাড়াইয়া উঠে। এই বিষয়ের একটী মুখ্য কারণ এই যে, আমরা কেবল পরীক্ষার ফল ও পাঠ্য পুস্তকের আবৃত্তিকেই

সর্ব্বেসর্ব্বা জ্ঞান করি। বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ভিন্ন অন্য কোন গুরু বিষয়ে মন দিই না, কাজেকাজেই ঐ একটী বিষয়ই আমাদের নিকট ভালমন্দ নির্ণীবার একমাত্র পরিমাণ হয়। যে পরীক্ষায় সফল হয় সেই বড়লোক, আর যে বিফল হয়, সেই তুচ্ছলোক, এইরূপে আমরা ছাত্রদের মধ্যে তারতম্য ঠিক করি।

এই দোষের নিরাকরণের অনেক উপায় আছে, তাহার মধ্যে একটা অতি সহজ ও উহা অনায়াসে অবলম্বিতে পারা যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে নানাপ্রকার সমাজ স্থাপিলে তাহাদের হৃদয়ে সমভাব জন্মিতে পারে; উহাতে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা নূতন বাঁধুনি হয়, ও ভাল ছাত্রদের একাধিপত্য লোপ পায়। মনে কর, বক্তৃতা, ব্যায়াম প্রভৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বাঁধিলে, বিদ্যালয়ের ছাত্র অনেক হলে প্রতি শ্রেণীতে ঐরূপ সমাজ করিয়া সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য ঐ সকল বিষয়ে বড় বড় সাধারণ সমাজ স্থাপিতে পার। এখন, একজন লোক সকল বিষয়ে উৎকর্ষ লভিতে পারে না; কেহ বা পড়ায় ভাল, কেহ বক্তৃতায় ভাল, কেহ বা ব্যায়ামে ভাল, এইরূপ দেখিলে কেবল পড়ায় ভাল ছাত্রেরা অন্যদের ধিক্কার করিতে পারিবে না, সকলেই কোন না কোন বিষয়ে উৎকর্ষের জন্য পরস্পরের সম্ভ্রম করিবে। ইহা ছাত্রদের মধ্যে বাঁধুনির একটী অতি চমৎকার উপায়। নানা বিষয় পর্য্যালোচিলে লোকের মন অধিক প্রশস্ত হয়, পরস্পরের মধ্যে সমভাবের অনেক সাধন ঘটে, দ্বেষাদি নীচ ভাবসকল বিনাশ পায়। ইহাতে একটী প্রধান আপত্তি হতে পারে যে, ছাত্রদের পড়ার ক্ষতি হবে, তাহারা পরীক্ষার পাঠ ফেলিয়া সমিতিতেই মত্ত থাকিবে। এ আপত্তি বৃথা ও অতি অকিঞ্চিৎ-কর। পাঁচজন 'ভাল' ছাত্র একটু কম 'ভাল' হওয়ার অপেক্ষা পঞ্চাশ জনের মধ্যে সাধারন সমভাব ও উন্নতি অনেক গুণে শ্রেয়।

আর একটী প্রধান অভাব লক্ষ্য করিতাম। বিদ্যালয়ে আমাদের কেবল মানসিক চর্চ্চাই হয়, শারীরিক বা আন্তরিক গুণে আমরা নিতান্ত ঔদাস্য দেখাই। এ সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছি, তাহা সত্য বটে, কিন্তু এই বিষয় যদি আমি হাজার বার লিখি, তা হলেও আমার সাধ মিটিবে না। এ বিষয়ে তাচ্ছল্য দেখিয়া আমি মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাই; ইহা আমাদের বাঙ্গালীদের অধোগতির প্রধান কারণ। আমরা বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, নিজেদের প্রকাণ্ড বিদ্বান ভাবিয়া গর্ব্বে টলিয়া পড়ি; কিন্তু অত বৎসরের শিক্ষার পর কি আমরা বেশী বলিষ্ঠ, তেজস্বী, সাহসী, সত্যপ্রিয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ও অধ্যবসায়ী হই? অত বই মুখস্থ করিয়াও আমরা সেই রোগা, কমজোর, ভীরু, নিস্তেজ কাপুরুষ বাঙ্গালী থাকি; আমাদের চরিত্রের কোন উন্নতি হয় না; আমাদের আসল মজ্জা যেমন ক্ষীণ, সেইরূপ ক্ষীণই রহিয়া যায়।

ভাই বাঙ্গালি! তোমাকে আমি আন্তরিক ভালবাসি, তোমাকে আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি যে, তুমি তোমার শরীর ও অন্তরের প্রতি অধিক যত্ন কর। তুমি বিদ্যাবুদ্ধিতে অতি পারদর্শী, ওসম্বন্ধে পৃথিবীতে কেহই তোমার শ্রেষ্ঠ নয়। এমন কোন শাস্ত্র বা বিজ্ঞান নাই, স্বদেশী বিদেশী এমন কোন ভাষা নাই, গূঢ় বা কঠিন এমন কোন বিষয় নাই—যাহা তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি গ্রাসিতে পারে না। কিন্তু তাহা গ্রাস করাতে আর কার্য্যে পরিণত করাতে অনেক প্রভেদ। আর ইহা নিশ্চয় জানিও যে, যতদিন তোমার শারীরিক বল ও আন্তরিক গুণ না হবে, ততদিন তুমি এ পৃথিবীতে অতি হীনাবস্থায় থাকিবে। দেখিবে, তোমার বিদ্যাবুদ্ধি সত্বেও প্রথম ঝড়ে আগে তুমি ধরাশায়ী হবে।

যেমন ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে সমভাব অতি বিরল, সেইরূপ অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্টতা অতি অল্প। এ স্থলে আমি কেবল

ইংরেজ অধ্যাপকদের উল্লেখিয়া বলিতেছি না, আমাদের বিদ্যালয়গুলির সাধারণ সকল শিক্ষকদের সম্বন্ধেই ঐরূপ দেখিতে পেতাম। অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে, দিনে দুই চার ঘণ্টা পড়ান, এই যা সম্পর্ক, তাহা ছাড়া শিক্ষকেরা ছাত্রদের কথা আর ভাবেন না, ছাত্রেরাও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহাতে অবশ্য অধ্যাপকদের অধিক দোষ। যাঁহারা গুরু, জ্ঞানী ও অভীজ্ঞ হইয়াও অল্পবয়স্ক, তরুণ-মতি অনভিজ্ঞ যুবকদের ভাব, চিন্তা ও কার্য্যে কোন আস্থা লন না, ছাত্রেরা কিরূপে সে অধ্যাপকদের সঙ্গে মিশিবে? ইহাতে তাহাদের স্বাভাবিক ঔদাস্য ও নিস্পৃহতা ক্রমে দৃঢ়ীভূত হয় ও ক্রমে আরও বৃদ্ধি পায়। তাহাদের যথার্থ কোন উন্নতি হয় না, কেবল অনেকগুলা বইই পড়া হয়। যে বড়, সে যদি ছোটদের আন্তরিক ভাবের গতি বুঝিয়া তাহাদের ভাল পথ না দেখায়, তাহা হলে ছোটরা কিরূপে ভাল হবে? ছাত্রদের স্বভাব, চরিত্র, নীতিই বা কিরূপে উন্নত হবে? এ সংসারে সমভাব ও দৃষ্টান্তের অসীম প্রভাব। অতি অল্প সমভাবে বা একটী দৃষ্টান্তে যত যথার্থ উপকার দর্শে, শত শত শিক্ষা বা নীতি উপদেশে সে উপকার দেখা যায় না। কোন ছাত্র যখন মন্দ পথ থেকে ভাল পথে যাইতে চেষ্টা করিতেছে কিম্বা তাহার মন সেইদিকে ঈষৎ মাত্রও প্রবণ হইয়াছে, এমন সময়ে যদি তাহাকে একটী ঈসারা বা কথা দ্বারা উৎসাহ দাও, বা কোনরূপ সমভাবের অপ্রকাশেও সে যদি কোন প্রকারে বুঝিতে পারে যে, তুমি তাহার মনের গতির সাপেক্ষ ও তুমি তাহার উন্নতিতে আস্থাবান, তাহা হলে তাহার ভাল হবার কত সম্ভাবনা। তাহার অন্তরে একটা অদৃশ্য, অচিন্তনীয় উত্তেজনা ও উৎসাহ জন্মিবে, সে আপনা আপনি ভাল পথে ধাবিবে, নিজে উন্নত হবার জন্য সে নিজের প্রয়াস ও উৎসাহকে দুগুণ বাড়াবে।

অন্য সকল বিষয় দূরে থাকুক, কেবল বিদ্যাশিক্ষাতেই অধ্যাপকেরা ছাত্রদের সম্বন্ধে যত্ন লন না। অবশ্য পরীক্ষার ফল যাহাতে ভাল হয়, সে বিষয়ে আস্থার কথা বলিতেছি না, সে আস্থা বোধ হয়, সকল শিক্ষকই লইয়া থাকেন। ছাত্রেরা যথার্থ যাহাতে শিক্ষা পায়—এ বিষয়ে আমাদের দেশের কজন অধ্যাপক উৎসাহ দেখান্? শিক্ষিতদের মানসিক গতি না পর্য্যালোচনা করিলে কখনই তাহাদের ভাল শিক্ষা দিতে পারা যায় না। মনের বিকাশকে সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিলে আর স্বভাবগত শক্তিসকলকে কার্য্যায়ত্ত করিলে, আমরা শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিণাম লভি। সকল জীবের মন স্বভাবতঃ সচল ও সবীর্য্য, উহা কখনই স্থির থাকে না। কিন্তু উহার স্বাস্থ্যকর পুষ্টির নিমিত্ত যথাযোগ্য সাধনের আবশ্যক। এই জন্য যে সময়ে যে বস্তু বা যে খাদ্যের প্রয়োজন, তখন সেইটাই যোগাতে হলে অতি সমভাবিক যত্নের সঙ্গে মনের ভাবগতি নিরীক্ষণ করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। আমাদের শরীর সর্ব্বদাই আহার অন্বেষণ করে না বা সর্ব্বদা একপ্রকার আহার চাহে না, অথচ শরীর সর্ব্বদাই চলিতেছে, কোন না কোন অঙ্গ সচল রহিয়াছেই, একেবারে সমস্ত শরীর কখনই বিশ্রান্ত থাকে না। কখন বা বাতাসের, কখন বা জলের, কখন বা ব্যায়ামের, কখন বা খাদ্যের আবশ্যক হয়; কিন্তু সর্ব্বদাই যাহাতে শরীরের কল চলে, ক্রমাগত এমন জিনিসের দরকার। সেইরূপ ঘুমন্ত অবস্থা ছাড়া, (অনেকে বলেন যে সে অবস্থাতেও মনের বিশ্রাম নাই) যে জিনিস লইয়া মন কাজ করিতে পারে, উহার চলিবার জন্য, সর্ব্বদা সেইরূপ কোন না কোন জিনিস যোগান আবশ্যক। কিন্তু কোন্ সময়ে কোন্ উপকরণের প্রয়োজন, সেইটা বুঝা শিক্ষকের কাজ। এইরূপ ব্যবস্থামতে মনের পুষ্টি সাধিলে মনের যথার্থ শিক্ষা হবে আর অল্প সময়ের মধ্যে অনেকে নানা প্রকার বিদ্যায় যথার্থ পারদর্শী

হতে পারিবে। যাহা ছাত্রেরা মনে ধরিতে পারে না, এমন শিখান মিথ্যা। স্মরণশক্তির প্রখরতা মনোযোগের উপর নির্ভরে, মনোযোগের প্রখরতা পাঠ্য বিষয়ে আস্থার উপর নির্ভরে। বিনা আস্থায় বিদ্যা শিখান চালুনি করিয়া জল তুলার সমান, যতই কেন শিখাও না, সব অল্প দিনের মধ্যে ঝরিয়া পড়িবে। কেবল পরীক্ষার ভয়ে বা ছাত্র-বৃত্তির লোভে এ আস্থা জন্মান বিজ্ঞের কাজ নয়। ইহাতে আপাততঃ উপকার বোধ হবে, কিন্তু সে উপকার অতি ক্ষণস্থায়ী। ছাত্রদের মনে আস্থা জন্মাও, আর মন্দ উপায় ছাড়িয়া ভাল স্বভাবিক উপায়েই সে আস্থার স্থষ্টি কর, দেখিবে তাহার পরিণাম কেমন উপকারক ও চিরস্থায়ী।

পুরাণ হিন্দু কলেজের সময়কার আর বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষার প্রভেদের একটী প্রধান কারণ এই যে, এখনকার অধ্যাপকেরা ছাত্রদের সম্বন্ধে যথার্থ আস্থা লন না। তাঁহাদের কাজ বুঝানই একমাত্র চিন্তা আর পরীক্ষার ফল তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। হেয়ার, রিচার্ড্সন্ প্রভৃতি পুরাণ ইংরেজ শিক্ষকেরা কত যত্ন, কত আগ্রহের সঙ্গে ছাত্রদের বিদ্যা শিখাতেন। যাহাতে ছাত্রেরা উত্তমরূপে একটা জিনিস বুঝে, যাহাতে তাহাদের মনে পাঠ্য বিষয়ে যথার্থ আস্থা জন্মে, যাহাতে তাহাদের মানসিক শক্তিগুলি সুস্থভাবে পরিপুষ্ট হয়—তাহারই জন্য তাঁহারা ব্যস্ত থাকিতেন। আজকালকার অধিকাংশ শিক্ষকেরা বি-এ, এম্-এ উপাধিধারী বলিয়া অতিশয় অভিমানী, কিন্তু যথার্থ শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহাদের বিশেষ অধিকার দেখি না।

ইংরেজ অধ্যাপকদের সম্বন্ধে কি বলিব, আমরা এমন অধম অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি যে, সকল বিষয়ে আমরা ইংরেজদের দেবতুল্য ভাবি, আর আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞানই এই যে, সাহেব অধ্যাপকেরা যাহাই করেন, যাহাই বলেন, তাহাই বেদবাক্য; তাহা কণ্ঠস্থ করিলে পাপী তরিয়া

যাবে, এই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের কালে একজন অতি বিদ্বান ইংরেজ অধ্যাপক ছিলেন, তিনি কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ঘাড় গুঁজিয়া কেবল পাঠই দিতেন, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসিলে তিনি মহা ক্রুদ্ধ হতেন আর কথন কথন কর্কশ বাক্যও বলিতেন। কোন বই পড়াবার সময় তিনি হুড়্‌হুড়্ করিয়া প্রতি পদের প্রতি কথার পর্য্যন্ত মানে বলিতেন, এমন কি 'ছিল' মানে 'বর্ত্তমান ছিল' এইরূপ প্রতি কথার প্রতিশব্দ দিতেন। ছাত্রেরা অনর্গল কলম চালাতে থাকিত; সাহেবের একটী কথাও যাহাতে বাদ না যায়, এজন্য প্রাণপণে যত্ন করিত। এমন কি, ঐ অধ্যাপকের পড়ানর সময়ে শ্রেণীটীকে পাঠঘর মনে না হইয়া কলমের ঐকতানিক বাদ্যস্থান বলিয়া বোধ হত। অনেকে তাঁহার সমস্ত টীকা মুখস্থ করিয়া রাখিত আর পরীক্ষা ঘরে অবিকল ঝাড়িয়া দিত। তাঁহার ছাত্রেরা পরীক্ষায় বেশ উত্তীর্ণ হত আর তাহাদের বিদ্যাযশের ধ্বনিতে সমস্ত বাঙ্গালা রৈ রৈ করিত। কিন্তু ছাত্রদের যথার্থ বিদ্যা বা জ্ঞান হত কি? কজন তাঁহার শিক্ষা হতে যথার্থ উপকার পাইত? ছাত্রেরা পরীক্ষার কালে কথার বদলে কথা বসাত, বাক্যের বদলে বাক্য লিখিত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ছয়জন গ্রন্থকারের আসল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিত কি না সন্দেহ।

সেই শিক্ষকও, ছাত্রেরা যথার্থ বিদ্যা শিখিল কি না, তাহার জন্য একবারও নিজের মাথা ব্যথা করিতেন না, তিনি কলের মত পড়াইয়া যেতেন। তাঁহার নিজদেশে ঐরূপভাবে লাটিন, গ্রীক পড়ালে চলিতে পারে বটে, কিন্তু তিনি একবারও ভাবিতেন না যে, বাঙ্গালী ছাত্রদের এক জন বিদেশী অধ্যাপক বিদেশী ভাষায় বিদেশী জিনিসের বিদেশী বই পড়াতেছেন, আর আমাদের দেশের ছাত্রদের শিক্ষা আগাগোড়া কাঁচা, তাঁহার ঐরূপ বক্তৃতাচ্ছলে পড়ানতে কথনই তাহাদের যথার্থ উপকার হতে পারে না।

আর একজন অতি বিজ্ঞ ইংরেজ অধ্যাপক ছিলেন, তিনি অতিশয় যত্নের সঙ্গে সমস্ত বুঝাইয়া দিতেন, আর তাঁহার ছাত্রদের প্রতি ব্যবহারও অনেকটা সমভাবিক ছিল। কিন্তু আমাদের এরূপ হতভাগা দশা যে, ছাত্রেরা তাঁহাতে কোন ক্রূরতা বা কঠোরতা দেখিতে পাইত না বলিয়াই হউক বা লোকের যথার্থ ভাল গুণের সমাদর জানে না বলিয়াই হউক, সে অধ্যাপকের তেমন সম্ভ্রম করিত না; রীতিমত টীকা পাইত না বলিয়া তাঁহার পড়ানতে তত শ্রদ্ধা প্রকাশিত না, আর অনেকে ক্রমাগত কলম চালাতে পারিত না বলিয়া একেবারে কোন অর্থ লিখিয়া লইত না। তাঁহারও সেরূপ যশ ছিল না, তাঁহার ছাত্রদেরও সেরূপ যশ ছিল না। আর দুই একজন ইংরেজ অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহারা না জানিতেন পড়াতে, না জানিতেন পড়িতে, পাঠ্য পুস্তক নিজেরাই ভাল বুঝিতেন না; কিন্তু ছাত্রেরা লালমুখ সাহেবদের মাথামুণ্ডহীন শিক্ষাতেই আপ্যায়িত থাকিত। বিদ্যা শিখান, সহজ, সামান্য কাজ নয়, তার পর ইংরেজ বাঙ্গালী সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প বিষয়ে—সমভাব বা মিল আছে, আর আজকালকার ইংরেজ অধ্যাপকদের ছাত্রদের সম্বন্ধে আস্থা ও যত্ন অতি বিরল; এই সকল কারণেই আমাদের বিদ্যাশিক্ষার এখন বড় দুরবস্থা।

বাস্তবিক আমার সময়ের বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত অতি জঘন্য ছিল, এখন তাহার কতদূর পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন। আমরা বিদ্যালয়ে কিই বা শিখিতাম? সাত আটখানা ইংরেজী সাহিত্যের বই, দুই চারিখানা সংস্কৃতের, চার পাঁচখানা ছোট আঁকের, দুই তিন খানা দর্শনের বইতেই আমাদের সমস্ত বিদ্যাজ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকিত। কোন রকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি পাইলেই নিজেদের বিদ্যাদিগ্গজ ভাবিতাম। অবশ্য দুইচারজন যথার্থ উপকার পাইত, কিন্তু

ঝুড়ি ঝুড়ি যে বি-এ, এম্‌-এ ওয়ালারা সংসারে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের শেষ দশা কি হইল; তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ই বা কতদূর থাকিল? আমরা যেই বিদ্যালয় ছাড়ি, অমনি আমাদের পড়াশুনা সমস্ত বন্ধ হইয়া যায়, আমরা একবারও ভাবি না যে, বিদ্যালয়ে পড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য বিদ্যা উপার্জ্জন নয়; কিন্তু কি করিয়া বিদ্যা শিখিতে হয়, কিরূপে নিজেরা কোন নূতন বিষয় শিখিতে পারি, সেই উপায় শিখা ও নিজায়ত্ত করা, আর সেই নিমিত্ত আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলির পুষ্টি ও শাসন করাই স্কুল বা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের একমাত্র প্রয়োজন।

আমাদের চিন্তাশক্তি উদ্রিক্ত হবার পর যখন অনুধ্যানের দ্বারা বুদ্ধিশক্তি একবার বিকশিত হয়, তখন পুস্তকে প্রকাশিত বিষয়গুলি নিজেরা উদ্ভাবিয়া পাইলে আমরা পরম উপকার লভি। সেই সকল জিনিস নিজ মাথায় ধরিবার ও তাহাদের নিজায়ত্ত করিবার উহাই গূঢ় উপায়। অধ্যায়ীদের মহা ভ্রম এই যে, তাহারা বইয়ের উপর অতিরিক্ত নির্ভরিয়া নিজেদের মস্তিস্ক চালনাকে নিতান্ত অবহেলিয়া থাকে। তাহারা ভাবে না যে, পরের অপেক্ষা নিজের উপর অবলম্বন অনেক শ্রেয়, পরের সাহায্য অপেক্ষা নিজের ক্ষমতার পরিচালনা অনেক উপকারক, পরের যুক্তি অপেক্ষা নিজের বিবেকশক্তিতে বিশ্বাস, অনেক মঙ্গলদায়ক।

আমরা দেখিতে পাই যে, যে সকল বিষয় নিজে চিন্তিয়া লই, সেগুলি অতি পরিষ্কার বুঝি; আর কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, তাহা নিজেরাই নির্দ্ধারিতে পারি। ঐ সম্বন্ধে আমাদের অপরের উপদেশ দিবার আবশ্যক হয় না, আর ভালমন্দ বিচারে অপরের দ্বারা প্রতারিত হবারও সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অতি সুন্দর ও উত্তম বস্তুর দৃষ্টান্ত অতি অল্প ও বিরল, সেজন্য অন্যস্থানে সে সকল বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হয়।

আমরা মিথ্যাভিমান বশতঃ নিজেদের দুর্ব্বলতা অনুসারে স্বাভাবিক বল-গুলির পরিমাণ করিয়া থাকি। যে সকল দ্রব্যের মর্ম্ম নিজেরা গ্রহিতে অক্ষম, সেগুলি স্বপ্নবৎ মনে ভাবি। অলসতা ও অক্ষমতার দরুণ আমরা সে সকলকে অসাধ্য জ্ঞান করি; আর যাহা রোজ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা কখনই দেখা যায় না, দুর্ব্বল মানুষ এইরূপ ভুল বুঝে। এই ভ্রমের নিরাকরণ অতিশয় বিধেয়। বড় বড় বস্তু ভাবা ও দেখার অভ্যাস উচিত কর্ম্ম; এইরূপ করিলেই আমরা সেই সকলের অনুকরণে প্রবৃত্ত হই। ঐ সকল উৎকৃষ্ট আদর্শের আলোচনায় আমাদের আত্মা উন্নত আমাদের হৃদয় প্রশস্ত হয়; নিরন্তর তাহাদের আন্দোলনে আমরা সে গুলির স্বরূপ হতে চাই; আর মধ্যবিৎ দ্রব্যকে আমরা হেয়ভাবে দেখি। যে সর্ব্বদা আকাশে ঘুরে, সে পৃথিবীকে অতি নীচ মনে করে; যে সর্ব্বদাই বড় লোকদের সঙ্গে মিশে, বড় লোকদের কথা শুনে, সে আপনা আপনিই তাহাদের মত হইয়া যায়। শরীরের ন্যায় মনও যাহা পারে, কেবল তাহাই বহিয়া থাকে। আমরা দ্রব্যাদির জ্ঞানকে স্মরণে ন্যস্ত করিবার পূর্ব্বে যদি আপন বুদ্ধিশক্তির চালনা দ্বারা সে জ্ঞানকে নিজায়ত্ত করি, তা হলে আমাদের মন থেকে পরে যাহা বাহির হয়, তাহা আমাদের নিজ বুদ্ধির ফল, তাহা পরের বলিয়া পরিগণিত হয় না। এইরূপে কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিবার পরিবর্ত্তে আমরা নিজ বুদ্ধি হতেই সমস্ত পাইতে পারি। এই জন্যই বলিতেছি যে, কেবল ভাল জিনিসের চর্চ্চা করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, আর সেগুলি কণ্ঠস্থ করিবার পরিবর্ত্তে হৃদয়ঙ্গম করাই আমাদের একান্ত বিধেয়।

যে বিষয়ই বল, নিরীক্ষণ, অনুধ্যান, নিজ-চর্চ্চা, ও ক্রম এই কয়েকটী উপায় দ্বারা তাহাতে আমাদের যেরূপ অধিকার জন্মে, এমন আর অন্য কোন সাধনেও হতে পারে না। কোন একটী বস্তু বা ঘটনাকে অতি

মনোযোগের সঙ্গে দেখা, তাহার মূল, উৎপত্তি, উদয়, বৃদ্ধি, অবনতি, ও বিলয়, এই কয়েকটী অবস্থাকে তন্ন তন্ন করিয়া অবলোকনকে নিরীক্ষণ বলে। সেই নিরীক্ষণের পর বার বার ঐ সকল নিরীক্ষিত বিষয়গুলির মনে মনে গভীর চিন্তনকে আমি অনুধ্যান কহি ; অনুধ্যানের পর নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেক, ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে ঐ বস্তু বা ঘটনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া উহাদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য ও প্রভেদ, আর উহাদের ও অন্য বস্তু বা ঘটনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির সঙ্গে সমতুলিয়া উভয়ের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য বা প্রভেদের আলোচনাকে নিজ-চর্চ্চা কহে। আর এই সকল বিষয় বা ব্যাপারের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা—স্বভাবতঃ কোন্‌টীর পর কোন্‌টী ঘটিয়াছে দেখিয়া, যথাসময়ে একটার পর আর একটীর আলোচনা—এইরূপ রীতিমত নিয়মকে ক্রম বলে। এই চার উপায় দ্বারা আমরা যে যথার্থ জ্ঞান ও উপকার লভিতে পারি, বহুকাল পরের শিক্ষা বা রাশি রাশি পুস্তকের পাঠ হতে তাহার হাজার ভাগের এক ভাগও পাইতে পারি না। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ডেকার্টের বৃত্তান্ত বোধ হয় অনেকে জানিয়া থাকিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট গল্প আছে। একদিন কোন লোক একখানি পরিচয়-পত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় ; পণ্ডিত ডেকার্ট যথামত সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনার পর তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন—মহাশয়, আপনার জন্য আমি কি করিতে পারি, বলুন। অভ্যাগত ব্যক্তি অত বড় পণ্ডিতের একটা বড় পুস্তকাগার দেখিবার আশয়ে উত্তরিল—পণ্ডিত মহাশয়, আপনার পুস্তকাগার দেখিতে আমি একান্ত ইচ্ছা করি, কোন বাধা না থাকে, ইহাই আপনার নিকট আমার প্রার্থনা। ডেকার্ট কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া যে ঘরে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন, তাহার এক পাশে আগন্তুককে লইয়া গেলেন, আর পর্দ্দা টানিয়া, সেই পাশে নিভৃত স্থানে

একটী মড়া পড়িয়াছিল, তাহাই দেখাইয়া বলিলেন,—দেখুন, এই আমার সমস্ত পুস্তকাগার, এই আমার সমস্ত পাঠ্য পুস্তক। কথিত আছে, এক দিন এক ভদ্র স্ত্রীলোক কোন বিখ্যাত চিত্রকরের চিত্রিবার শক্তিতে মোহিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—চিত্রকর মহাশয়, আপনি কি দিয়া এমন চমৎকার রং মিশান? চিত্রকর উত্তরিলেন—ভদ্র মহিলে! আমার মস্তিষ্ক দিয়াই এরূপ রং মিশাই।

বাস্তবিক ঐ সকল উপরোল্লিখিত গুণগুলির সম্ভাব ও অভাবের স্পষ্ট উদাহরণ আমার সহধ্যায়ীদের মধ্যে বেশ দেখিতাম। আমাদের শ্রেণীতে একজন ছাত্র পড়িত, সে অতি অল্প বই পড়িয়াছিল, তাহার অনেক বিষয়ে প্রবেশ মাত্রও হয় নাই; কিন্তু সে যুবকটী চিন্তাশীল, নিজ-চর্চ্চা-রত ছিল, যে বিষয়টী সে ধরিত, তাহা অতি উত্তমরূপে শিখিত ও বুঝিত। তাহার সঙ্গে সে বিষয়ে কোন কথা কহিলে তাহার মুখ দিয়া এমন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার উত্তর বাহির হত যে, কোন বইতে বা শিক্ষকের মুখে সেরূপ পরিষ্কারভাবে কোন বিষয়ের বিবৃতি পেতাম কি না সন্দেহ। তাহাকে সহসা দেখিলে বা তাহার সঙ্গে হঠাৎ কথা কহিলে বোধ হত যে, সে অতি অজ্ঞ বা বোকা, কিন্তু কিছুক্ষণ নিরক্ষীণের পর তাহার গভীরতার দৌড় অনেকটা বুঝিতে পারা যাইত, আর সে যে কেমন অনুধ্যানশীল ও ক্রম-পর তাহা জানিতে পারিতাম। ঐরূপ ছাত্রের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ভাল ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পাঠ্যপুস্তকের আবৃত্তিতে ও পরীক্ষা উত্তরণে বেশ পটু ছিল; কিন্তু তাহাদের কোন একটী বিষয়ে গূঢ় প্রশ্ন করিলে তাহারা অপ্রতিভ হইয়া যাইত, তাহাদের মুখে অনেক কথা শুনিতাম, কিন্তু সেগুলি অতি ঝাপ্সা ও অপরিষ্কার; তাঁহাদের অত বই পড়াতেও যথার্থ ফল দর্শিত না।

যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসে, আমি কিরূপে একজন বালককে মানুষ

করিতে চাই; আমি উত্তর দিই যে, আগে তাহার শরীরের যত্ন কর, মিথ্যা আড়ম্বর না শিখাইয়া তাহাকে প্রথমে স্বাভাবিক শিক্ষা দাও। সে যাহাতে প্রথমে তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সঞ্চালিত করিতে শিখে, যাহাতে সেগুলির উপর তাহার প্রভুত্ব জন্মে, যাহাতে তাহার মন বিকশিত হয়, যাহাতে তাহার হৃদ্বৃত্তিগুলি ভাল আদর্শ ও ভাল দৃষ্টান্ত দ্বারা লালিত হয়, প্রথমে তাহারই জন্য উদ্যুক্ত থাক। স্বভাবকে তাহার একমাত্র শিক্ষক কর, কৃত্রিম সমস্ত জিনিস তাহার নিকট হতে অপসারিত কর, আর যতদিন না তাহার মন আপনা আপনি পুস্তক পাঠের দিকে ধাবিত হয়, ততদিন তাহাকে লেখা পড়া শিখাবার জন্য ব্যস্ত হইও না। বড় হলে সে যাহাতে নিজের সাহায্য নিজে করিতে পারে, যাহাতে নিজের উপর ভর দিয়া চলিতে পারে, সেই উপায়ের সাধনে নিরন্তর বিব্রত থাকিও। তাহাকে বলিবে নিজের অভিজ্ঞতাই যথার্থ অভিজ্ঞতা, কিন্তু মানুষ নিজে সকল অভিজ্ঞতা লভিতে পারে না, এজন্যই পরের অভিজ্ঞতা জানার আবশ্যক, এই জন্যই পরের বাক্য শুনা ও পরের লেখা পড়ার প্রয়োজন; কিন্তু নিজের উপার্জ্জিত জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, এ কথাটীর মর্ম্ম তাহার অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ করিতে কখন অবহেলিও না।

এরূপ উপায় অবলম্বিলে দেখিতে পাবে যে, যুবা অবস্থায় সে বালকের চালচলন সুন্দর ও আত্মাবলম্বী, তাহার স্বভাব খোলা ও অকপট, তাহার বাক্য সরল ও পরিপাটী। তাহার মনে অল্প ভাব, কিন্তু সেগুলি অতি পরিষ্কার; সে পুস্তক অপেক্ষা নিজের অভিজ্ঞতা হতে অধিক জ্ঞান লভিয়াছে; স্বভাবের নিকটেই সে অধিক শিখিয়াছে। সে বোধ হয়, কেবল একটী ভাষায় পারদর্শী হবে, কিন্তু সে যাহা বলে, তাহার মর্ম্ম বিলক্ষণ জানে, আর যাহা বর্ণিতেছে, তাহা নিজে করিতে পারে। নিত্যকর্ম্ম ও চলিত প্রথার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই, পরের প্রভুত্ব ও

দৃষ্টান্ত তাহাকে বিচলিতে পারে না, সে নিজে যাহা ঠিক বুঝে, তাহাই করে। তাহার শরীর উত্তমরূপে ও সম্যক্‌রূপে পরিপুষ্ট; সে দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি ও সকল প্রকার বলসাধ্য ক্রীড়াতে তৎপর ও পটু। তাহার হৃদয় ও চরিত্র সূক্ষ্মরূপে ও উৎকৃষ্টরূপে সুগঠিত; সে সংসারের প্রলোভনকে অনায়াসে নিবারিতে পারিবে, সংসারের বিপদকে আলিঙ্গিতে কখন ভীত হবে না। তাহার মন ও বিবেক দৃঢ়রূপে ও সুন্দররূপে শিক্ষিত; সে এমন বই পড়িবে না, যাহাতে কেবল বিদ্বান্ দেখায়, এমন বস্তু আলোচিবে না, যাহা নিজায়ত্ত করিতে না পারে।

অবশ্য অনেকে বলিবে যে, ঐরূপ শিক্ষা দেওয়া অতি কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু অনেকের নিকটে কি না কঠিন ও দুঃসাধ্য? অনেকে বলিবে যে, ঐরূপ শিক্ষা কখন অনেক ছাত্রকে একসঙ্গে দেওয়া যায় না। আমি বলি যে, শিক্ষকের ঐরূপ শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য উপায় অবলম্বনই যথার্থ কর্ত্তব্য। ইচ্ছা ও যত্ন থাকিলে কি না হয়? আর যদিই বা সমগ্ররূপে একটা কাজ করা যায় না,—কিন্তু যদি তাহা ভাল ও বিধিমত হয়, সেটা যতদূর সাধিতে পারা যায় ততদূর করা,—একটা মূলত মন্দ ব্যবস্থা অনুসারে সেই কাজ করার অপেক্ষা,—অনেক শ্রেয়। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট হইয়াছে, এখন আমি আবার নিজের বৃত্তান্ত লিখি।

ছয় মাসের পর জগদম্বা আবার তাহার পিতার বাড়ী চলিয়া গেল, আমি মন দিয়া নিজের পড়াতেই ব্যস্ত থাকিলাম। আমার ভয় জন্মিয়াছিল যে, এইবার পরীক্ষায় বিফল হব, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ একেবারে অকৃতকার্য্য হই নাই। আমি এক রকমে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম; উহার ফল, যতদূর আশা করিয়াছিলাম, তত ভাল হয় নাই, এজন্য অন্তরে আঘাত পেলাম। কিন্তু মনকে কোনক্রমে সান্ত্বনা

দিয়া আমি অন্য বই পড়িয়া ভুলিয়া থাকিলাম। এই সময়ে আমার আর এক নূতন কষ্টের কারণ উপস্থিত হল। দেখিলাম, ক্রমে আমার মনের শক্তি সকল দুর্ব্বল হইয়া আসিল, আমার হৃদয়ের তেজ হারালাম, আর নানাপ্রকার বিচিত্র চিন্তায় আমার মাথা সময়ে সময়ে ঘুরিয়া পড়িত। ইহার যথার্থ কারণ নির্দ্দেশিতে না পারিয়া এ সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও বলিলাম না। ক্রমে উহা একটা পীড়ায় পরিণত হল, আমি অতি ক্ষীণ হইয়া গেলাম। আমি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতাম, কখন কখন বিনা কারণে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতাম ও কাঁদিতাম। এক একবার ভাবিতাম, কেন প্রাণটা বেরিয়া গেল না; আবার দুর্ব্বল মার প্রাণে কষ্ট দিব বলিয়া বড়ই যন্ত্রণা অনুভবিলাম। আমার আগে মধ্যে মধ্যে ব্যারাম হইয়াছিল, কিন্তু সে অতি সামান্য পীড়া, এবারকার মত কঠোর ভাব ধরে নাই। মা আমার ব্যারামের কথা শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হলেন, পিতা ও আত্মীয় সকলেই আমার জন্য অতি চিন্তিত রহিলেন।

অবশেষে আমি একেবারে পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম, আমার ভয়ঙ্কর জ্বর বিকার উপস্থিত। চিকিৎসক আসিতে লাগিল, আমার নানাপ্রকার পথ্যের বিধান হল। শ্বশুর বাড়ীতে, পাছে তাহারা কাতর হয়, এজন্য আমার পীড়ার সংবাদ কেহ পাঠান নাই। মা-ই আমার যথার্থ সেবা শুশ্রূষা করিতেন, বোনেরাও শ্বশুরবাড়ী থেকে আসিয়া মার সাহায্য করিলেন। পুত্রের জন্য যত যত্ন লইতে হয়, আমার মা আমার জন্য তাহা লইতেন, তিনি নিজের রোগ ভুলিয়া নিরন্তর আমার শুশ্রূষায় বিব্রত থাকিতেন। আঃ, সে সময়ে যদি মার কোলে মাথা দিয়া মৃত্যুকে পেতাম, সে মৃত্যু আমার পক্ষে কি সুখকর হত! সে সময়ে আমি জীবনের অতি অল্প সুখের স্বাদ পাইয়াছিলাম, কিন্তু পৃথিবীর যথার্থ দুঃখ তখনও ভুগি নাই। সংসারের কঠোরতা, মানুষের অবিচার, জীবনের যন্ত্রণা না

সহিয়াই আমার প্রাণ শান্তভাবে এ নশ্বর দেহের নিকট বিদায় লইত! কেবল একটী বেদনা আমার বুকে বাজিত—যাকে একলা ফেলিয়া যাব; কেবল একটী ভাবনা আমার অন্তরে ভাসিত—জগদম্বার কি হবে। যে দিন আমার রোগ অত্যন্ত বাড়িত, মা আমার কাছে দিনরাত বসিয়া আমার শুশ্রূষায় রত থাকিতেন, এক দণ্ডও আমাকে ছাড়িতেন না। রোদনই তখন আমার একমাত্র ওষুধ ও প্রতীকার হইয়াছিল; আমি মার মুখপানে চাহিয়া কাঁদিতাম; তাঁহার কোলে আমার মাথা, তাঁহার হাতে আমার হাত; তিনিও আমার সঙ্গে একভাবে কাঁদিতেন।

যত্ন, শুশ্রূষা, ও অসামান্য ধৈর্য্যের জোরে মা আমাকে যেন এ যাত্রায় বাঁচালেন; কেবল তিনিই যে আমাকে বাঁচাতে পারিতেন, তাহার আর কোন ভুল নাই। চিকিৎসকদের চিকিৎসায় আমার অল্প বিশ্বাস, আত্মীয় জনের সেবা ও স্নেহই আমাদের একমাত্র ওষুধ। মা ও বোনেরা আমার জন্য যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। মা কি অপরূপ বস্তু, স্ত্রীলোক কি মহৎ জিনিস, তাহা আমি বুঝিলাম। রে কঠোর, স্বার্থপর, কৃতঘ্ন পুরুষ! যাহার নিকট হতে তুই প্রথম জীবন পাস্, সহায়হীন অবস্থায় যে তোর একমাত্র সহায়, দুঃখের সময় যে তোকে সান্ত্বনা দেয়, রোগের সময় যাহার যত্ন তোর একমাত্র আশ্রয়, মৃত্যুকালে যার কোলে মাথা দিয়া এ প্রাণ ত্যজিস্—সেই স্ত্রীলোককে তুই এত অপদার্থ ভাবিস্, সেই স্ত্রীলোককে তুই এত অবজ্ঞা করিস্, সেই স্ত্রীলোককে তুই এত পীড়া দিস্!!

ক্রমে আমার রোগের উপশম হতে লাগিল, কিন্তু আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল রহিলাম। আমার জ্বর সারিয়া গেল, কিন্তু শরীরে যুত পেলাম না, আর আমার মাথাও খালি খালি বোধ হতে লাগিল। কয়েক দিন পরে জগদম্বা আমাদের বাড়ী আসিল; সে এখন আমার শুশ্রূষায় মাতার

সমভাগিনী হল। এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেলে চিকিৎসকেরা ও অন্য অপরজন আদেশিলেন যে, আমার পক্ষে বায়ু পরিবর্ত্তন অত্যন্ত আবশ্যক, আর সব পড়া শুনা ছাড়িয়া উত্তর পশ্চিমে গিয়া মাস দুই তিন কাটান আমার একান্ত বিধেয়। অল্পে অল্পে আমি সুস্থ হইয়া আসিতে লাগিলাম, আমার মাথাও অনেক ভাল হল। ঐ সময়ে পিতার একজন আলাপী জয়পুরের মহারাজার নিকট চাকরী করিতে যাইতেছিলেন, তিনি এই উত্তম সুযোগ দেখিয়া ঐ ব্যক্তির সঙ্গে আমার উত্তর পশ্চিমে যাওয়া ঠিক করিলেন। ঐ প্রস্তাবে আমি যারপরনাই আহ্লাদিত হলাম, কিন্তু অনেক দিনের জন্য আত্মীয় জন, বন্ধুবান্ধবদের ছাড়িয়া থাকিব বলিয়া বিষণ্ণও থাকিলাম। অবশেষে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হলে আমি পিতামাতা, স্ত্রী, বন্ধু, অন্যান্য অপর স্বজন ও আলাপী, বিদ্যালয়, ও কলিকাতার নিকট বিদায় লইয়া রাজপুতানার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

একাদশ অধ্যায়।

ভ্রমণ।

পর্য্যটনকালে আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখি নাই, সেজন্য এখন আমার অন্তরে যারপরনাই আক্ষেপ হইয়া থাকে। কি নিজের পায়ে, কি উটের পীঠে, কি কলের গাড়ীতে, কি হাতীর হাওয়াদাতে, দেশ বেড়াবার সময়ে আমার মনে যেরূপ নানাবিধ চিন্তার উদয় হত, তেমন আর কোনও সময়ে হত না। সেকালে, আমি যে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান ও জীবিত, তাহার যেরূপ স্পষ্ট জ্ঞান পেতাম, তেমন আর কোন কালে পেতাম না। ভ্রমণের কি একটা গুন আছে যাহাতে আমাকে সজীব ও সচিন্ত কবিয়া দেয়, যথন স্থিরভাবে থাকি, তথন আমি চিন্তিতে মাত্রই অক্ষম; আমার মনকে সচল করিতে হলে আমার শরীরের নড়ন একান্ত আবশ্যক। মনোহর গ্রাম্য দৃশ্য, রমণীয় বস্তুর পরম্পরা, চারদিকে খোলা বাতাস, মাথার উপর আকাশ, মানুষের অনুপম কীর্ত্তি, স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় শোভা—এই সকল আমার আত্মাকে উচ্ছ্বসিত করে, আমার চিন্তা প্রবল ভাব ধরে, আমি ভাবময় হইয়া যাই। নিজেকে অতি অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া ঐ সকল অপরূপ বিষয়ের আলোচনায় একেবারে মুগ্ধ হইয়া থাকি। আমার হৃদয়, এক বস্তু থেকে আর এক বস্তুতে ধাবিয়া, সেই সমস্ত মনোহারী দ্রব্যের সঙ্গে যেন মিশিয়া যায়, বিচিত্র প্রতিরূপ দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া অতি মধুর রসে আপ্লুত হয়। সে সময়ে সকল দেশকে নিজের দেশ জ্ঞান কারি, সকল মানুষকেই নিজের লোক ভাবি। আহা! যৌবনকালের ভ্রমণ সময়ের সেই সকল ভাব সদ্য সদ্য প্রকাশিলে সে

গুলির বৃত্তান্ত কেমন সতেজ, কেমন নব বর্ণে রঞ্জিত হত! নূতন যৌবনের নূতন ভাবগুলির বিচিত্রতা ও মাহাত্ম্যের ধারণা মাত্র এখন আমার অন্তরে হয় না, কিরূপে সে সকল বর্ণিতে সক্ষম হব? কিরূপেই বা সে মনের বেগ, সে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এখন লিখিব?

কার্ত্তিক মাসে পিতার আলাপী উঁমাচাঁদ বাবু ও আমি একত্র কলিকাতা থেকে রওনা হলাম। এ পর্য্যন্ত কখন বাঙ্গালা ছাড়িয়া যাই নাই; এবারে অনেক দূরে যাব, আলাদা লোক দেখিব, আলাদা ভাষা শুনিব, অনেক বিষয়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা জানিব বলিয়া উৎকট ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া থাকিলাম; ক্রমে আমরা প্রায় বাঙ্গালা দেশের সীমায় আসিয়া পড়িলাম; দেখিলাম প্রকৃতির মুর্ত্তি ক্রমে পূর্ব্বেকার প্রসন্নতা ছাড়িল, জমী সেরূপ নিরন্তর উর্ব্বরা ও সবুজ নয়, ভূমি উঁচুনীচু, মধ্যে মধ্যে পাহাড়, আর ভূভাগ ক্রমে যেন কর্কশ ভাব ধরিতে লাগিল। কিন্তু আবার দেখিলাম যে, মানুষদের আকার ক্রমে ভিন্ন হইয়া আসিল। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা তাহাদের শরীর অধিক সবল ও পরিপুষ্ট; তাহাদের বদনে তেমন বুদ্ধি বা তীক্ষ্ণতার আভা নাই, কিন্তু তাহাদের একটা স্বাভাবিক তেজ ও অমায়িকতা লক্ষিলাম। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির কল্যাণে যাহাদের আমরা চিরকাল 'মেড়া খোট্টা' নাম দিই, তাহাদের দেশে উপস্থিত হলাম। ভাবিলাম যে, ইহাদের মধ্যে যাহার একটু বুদ্ধি বা জ্ঞান আছে, তাহারা বোধ হয়, আমাদের প্রতি 'মেড়া' অপেক্ষা অনেক অধিক ঘৃণাকর উপাধি দেয়। বাঙ্গালাকেই স্বদেশ ভাবিতাম, এখন উত্তর পশ্চিমে পৌঁছিয়া নিজের জন্মস্থান ত্যজিয়া আসিলাম বলিয়া মনে দুঃখ সঞ্চারিল। কিন্তু সে সময়কার সে সঙ্কুচিত জ্ঞান বাঙ্গালার বাহিরে কিছুদিন বাসের পর অন্তর্হিত হল। সমস্ত ভারতবর্ষকে স্বদেশ ভাবিয়া অধিক গৌরব ও অধিক সম্মান অনুভবিলাম।

উমাচাঁদ বাবু মহাশয়ের ইচ্ছা যে, আমি একাক্রমে রাজপুতানায় যাই, পিতারও সেইরূপ আদেশ ছিল, কিন্তু আমার বাল্যকাল অবধিই কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, প্রভৃতি হিন্দুদের চিরস্মরণীয় তীর্থস্থান দেখিবার অত্যন্ত বাঞ্ছা ছিল, আর এমন সুযোগ আর ঘটিবে না, এই কারনে উমাচাঁদ বাবুকে আমি অনেক মিনতি করিয়া অনুরোধিলাম যে, তিনি আমায় ঐ সকল স্থানে আগে লইয়া যান। লোকটি বড় সদয় ও অমায়িক ছিলেন, আমার অতিশয় আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দেখিয়া আমাকে ঐ সকল স্থান অল্প অল্প দেখাবেন বলিয়া সম্মত হলেন।

এইরূপ ঠিক হলে আমরা প্রথমে কাশীতে পৌঁছিলাম ও সেখানে এক সপ্তাহ থাকিয়া উহার সমস্ত দৃশ্য যথাসাধ্য দেখিলাম। কাশী বর্ণিবার আমার কোন আবশ্যক নাই। কেই বা সেই পবিত্রধাম দেখে নাই? দুর্গাবাড়ী ও তাহার বাঁদররাশি হতে রামনগর ও তাহার গড় পর্য্যন্ত কে না কাশীর সমস্ত কথা জানে? এ জন্মে অনেক নূতন জিনিস দেখিয়াছি, কিন্তু কাশীর ভোরের বেলার দৃশ্য কখন আমার মন থেকে লোপ পাবে না। তোমার ঘুম না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বিছানায় শুইয়া শুনিতে পাবে, নীচে রাস্তায় লোকের পায়ের ধ্বনি হতেছে, সকলেই গঙ্গাস্নান করিতে যেতেছে। কেহ বা সুমধুর স্বরে গাইতেছে, কেহ বা সতেজ শব্দে চীৎকার করিতেছে। চার দিক থেকে 'হর হর,' 'বম্ বম্', 'জয় সীতারাম,' 'রামলক্ষ্মণ কী জয়, "বোলো বেটা আত্মারাম' প্রভৃতি উচ্চ ধ্বনি তোমার কাণে লাগিতেছে—এই সকল শুনিয়া তোমার অন্তর এক অপূর্ব্ব রসে পরিপ্লুত হয়, তুমি উঠিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত হও। গঙ্গার ঘাটে গিয়া চার দিক নিরখিলে তোমার মন কিছু-ক্ষণের জন্য এক গম্ভীরভাবে আচ্ছন্ন থাকে। কতকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া আবার চারদিকে চাহিয়া দেখ—মঙ্গলময়ী গঙ্গা কল কল রবে

বহিতেছে, স্ত্রী, পুরুষ, রাশি রাশি লোক তাহার তীরে পউস্থিত, কেহ বা জলে, কেহ বা স্থলে; কেহ বা নাইতেছে, কেহ বা গা মুছিতেছে; কেহ বা ধ্যানে মগ্ন, কেহ বা গল্পে রত: কেহ বা তাহার ছেলেকে ডাকিতেছে, কেহ বা তাহার পাখী পড়াইতেছে; কোথাও নানা বর্ণের ফল, কোথাও নানা প্রকারের পাতা—আর সকলেতেই যেন এক পরম পবিত্র ভাব; তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুমি ভাবময় হইয়া যাইবে! উপরে দেখ, সিঁড়ির উপর সিঁড়ি—সিঁড়ি আর ফুরায় না, তার উপর মানুষ উঠিতেছে, নামিতেছে, বসিয়া আছে, যত উপরে দেখ, তত লোকগুলি ছোট বোধ হবে। তার পর বাড়ী, রাস্তা, আরো দূরে মন্দির, মন্দিরের চূড়া, সকলকে অতিক্রমিয়া বেণীমাধবের ধ্বজা বিরাজমান রহিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিয়া কাহার মন না বিচলিত হয়? কোন্ হিন্দুর হৃদয় না পবিত্র-রসে পরিপ্লুত হয়? কোন্ ভারতবাসীর অন্তরে না পূর্ব্ব-গৌরব ও পূর্ব্ব-মাহাত্ম্যের কথা জাগিয়া উঠে?

কাশী ছাড়িয়া আমরা আলাহাবাদে পৌঁছিলাম; সেখানে একদিন মাত্র থাকিয়া গঙ্গাযমুনার সঙ্গম দেখিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। শাহজাহানের রাজধানীতে আমরা প্রায় এক সপ্তাহ থাকিলাম। মুসলমান সম্রাটদের কীর্ত্তি সকল দেখিলাম। আমি যে অতি যত্ন ও আগ্রহের সঙ্গে ইতিহাস পড়িতাম, এখন তাহার যথার্থ সুখ পেলাম। এক একটী অট্টালিকা দেখিয়া কত পূর্ব্বেকার কথা মনে আসিল, প্রত্যেকটীতে কত বাস্তব ইতিহাস লেখা রহিয়াছে, জানিতে পারিলাম। তাজমহলের মত সুন্দর অট্টালিকা পৃথিবীতে আর কোথাও নাই, যে উহা দেখিয়াছে, সেই উহার সৌন্দর্য্য বুঝে, লিখিয়া বা কহিয়া কেহ কখন অন্যের মনে উহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পারে না। তাজমহল যতবার দেখিতাম, তত আরো দেখিতে ইচ্ছা যাইত। যত নূতনরূপে দেখিতাম, যত সূক্ষ্ম-

ভাবে দেখিতাম, তত উহার চমৎকারিতা আমার অধিক হৃদয়ঙ্গম হত। তাজমহল মানুষের বুদ্ধি, কৌশল, ও চাতুর্য্যের অক্ষয় কীর্ত্তি; মোগল-সম্রাটদের ঐশ্বর্য্য, গৌরব ও প্রতাপের অদ্বিতীয় পরিচায়ক। কিন্তু উহাই আবার মুসলমানদের বিলাস, ভোগপ্রিয়তা, ও যথেচ্ছাচারের পরিচয় দিতেছে; উহাই আবার হিন্দুদের অবনতি, দাসত্ব, মানহীনতার জাজ্বল্যমান চিহ্নস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। একজন স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের মিথ্যাভিমান পরিতৃপ্ত করিবার জন্য কত লোক অনিচ্ছায় বা বিনা বেতনে ক্রীতদাসের মত খাটিয়াছে; ঐ ভবন গড়িতে কত লোক প্রাণ হারাইয়াছে! কাশীতে রাশি রাশি মন্দিরের মধ্যেও মস্‌জিদ দেখিয়াছিলাম, আগ্রাতে কিন্তু মন্দিরের নামও নাই, আর মুসলমানদের এই আধুনিক আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রভৃতি অতি প্রাচীন পবিত্র হিন্দু নগরের মাঝখানে অবস্থিত থাকিয়া হিন্দুনামে দুরপনেয় লাঞ্ছনা দিতেছে। গৌরবের মধ্যে এত অগৌরব!

আগ্রা থেকে আমরা একদিন যমুনাতীরে মথুরা নগর দর্শনে গেলাম। মথুরা নগরটী বড় ছোট ও কদর্য্য, কিন্তু উহা শ্রীকৃষ্ণের ধাম বলিয়া হিন্দু-দের অতিশয় পবিত্র ও আদরের স্থান। যমুনাতীরে মন্দিরের মধ্যে সন্ধ্যার সময়কার দেবপূজা আমার কাছে অতি বিচিত্র ও রমণীয় বোধ হইয়াছিল। স্ত্রীপুরুষ সকলেই অবাধে একভাবে আরাধিতেছে, গাই-তেছে, নাচিতেছে। স্ত্রীলোকদের শিষ্টাচার ও পরিচ্ছদ আর পুরুষদের বিনীত ব্যবহার ও চালচলন দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। পশ্চিমে আসিয়া অবধি যেমন সেখানকার পুরুষরা আমাদের হতে অনেক বিষয়ে ভিন্ন দেখিতাম, সেইরূপ হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক প্রভেদ আমার নয়নগোচর হত। হিন্দুস্থানী স্ত্রীদের লজ্জা ও বিনয় বেশী, তাহাদের স্বাধীনতা বাঙ্গালী স্ত্রীদের অপেক্ষা অনেক

অধিক ; তাহারা অত্যন্ত শিয়ানা বা চতুর না হলেও তাহাদের আন্তরিক গুণ দৃঢ় ও নিরেট বোধ হত ; আর তাহারা অশিক্ষিত হলেও তাহাদের অঙ্গে বলিষ্ঠতার ও বদনে তেজের বিলক্ষণ পরিচয় পেতাম। সেখানে পুরুষেরাও স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বেশী ভক্তি ও মান্যভাবে ব্যবহার করে, তাহাদের একেবারে পশুর বা পুতুলের মত কখনই ভাবে না। এ সকল প্রভেদ আমার মনে বড় লাগিত, ভাবিতাম এক হিন্দুজাতি থেকে উৎপন্ন হইয়া আমাদের মধ্যে এত বিভিন্নতা কেন ?

মথুরা হতে বৃন্দাবনে গেলাম। রাজা মানসিংহ দ্বারা স্থাপিত প্রসিদ্ধ গোবিন্দদেবের মন্দির, যমুনাতীরে মদনমোহনের মন্দির, কুঞ্জবন, প্রভৃতি ধর্ম্মস্থান সকল দেখিলাম। এখানে সেঠরা অধুনা এক মন্দির গড়িয়াছে, তাহাতে পঁচিশ লাক টাকা খরচ হইয়াছিল। বাস্তবিক এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার বোধ হল যে, হিন্দুদের ধর্ম্মস্থানগুলি দেখিলেই তাহাদের যথার্থ সমৃদ্ধি ও গৌরব বুঝা যায় ; ধর্ম্মানুষ্ঠানই তাহাদের প্রাণ, ধর্ম্মচর্য্যাই তাহাদের একমাত্র ব্রত ছিল। যবনেরা আসিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের আধিপত্য না ভাঙ্গিলে আমরা এখনও সেই প্রাচীনভাবে কেবল ধর্ম্মরত ও ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতাম। বিখ্যাত বীরনারী অহল্যা বাই নিজের বীরকীর্ত্তিতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া বৃন্দাবনে এক চমৎকার কুণ্ড নির্ম্মাইয়া নিজের ধর্ম্মকীর্ত্তি স্থাপিয়া গিয়াছেন।

ঐ সকল তীর্থস্থান দেখা হলে আমরা রাজপুতদের দেশে চলিলাম ও অবশেষে আমাদের নিরূপিত স্থান জয়পুর নগরে আসিয়া পৌঁছিলাম। জয়পুর আসিবামাত্র একটী বিষয় সর্ব্বদা আমার মনে হত। দেখিলাম এখানকার লোকেরা বেশী হৃষ্টপুষ্ট, তাহাদের বদনে অধিক তেজের প্রকাশ, পশ্চিমে পর্য্যন্তও লোকের মুখচ্ছবিতে যে একটা হীন নম্রতা দেখিতাম, রাজপুতদের বদনে সে চিহ্ন আছে কি না সন্দেহ। ইহারা

স্বাভাবিক অভিমানী, দেখিলেই বোধ হয় নিজ জাতির গৌরবে বিলক্ষণ সগর্ব্ব, ইহারা বেশী জোরে কথা কহে উঁচুদিকে চায়, রাস্তায় বাহু বেশী হেলাইয়া দুলাইয়া চলে। বাঙ্গালার অপেক্ষা পশ্চিমের নগরের ভিতর লোকের কথাবার্ত্তা অধিক শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু জয়পুরে আর এক নূতন প্রকারের ধ্বনি আমার কর্ণ গোচর হত। সমস্ত নগর থেকে যেন হর্ষ ও উল্লাসের রব শুনিতে পেতাম। আগে যে সব নগর দেখিয়াছিলাম, সে সকলের অপেক্ষা জয়পুরকে অধিক সজীব ও জাগ্রত দেখিলাম।

দিন কতক থাকিবার পর আমি একলা নগরের চারদিক প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াতাম। রাস্তাগুলি বেশ চওড়া, পরিষ্কার, ও পরিপাটী; অনেক রাস্তার দুধারে হাঁটিয়া চলিবার পা-পথ, আর দুপাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাড়ীগুলির অতি চমৎকার বাহার, তাহাদের বাহির দিক নানা রকম রঙে রঙাল, কত প্রকার ফুল চিত্র কাটা রহিয়াছে। বাস্তবিক জয়পুরের রাজার বাড়ীর 'সুমুখের' রাস্তার মত সুন্দর, মনোহর রাজপথ আর কোথাও দেখি নাই, সে রাস্তায় আমি কতদিন কতবার বিচরিতাম, তবুও কখন ক্লান্ত হতাম না। নগরটা বেশী প্রশস্ত নয়, প্রায় আধঘণ্টা চলিলে উহার বাহিরে গিয়া পড়িবে। উহার চারদিকে প্রাচীর, তাহাতে সাতটা বড় দরজা; দূরান্তরে কামানের জন্য বপ্র বলভী প্রস্তুত হইয়াছে, আর বন্দুক চালাবার জন্য প্রাচীরের প্রায় সমস্ত ভাগেই ছোট ছোট ফাঁক দেখা যাইতেছে। নগরের বাহিরে যাও, দেখিবে, উহার প্রায় সকলদিকেই ছোট ছোট পাহাড়, আর তাহাদের উপর এক এক গড়; সেই গড়গুলি নগরের পাহারা দিতেছে। নগরের মধ্যভাগে মহারাজার উদ্যানবিশিষ্ট প্রাসাদ, রাজবাড়ীর শোভায় চারদিক একেবারে আলো হইয়াছে। কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ

রাজপ্রাসাদ একাই নগরের সাতভাগের এক ভাগ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; দেখিলেই জানা যায়, আমাদের দেশের জন কতক রাজা ও নবাবই সব, অন্য লোকেরা তাঁহাদের আজ্ঞাকারী মাত্র।

উমাচাঁদ বাবু ও আমি এক সঙ্গে থাকিতাম; তিনি আমাকে রাজপুতদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ দিতেন, আর আমিও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াতাম ও তাহারা পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা নিরীক্ষিতাম। কিন্তু কয়েক দিন পরে এরূপ ঘুরন্ত জীবনে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, আর তখন অগ্রাণ মাস, এর মধ্যেই সকালে ও সন্ধ্যার সময় ভয়ঙ্কর শীত। সকালে ঐ সময়ে কোন কোন দিন রাস্তা মাঠ বড় শক্ত দেখিতাম, কোন কোন স্থানে সব শাদা হইয়াছে, দূর থেকে মনে করিবে, যেন একখানা পাতলা চাদর ঘাসের উপর বিছান রহিয়াছে। উহাকে 'পালা' পড়া বলে। যেদিন অতিরিক্ত শীত হয়, সেদিন ঠাণ্ডায় শিশির বা গুঁড়ি গুঁড়ি জল জমিয়া ঐরূপ শাদা ভাব ধরে; কোথাও কোথাও পালা পড়া জমী ইটের মত শক্ত হইয়া যায়, তাহাতে কোদাল পাড়া পর্য্যন্ত ভার। দিনে দুপর বেলা রৌদ্র বেশ মিষ্ট লাগিত, কিন্তু ভোরে বা সন্ধ্যার সময় ঘর হতে বেরুন বড় দায়, এই কারণে আমার হাতে তখন অনেক সময় থাকিত। আমার সঙ্গে কলিকাতা হতে বই লইয়া আসা বারণ ছিল, কিন্তু তবুও আমি রাজওয়াড়া সম্বন্ধে ও আর আর খান কয়েক বই যোগাড় করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই মনোযোগে পড়িতাম। রাজপুতদের সঙ্গে কথা কহিতে পারিতাম না বলিয়া আমার মনে বড় ক্ষোভ জন্মিল, আমি এ সম্বন্ধে উমাচাঁদ বাবুকে জানানতে, তিনি সানুগ্রহে আমার জন্য একজন রাজপুতকে নিয়োজিলেন। ঐ রাজপুতজী আমাকে হিন্দী, বিশেষ তাঁহাদের প্রদেশে প্রচলিত হিন্দী, শিখাতে লাগিলেন। আমার সংস্কৃত জানার দরুণ অনেক

হিন্দী কথা সহজে বুঝিতে পারিতাম, শীঘ্রই ঐ ভাষাতে আমার কিছু অধিকার হল।

রাজপুতজীকে দেখিবামাত্র তাঁর প্রতি আমার ভক্তি জন্মিল। লোকটী দেখিতে অতি সুপুরুষ, প্রায় সাড়ে চার বা পাঁচ হাত লম্বা; অঙ্গ, অবয়ব অতিশয় পরিপুষ্ট, অতি চওড়া বুক, সুদৃঢ় বাহু; বদনে অভিমান ও তেজের স্পষ্ট আভা; চোক বড় ও উজ্জ্বল, কপাল প্রশস্ত, নাক দীর্ঘ ও তার আগা ঈষৎ বাঁকান। তাঁর পরিচ্ছদ অতি ভদ্র ও পরিপাটী, মাথায় এক লাল পাগড়ী, তার ঘুরান ফেরানতে একটা চমৎকারিতা আছে। তাঁর চালচলন অতি ভব্য ও সুসভ্য, তাঁর কথাবার্ত্তায় সরলতা ও তেজের বিশেষ লক্ষণ, তাঁর ব্যবহার অতি শিষ্ট ও সুমার্জ্জিত। তাঁহার সঙ্গে পড়া ছাড়া নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতাম, সকলই তিনি অতি সরল ও অকপটভাবে বলিতেন, তাঁহাতে মিথ্যা কথা বা মিথ্যা ব্যবহারের লেশ মাত্রও দেখিতাম না।

সপ্তাহ কয়েক পরে রাজপুতজী আমাকে বলিলেন—যদি হিন্দীই শিখিতেছ, তবে চান্দের কবিতা পড়, আমাদের ভাষায় চান্দের অপেক্ষা ভাল কবি নাই; সংস্কৃতে যেমন রামায়ণের আদর, আমরা চান্দের কবিতার সেইরূপ সম্ভ্রম করিয়া থাকি। চান্দই এখন আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ, উপদেশগ্রন্থ, ও নীতিগ্রন্থ; এমন একজন শিক্ষিত রাজপুত নাই যে, প্রায় রোজ চান্দের শ্লোক না পড়ে; ধনী বা গরীব, পণ্ডিত বা মুর্খ রাজওয়াড়ায় এমন একজন লোক নাই যে, চান্দের রচনা পড়িবার বা শুনিবার জন্য কাতর না হয়; আর রাজস্থানে এমন কোন ভদ্রলোক নাই, যার পূর্ব্বপুরুষদের গৌরব ও মহিমার কথা ঐ পুস্তকে বর্ণিত নাই।—আমি তাঁর কথায় চান্দের বই পড়িতে লাগিলাম। উহা কতকটা পড়িয়া ও এদিক ওদিক দেখিয়া বুঝিলাম যে, চান্দ পৃথ্বিরাজের সমকালীন ছিলেন, পৃথ্বিরাজ ও তাঁর

সময়ের অন্যান্য হিন্দু বীরদের বৃত্তান্ত ঐ বইতে অতি সরল ও সুন্দর রূপে বিবৃত আছে। দেখিলাম, উহাতে প্রায় সমস্তই বাস্তবিক ঘটনার উল্লেখ আর উহাতে সেকালের আর্য্যদের ইতিহাস, সংস্কার, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সবিশেষ জানা যায়।

রাজপুতজী চান্দ পড়িতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, আর তিনি যখনই উহা পড়িতেন, তাঁর বদনে এক উজ্জ্বল আভা স্ফূরিত, তাঁর চোক জ্বলিতে থাকিত, তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হত। বাল্যকালে কলিকাতায় দরওয়ানদের সুরটানা পড়া শুনিতে আমার বড় ভাল লাগিত, কিন্তু ঐ রাজপুতজীর পড়ার কাছে তাহা অতি তুচ্ছ ভাবিলাম। আমি অনেক সময়ে ঐ বইয়ের বাক্যার্থ গ্রহিতে সক্ষম হতাম না, কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমি উহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিতাম। শৈশবে রামায়ণ পড়িয়া আমার মন যেরূপ না উত্তেজিত হত, এখন তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে আমি উচ্ছ্বসিত হতাম। আর তাঁর পড়ায় একটা কি মিষ্টতা ও কি হৃদয়গ্রাহিতা ছিল যে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমারও হৃদয় বিবিধ রসে পরিপ্লুত থাকিত। একজন বীর-পুরুষের মুখে নিজের লোকের লেখা নিজেদের পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবের কাহিনী শুনা যে কি পর্য্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী, কি পর্য্যন্ত হৃদয়উত্তেজক, তাহা ঐ সময়েই বুঝিলাম। হায় রে বাঙ্গালী জীবন! আমাদের কোন্ পূর্ব্বপুরুষের ঐরূপ বীরকথা কোন্ কবি লিখিয়া গিয়াছেন! আমরা ছেলেবেলা অবধিই বিদেশীয় ভাষায় বিদেশীর লেখা বিদেশীয়দের কীর্ত্তি ও নিজেদের অপযশ পড়িয়া থাকি; আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই নিজেদের কলঙ্ক বুকে ধরিতে শিখি!

রাজপুতেরা অল্প বয়স থেকেই নিজ বংশের কীর্ত্তি ও গৌরবের আখ্যানে অভ্যস্ত হয়, পরম্পরাগত বীরপুরুষদের বীরকাহিনী শ্রবণে উহাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত থাকে, উহারা নিজ বংশের অদ্ভুত ও অসংসাহসিক

ক্রিয়াতে সগর্ব্ব ও সাভিমানী হতে শিখে। বাস্তবিক রাজপুতদের মত বিখ্যাত ও উদার বংশ আর পৃথিবীতে কোথাও নাই। ইহাদের দেখিলেই বোধ হয় যে, ইহারাই যথার্থ রাম, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জ্জুনের পরপুরুষ। ক্ষমতাভ্রষ্ট, বৃহৎ রাজ্যচ্যুত, নিজেদের স্বাভাবিক প্রতাপ, ও জন্মোচিত সম্ভ্রম-বিরহিত হইয়াও রাজপুতেরা আপনাদের সমুজ্জল ও রাজবংশে উদ্ভবের জ্ঞানজনিত উন্নত চাল ও অভিমানের বিন্দুমাত্রও বিসর্জ্জন করে নাই। প্রসিদ্ধ, প্রতাপবান, বিজেতা মোগল সম্রাটেরা ইহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে সমুৎসুক ছিলেন, আর নিজহাতে রাজপুতদের চরিত লিখিয়া আপনাদের সম্মানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন। যদিও ইঁহারা বিধর্ম্মীদের সঙ্গে কন্যাদের বিবাহ দিয়া পবিত্র বংশকে কলুষিয়াছেন, তবু জাহাঙ্গীর, সাজাহান, আরংজীব, প্রভৃতি বিখ্যাত মোগল সম্রাটেরা রাজপুতনারীদেরই গর্ভে জন্মিয়াছিলেন— বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত আর কোন্ দেশে দেখা যায়? সে বিজেতারা চলিয়া গেল, তাহাদের বংশ লোপ পাইল, তাহাদের পর কত নূতন বংশের অবসান হল, কত নূতন রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপিত হল, কিন্তু সে রাজপুতবংশ চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—ইহার দৃষ্টান্তই বা আর কোন্ দেশে পাওয়া যায়?

একদিন উমাচাঁদ বাবু নগরের বাহিরে একজন প্রাচীন ধরণের ঠাকুরের বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণের যোগাড় করিলেন। আমি ইহা শুনিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হলাম। আমার বরাবরই ইচ্ছা ছিল যে, কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে কোন উৎসব দেখি, আর শুনিয়াছিলাম যে, জয়পুরে ইংরেজী গ্যাসের আলোর সঙ্গে নূতন রীতিনীতির আবির্ভাব হইয়াছে, এজন্য ঐ পুরাণ চালের লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে নিজেকে অতিশয় ভাগ্যবান ভাবিলাম। এখন ঐ সম্বন্ধে সমস্ত কথা আমার স্মরণ

নাই, যাহা এখনও আমার মনে পড়ে, তাহাই লিখিতেছি। আমরা ঠাকুর-জীর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম, তাঁহার বৈঠকখানায় অনেক লোকের সমাগম; তিনি নিমন্ত্রিতদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিতেছেন, আর 'মাধবরা পিয়ালা' অর্থাৎ এক প্রকার মাদক পানীয় দ্বারা তাঁহাদের সম্ভাষিতেছেন। আমরা একপাশে বসিলাম, চারদিকে গল্পের শব্দ, সকলেই পরস্পর কিম্বা ঠাকুরজীর সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা করিতেছে। ঘরের মেজেতে ভাল গালিচা ও জাজিম পাতা, চারদিকে অনেক তাকিয়া, ঘরের ছাদ ও দেয়ালে নানা রকম ফুল ও চিত্র কাটা আর সোণালি করা, সকল দেয়ালে অতি বড় চমৎকার দর্পণ খাটান, আর মধ্যে মধ্যে অতি মনোহর মর্ম্মর পাথরের থাম দাঁড়াইয়া আছে। ঘরে অনেক প্রকার বাদ্য যন্ত্র দেখিলাম, কেহ কেহ তাহা বাজাইতে যাইতেছে, আর এদিকে পরিচারকেরা মাঝে মাঝে পান ও ছোট পিয়ালা করিয়া অমলপানী অর্থাৎ আফীন পানা অভ্যাগত-দের সামনে ধরিতেছে। সেকালের রাজপুতেরা অতিশয় আফীনভক্ত, তাহাদের আহার, ভোজ বা কাহারও অভ্যর্থনা, বিনা আফীনে কখন সম্পন্ন হয় না। আজকাল এ সর্ব্বনাশক প্রথা কিছু কিছু কমিয়া আসি-য়াছে, কিন্তু এ কুঅভ্যাস আসলে প্রায় তেমনিই রহিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যদের এ মন্দ রীতি ছিল না, ইহা রাজপুতদের নূতন সৃষ্টি।

কতকক্ষণ পরে কয়েকজন গাইয়ে ও বাজিয়ে তাঁহাদের ঔৎকর্ষ্যের পরিচয় দিলেন। দেখিলাম, ঠাকুরজী নিজে সঙ্গীতে বিলক্ষণ পটু, তিনি এক তাম্বুরা লইয়া অতি সুন্দররূপে কঠিন রাগ ও রাগিণী ভাঁজিলেন। তার পরে কেহ বা গাইল, কেহ বা তান ঝাড়িল, কেহ বা টপ্পা ধরিল। সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া এক প্রাণে গানবাজনা শুনিতেছিল; তাহাদের বদনে হর্ষ, উল্লাসাদির লক্ষণ দেখিলাম, অনেকে বাহ্যিক ভাব-ভঙ্গীতে মনের ভাব প্রকাশিতে লাগিল। রাজপুতেরা অতিশয় সঙ্গীত-

প্রিয়; বোধ, হয় এমন কোন রাজপুত নাই যে বাজাতে বা গাইতে জানে না। তাদের ছোট গানে ও টপ্পায় একটা অতি মধুর সরলতা আছে, তাদের প্রায় সব. গানেই তেজ, বল, ও সাহসের কথা। রাজপুতেরা শৈশবে পিতা মাতার কাছে তেজ, বল, ও সাহসের কথা শুনে; কৈশোরে তেজ, বল ও সাহসের কথা পড়ে; যৌবনে তেজ, বল, ও সাহসের কাজ করে। তাহাদের ক্রীড়ায় তেজ, বল, ও সাহসের আবশ্যক; তাহাদের আমোদ প্রমোদে পর্য্যন্ত তেজ, বল, ও সাহসের দরকার। কিছুক্ষণ পরে একজন চারণ—বাঙ্গালায় কথক বা গায়কের মত—ঠাকুরের নিজকুলের কিম্বা বড় বড় রাজপুত বীরদের চরিত গানের সুরে কহিতে আরম্ভিলেন। সকলেই নিস্পন্দভাবে অতি মনোযোগের সঙ্গে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। কেহ বা ওয়া ওয়া বলিয়া কেহ মাথা টলাইয়া কেহ বা হাত নাড়াইয়া, কেহ বা জোরে গোঁফ পাকাইয়া প্রতি কথায় নিজেদের আনন্দ বা বিরক্তি দেখাইল।

চারণের কথা শেষ হলে পর আমরা ঠাকুরজীর শস্ত্রখানা দেখিতে গেলাম। সেখানে তরওয়াল, বন্দুক, শড়কী, বর্ষা, খাঁড়া, ধনুক, প্রভৃতি কত রকম শস্ত্র সাজান রহিয়াছে। ঠাকুরজী এ সকলের অতিশয় যত্ন লন, আর রোজ অনেক সময় ঐ শস্ত্রখানায় কাটান। শিকার করা, তরওয়াল খেলা, ও বন্দুক ছোঁড়া ইত্যাদি সকলপ্রকার শস্ত্র ব্যবহারের কার্য্যে রাজপুতেরা অত্যন্ত পটু ও অনুরক্ত। আমাদের বিদায় লইবার সময় আসিল, আমরা আহারের পর গিয়াছিলাম, সেজন্য সেখানে ও সম্বন্ধে কোন চর্চ্চা হয় নাই; ঠাকুরজী রাজপুত রীতি অনুসারে নিজ হাতে পান ও আতর দিয়া অতি ভদ্রভাবে আমাদের বিদায় দিলেন।

আমি জয়পুরে প্রায় দুইমাস রহিলাম, আমার শরীর বেশ সুস্থ হইয়া আসিল, আর রাজপুতজীর কাছে যে সকল বীরত্বের কথা শুনিতাম,

তাহাতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া অন্য সকল জিনিস ভুলিয়া গিয়া কেবল রাজপুতদের গৌরব ও মাহাত্ম্যের আলোচনায় বিব্রত থাকিতাম। তিনি আমাকে ক্রমাগত বলিতেন—কেবল জয়পুরে থাকিলে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের যথার্থ কীর্ত্তি কিছুই বুঝিতে পারিবে না, মেওয়াড়ে যাও, দেখিবে, প্রতি পাহাড়ে, প্রতি গুহায়, প্রতি পাথরে আমাদের বীরত্ব ও মহিমা লেখা আছে। উদয়পুর আমাদের বংশের আলো, উদয়পুর আমাদের মর্য্যাদা রাখিয়াছে, যতদিন এ পৃথিবী ঘুরিবে, ততদিন উদয়-পুর অস্ত যাইবে না—সেই উদয়পুর রাজ্যের অক্ষয় যশের কীর্ত্তিস্তম্ভ, বীররক্তময় স্থানগুলি যদি না দেখ, তাহলে তোমার জন্মই বৃথা।—আমি পূর্ব্বে মেওয়াড়ের বৃত্তান্ত অনেক জানিতাম, কিন্তু রাজপুতজীর ঐরূপ তড়িৎময় বাক্যে আমার অন্তরে আগুন লাগিয়া গেল, আমি নিজ মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, পিতার অভিমত হউক আর নাই হউক, ভিক্ষায় জীবন ধরিতে হউক বা অনাহারে প্রাণ ত্যজিতে হউক, মেওয়াড় না দেখিয়া কথন কলিকাতায় ফিরিব না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ও উমাচাঁদ বাবুর সঙ্গে পরামর্শিয়া অনেক অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক চিঠী দ্বারা পিতাকে আমার প্রার্থনা জানালাম। আমার অন্তরে কত প্রকার শঙ্কা উপস্থিত হল, ভাবিলাম, এর মধ্যেই দুই মাসের উপর কলিকাতা ছাড়া হইয়াছি, অনেক সময় ও টাকা নষ্ট করি-তেছি, আর বাড়ীতে পিতামাতা, স্ত্রী, প্রভৃতি সকলে আমার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন। এইরূপ আন্দোলিত মনে কয়েক দিন অতি কষ্টে যাপিলাম, পরে পিতার নিকট হতে এক পত্র আসিল। তিনি অনেক উপদেশ ও তিরস্কারের পর লিখিলেন যে, যদি মেওয়াড় দর্শনে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হলে তিনি অগত্যা কিছু টাকা পাঠাবেন, কিন্তু যাহাতে আমি অতি অল্পে সারি ও

শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া যাই, ইহার জন্য বিশেষরূপে আদেশিলেন। আমি এ সংবাদ পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হলাম ও ভাবিলাম যে, উপদেশ বা তিরস্কার কেন, আমি সকলই সহিতে প্রস্তুত, পিতা যে কোনক্রমে আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন, তাহাতেই নিজেকে অতিশয় চরিতার্থ বুঝিলাম, আর তাঁহাকে মনে মনে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। পিতার পত্রে জানিলাম যে, বাড়ীর সকলে ভাল আছেন, মা তখন বেশ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ ছিলেন, আর অন্য সকল দিকে খবর ভাল। আমার আহ্লাদের সীমা রহিল না। কিছুদিন পরে আমার স্ত্রীর নিকট হতে চিঠী পাইয়া তার সমস্ত কুশল বার্ত্তা শুনিলাম। আর একটী বিশেষ সংবাদ পাইলাম যে, আমার জগদম্বা কয়েক মাসের মধ্যে একটী ছোট হুঁতোরাম পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ করাবে। এ খবরে প্রথমে আহ্লাদ কি দুঃখ হইয়াছিল মনে নাই, কিন্তু পরে ভাবিলাম, বেশ ত এবার হুঁতোরামের বংশ রক্ষা হবে, আর এ পাগলের নাম পৃথিবীতে বজায় থাকিবে, তাহাতে ভাল বই মন্দ কি? এই বিবেচনায় শীঘ্র পুত্রলাভের প্রত্যাশায় আমার মনে আনন্দ সঞ্চারিল।

এইরূপে সকল দিকের কুশল সংবাদে উল্লাসিত হইয়া আমি জয়পুর থেকে বিদায় লইবার ব্যবস্থা করিলাম। উমাচাঁদ বাবু আমার সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হলেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে, রাজপুতজীও আমার সঙ্গে যান। তিনি জয়পুর ছাড়িতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার আলাপী একজন মেওয়াড়ী ভদ্রলোক সেই সময়ে নিজদেশে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমাদের যাইতে উপদেশ দিলেন। আমরা সেই মেওয়াড়ীর সঙ্গেই জয়পুর থেকে বেরুলাম।

আমরা কতক হাতীর উপরে, কতক ডুলীতে করিয়া চলিলাম। আম্বের বা জয়পুর রাজ্য প্রায় সমতল ও উর্ব্বরা, ইহাতে পাহাড় পর্ব্বতের অধিক অভাব নাই, আর এখানকার স্বাভাবিক দৃশ্য তেমন উৎকৃষ্ট বা

মহিমাময় নয়। ক্রমে আমরা যত দক্ষিণে যাইতে লাগিলাম, ভূমি উঁচু নীচু দেখিলাম, ক্রমে অধিক পাহাড় ও পর্ব্বত আমাদের দৃষ্টিগোচর হল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য লক্ষিতে লক্ষিতে অবশেষে আমরা মেওয়াড় রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম। মেওয়াড়ের জমী স্পর্শমাত্র আমার অন্তর কেমন এক অপূর্ব্ব ভক্তি ও শ্রদ্ধারসে আর্দ্র হল। ভাবিলাম, বাল্যকাল অবধি যে চিতোর, পদ্মিনী, জয়মল, ও হলদীঘাটের বৃত্তান্ত পাঠে আমি চমকিত থাকিতাম, যে মেওয়াড় চিরকাল হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র, দুর্দ্ধর্ষ আদর্শ স্বরূপ, যে মেওয়াড় নিজের বিপদ হতে উদ্ধারের নিমিত্ত মানমর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিয়া যবনের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপিয়া কখন আপনার রাজ-বংশকে কলুষিত করে নাই, যে মেওয়াড়ের রাজারা ও প্রজারা সমানে স্বদেশের মান, ধর্ম্ম, ও স্বতন্ত্রতা রক্ষার নিমিত্ত অক্ষুব্ধভাবে সমস্ত প্রদেশকে নিজেদের রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছে—আজ আমি সেই মেওয়াড় দেশে উপস্থিত। মেওয়াড়ের মাটীতে পা দিবামাত্র আপনা আপনিই আমার মাথা হেঁট হইয়া আসিল, আমার শরীর সুমুখে ঝাঁকিয়া পড়িল, আমি যেন ভূমিষ্ট হইয়া মেওয়াড়ের যশ, কীর্ত্তি, ও গৌরবকে প্রণাম করিলাম।

চারদিকে পাহাড় ও উঁচুনীচু ভূমির মধ্য দিয়া গিয়া আমরা চিতোরের অভিমুখে অগ্রসর হলাম। বানাস নামে এক ছোট নদী পারিয়া অবশেষে চিতোরের অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রসিদ্ধ শিশোদিয়া রাজপুতদের রাজধানীর যত সমীপবর্ত্তী হলাম, তত আমার হৃদয় সজোরে বাজিতে লাগিল। নগরটী অতি উঁচু পাহাড়ের উপর, চারদিকে মহা প্রাকার। দূর হতে তার বিকটাকার কাঙ্গরাগুলি এখনও পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দিতেছে; মনে হল, যেন ঐ সকল রন্ধ্রে এখনও আর্য্যবীরেরা সসজ্জে নীচে যবনদের সৈন্যব্যূহ ধ্বংসিতে উদ্যত হইতেছে। প্রাচীরের এখন অতি দুরবস্থা, কিন্তু উহার প্রতি পাথর, প্রত্যেক কণা প্রাচীন

বীরপুরুষদের বীরপনা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আমাদের সঙ্গী রাজপুতজী দূরে এক আগাসরু পাথরের স্তম্ভ নির্দ্দেশিয়া বলিলেন—ঐ দেখ, ঐ স্থানে চিতোর-ধ্বংসকারী আকবর নগরের অবরোধকালে নিজের তাঁবু গাড়িয়াছিলেন। উহাকে 'আকবর কা দেওয়া' অর্থাৎ আকবরের প্রদীপ বলে। উহা আমাদের সর্ব্বনাশের প্রদীপ; চল নগরের দিকে যাই, এ রাজপুত হৃদয়ে এ দৃশ্য সহে না, আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না—এই বলিয়া ঐ রাজপুতজী এক ভাঙ্গা পাথরের উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে এমন কোন্ নরাধম আছে, যার ঐ দৃশ্যে হৃদয় দমিয়া না যায়? দর্ দর্ করিয়া আমার চোকে জল বহিতে লাগিল।

কতক হাতী করিয়া, কতক হাঁটিয়া আমরা পাহাড়ের উপর উঠিতে থাকিলাম। চার পাঁচটী প্রকাণ্ড দরজার ভিতর দিয়া গিয়া অবশেষে নগরের ভিতরে উপস্থিত হলাম। এখন সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। একটা কুণ্ডের ধারে বসিয়া চিতোরের ধ্বংসাবশেষের আলোচনায় মগ্ন রহিলাম। কোন লোকের শব্দ নাই। সকলই নীরব। মধ্যে মধ্যে দুই একটী পশু বা পাখীর রব কাণে যাইতেছে। পূর্ব্বকীর্ত্তির চিহ্নসকল একপ্রাণে নিরীক্ষিতে লাগিলাম। আবার দেখিলাম—আবার দেখিলাম—আবার দেখিলাম। আকাশে সূর্য্য ডুবিল। সূর্য্যের শেষ কিরণ আকারহীন মন্দির, প্রাসাদ, স্তম্ভ, ও ভগ্নাবশেষের উপর পড়িয়া মরণোন্মুখ মানুষের বদনে শেষ হাসির আভার ন্যায় উহাদের এক বিচিত্র, বিমর্ষ, বিকট শোভা প্রকাশিয়া দিল। আমি অনেকক্ষণ নীরবে ভাবময় হইয়া রহিলাম। জ্ঞানশূন্যের ন্যায় আবার চারদিকে তাকালাম, সন্ধ্যা হল। মন্দির, প্রাসাদ, স্তম্ভ ছায়ায় আচ্ছন্ন হতে লাগিল। হৃদয় ফাটিয়া গেল! অবশেষে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলাম—চিতোর! রাজপুরী!

আজ তোমার এদশা কেন? তোমার সে পূর্ব্ব যশ, পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য কোথায়? আজ তোমার বীরেরা কোন্ যবনের বিনাশ সাধিতে তোমাকে ফেলিয়া গিয়াছে? তুমি এককালে লোকময়, ধনময়, কীর্ত্তিময় রাজনগর ছিলে, এখন তুমি একাকিনী বিষণ্ণা, বিরহিণী বিধবা! পূর্ব্বে তুমি সকল নগরের অগ্রগণ্যা ছিলে, তোমার গৌরব দিগদিগন্ত ব্যাপ্ত ছিল, তোমার বীরদের কাহিনী পৃথিবীর প্রতি দেশে ধ্বনিত হত, আজ তোমার এ মলিন বেশ, তোমাতে কেবল শিয়ালকুকুরের বাস, তোমার কথা পর্য্যন্ত অধম ভারতবাসীরা স্মরণ করে না!!

আমরা চিতোরের পাশে রাত্রি যাপিয়া পরদিন আবার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলাম। রাজপুতজী ক্ষণে ক্ষণে দাঁড়াইয়া প্রতিস্থানের ইতিহাস অনর্গল বলিতে লাগিলেন। যেখানে পা দিলাম, তিনি বলিলেন, সেইখানেই কোন না কোন বীরের রক্ত মিশিয়া আছে। আমরা অবাক্ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে থাকিলাম। তিনি এক স্থলে লইয়া গিয়া কহিলেন—এই দেখ, যে জয়মল ও পত্তার কথা আমরা রোজ প্রাতে স্মরি, সেই জয়মলের রক্ত এই মাটীতে মিশিয়া আছে। আকবর দ্বারা চিতোরের অবরোধকালে, অন্য সকল বীর-সেনাপতির মৃত্যুর পর, নগরের রক্ষার ভার জয়মল ও পত্তার উপর পড়ে। পত্তার বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র ছিল, আগে যুদ্ধে তার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, বীরের স্ত্রী বীর-মাতা তখন কেবল জীবিত। সেই বীরজায়া ঐ তরুণবয়স্ক পুত্রকে কুঙ্কুমাক্ত বস্ত্র পরিতে ও চিতোরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জিতে আদেশিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া তিনি পত্তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে ও অন্যান্য রাজপুত্নীদের সশস্ত্র করিয়া নিজে তরওয়ালহাতে পাহাড় হতে অবতরিলেন ও শত্রুর মুখে ধাবিলেন। নিজ মাতৃভূমির রক্ষার জন্য বীরপত্নী ও বীর কন্যারা একে একে সকলে যবনদের হাতে প্রাণ হারালেন। রাজপুতেরা

নারীদের এই অসংসাহসিক ক্রিয়া দেখিয়া একেবারে উন্মত্তের ন্যায় যুঝিতে লাগিল। পত্তা সেই হলুদে পরিচ্ছদে যুদ্ধে মরিলেন। জয়মল আহত হলেন। অবশেষে তিনি চিতোর রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া জোহর ঘোষিলেন। এই ঘোষণার পর সমস্ত রাজপুত রমণী এক প্রকাণ্ড চিতা জ্বালিয়া যবনের হাতে কলুষিত বা কারারুদ্ধ হবার পরিবর্ত্তে আগুনে নিজেদের উৎসর্গ সাধিলেন। প্রায় দশ হাজার রাজপুত এক সঙ্গে পান খাইয়া শপথ করিল, কেহই শত্রুর নিকটে আত্মকে অর্পিবে না। সকলেই হলুদে বস্ত্র পরিয়া নিশ্চয় মৃত্যুকে আলিঙ্গিতে ধাবিল। নগরের সমস্ত দরজা খোলা হল, অসংখ্য মোগল সৈন্য প্রবেশিল। তার পরে যে কি ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড আর চিতোরের যে কি সর্ব্বনাশ হয় তাহা বলিতে আমার হৃদয় বিদরিয়া যায়! এত জঘন্য কাণ্ডের মধ্যে আমাদের একটী মাত্র সান্ত্বনা আছে, সেদিন কোন রাজপুতই তাহার হলুদে বস্ত্রকে কলঙ্কিত করে নাই, সকলেই বীরভূমির জন্য বীরের ন্যায় বীর প্রাণ ত্যজিয়াছিল!!

রাজপুতজী আবার কতকদূর গিয়া মাটীর নীচে অতি জীর্ণ ও দুরবস্থ প্রাসাদের অবশেষ দেখালেন, আর বলিলেন—এইখানে পদ্মিনী আগুণের কাছে নিজেকে বলি দেন, সুধু তিনি নন, হাজার হাজার রাজপুত-রমণী, স্ত্রী ও কন্যা, দুর্দ্দান্ত বর্ব্বর যবনদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ঐ গহ্বরে জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরেন। এই ভীষণ আত্ম-বিসর্জ্জনকে জোহর ক্রিয়া বলে। নরপিশাচ আল্লা-উদ্দিনের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান, তবে ঐ সময়কার একটী ঘটনা বলি শুন। আল্লা-উদ্দিনের লোকেরা জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, পামরের লিপ্সিত সুন্দরী পদ্মিনী, নিজ কুটুম্ব গোরা ও তাঁর ভাইপো বাদলের হাতে নিজের প্রাণরক্ষার ভার অর্পিলেন। গোরা যুদ্ধে প্রাণ

হারালেন। বাদল তখন বার বৎসর বয়সের বালকমাত্র, তথাপি সেও গোরার সঙ্গে রণে ধাবিয়াছিল। তাহার খুড়ার মৃত্যু সে সব নিজচোকে দেখিল, পরে আহত হইয়া ফিরিয়া আসিলে গোরার স্ত্রী;কিরূপে তাঁর স্বামী ধরাশায়ী হলেন, তাহা বাদলকে বর্ণিতে আদেশিলেন। বালক উত্তরিল—খুড়া মহাশয় যুদ্ধক্ষেত্রে শস্য কাটিতে গিয়াছিলেন, আমি কেবল তাঁর তরওয়ালের কাটুনি-কুড়াবার জন্য তাঁর পায়ে পায়ে গিয়াছিলাম। তিনি হত যবনদের রক্তময় দেহের উপর মান্যের বিছানা পাতিলেন, বর্ব্বর রাজা তাঁর বালিশ হল, আর তিনি শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেইখানে নিদ্রা যাইতেছেন। গোরার স্ত্রী আবার জিজ্ঞাসিলেন—বল, বাবা বাদল, কেমনে আমার পিয়ার আচরিল? বাদল কহিল—ওমা! কিরূপে আমি তাঁর কীর্ত্তি বর্ণিব? তিনি যে একজন শত্রুকেও তাঁহাকে ভয় বা তাঁর প্রশংসা করিতে রাখিয়া যান নাই—বীরপত্নী হাসিয়া বালকের নিকট বিদায় লইলেন আর—আমার পতি আমার বিলম্বের জন্য ভৎর্সিবেন—এই বলিয়া জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন।

এরূপ বীরত্বের কথা আর কোন্ দেশের বৃত্তান্তে পড়া যায়? প্রাচীন গ্রীসের অধিবাসীরা অনেক অসংসাহসিক ক্রিয়া দ্বারা নিজেদের জগদ্বিখ্যাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তেজ, সাহস, ও দেশভক্তিতে আর কোন জাতিই আমাদের ভারতবর্ষের রাজপুতদের সমকক্ষ হতে পারে না। মেওয়াড়ীজীর মুখে ঐরূপ গৌরবময় কত কথা শুনিলাম, তাঁর কথার শেষ নাই। লোকটী আহার নিদ্রা ফেলিয়া একমনে আমাদের নিকটে অসংখ্য বীরকাহিনী বর্ণিলেন। বলিবার সময় তাঁহার বদন রক্তবর্ণ হইয়া যাইত, তাঁর চোক দিয়া আগুণ ঝলকিত, তিনি সর্ব্বাঙ্গে কাঁপিতে থাকিতেন। অত কথা বলিয়া কষ্ট না পাবার জন্য তাঁকে কতবার প্রার্থিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন—উহাতে আমার বিন্দুমাত্র

কষ্ট হইতেছে না, নিজদেশের গৌরবের কথা বলিতে কি কেহ কখন ক্লান্ত হয়? ঈশ্বর করুন, আমি এই বিজন ভূমিতে বসিয়া কেবল চিতোরের পূর্ব্বকথা স্মরি, ও বর্ত্তমান বিলয়ের কথা ভাবিয়া এই পাথরের উপর হাহাকার করিয়া প্রাণ ত্যজি।—তাঁর কথায় আমাদের মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিল, আর চিতোরের বর্ত্তমান দশা দেখিয়া আমরা যারপরনাই কাতর হলাম। অবশেষে অনেক কষ্ট ও যাতনার পর মেওয়াড়ের পুরাণ রাজধানী চিতোরের নিকট বিদায় লইলাম ও উদয়পুরের অভিমুখে চলিলাম।

দ্বাদশ অধ্যায়।

আরাবলী।

বিলয়প্রাপ্ত চিতোর হতে যত দূরে যাইতে লাগিলাম, প্রকৃতির দৃশ্য তত মনোহর ও মহিমাময় হইয়া আসিল। এখন আমরা চারদিকে ক্রমাগত পাহাড় দেখিতে পেলাম, কোথাও অতি উঁচু পর্ব্বতশিখর আকাশ ভেদিয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা গভীর গহ্বর অতি নীচে চলিয়া গিয়াছে; মধ্যে মধ্যে উপর থেকে ঝর্ ঝর্ শব্দে ঝরণার জল পড়িতেছে, সে জল কোন স্থলিত পাষাণের দ্বারা প্রতিহত হওয়াতে তাহার বেগের প্রতিরোধ ঘটিতেছে, ক্ষণেক পরে আবার সেই জলের স্রোত পূর্ব্বের অপেক্ষা দ্বিগুণ জোরে পাহাড়ের পাদদেশে ধাবিতেছে; কোথাও অতি সঙ্কীর্ণ ঘর্ঘর ঘুরিয়া ফিরিয়া এক শৈল থেকে আর এক শৈলের উপর উঠিয়া গিয়াছে; কোথাও বা দুই ভীষণ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া অতি সরু নাল বিঁধিয়া গিয়াছে। ঐ সঙ্কীর্ণ ঘর্ঘর ও সরু নাল পর্ব্বতের এক দিক হতে অন্য দিক যাবার একমাত্র উপায়। তখন মাঘ মাসের শেষ, শীতের প্রায় অবসান হইয়াছে; সমতলে গাছ, লতা, গুল্মাদিতে নূতন পাতা গজিয়া বসন্তের অভ্যর্থনার জন্য প্রকৃতিকে সাজাইতেছে; পাখীরা মধুর কলরবে তাঁহার আগমনী গাইতেছে। যত উপর দিকে চাহ, দেখিবে, প্রকৃতি এখনও বিরহ অবস্থা ছাড়ে নাই; ক্রমে গাছপালার চিহ্ন অতি বিরল হইয়া আসিয়াছে।

প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা উদয়পুরের নিকট

পৌঁছিলাম। সূর্য্যদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশিলাম। তখন প্রাতঃকাল, বেলা নয়টা, ঐ সময়ে উদয়পুরের যে কি মনোহর কান্তি নিরখিলাম, তাহা কখনও বর্ণিতে পারিব না। প্রথমে আমরা দুধারে প্রাচীন প্রাসাদ ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ—দুর্দ্দান্ত মুসলমান ও নির্ম্মম মার্হাট্টিদের কীর্ত্তি—দেখিলাম। পরে অতি রমণীয় বাড়ী, অট্টালিকা, প্রভৃতির মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। সুমুখে রাজার প্রাসাদ, তাহার পাদদেশে এক স্বচ্ছ হ্রদ বিস্তৃত, অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে, হ্রদের বুকে তরুণ সূর্য্যের কিরণ পড়াতে জল চিকিমিকি করিতেছে। তাহাতে প্রাসাদের সৌন্দর্য্য প্রতিফলিয়াছে, এক রাজবাড়ীর কত কত ছাওয়া দেখিলাম; ক্রমে সে গুলি আবার বিলীন হইয়া গেল। চারদিকে গাছপালায় কচি কচি পাতা গজিয়াছে, মাঝে মাঝে দুই চারটী ফুলও ফুটিয়াছে। প্রকৃতির শোভা আলোচিব, কি কৃত্রিম কিন্তু অপরূপ, প্রাসাদের সৌন্দর্য্য দেখিব, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। রাজবাড়ী মর্ম্মর পাথর-নির্ম্মিত, প্রকাণ্ড ও অতি মনোহর; উহা একেবারে পর্ব্বতের কোলে অবস্থিত, আর মাটী হতে প্রায় আশি হাত উপরে উঠিয়াছে। পাশে পাশে আটকোণা বলভী দাঁড়াইয়াছে, তাহার উপর গম্বুজ; বাড়ীটী বরফের মত শাদা, সেই শাদা জমীর উপর অতি চমৎকার চিত্র কাটা রহিয়াছে। তাজমহলের অপেক্ষা সুন্দর ও মনোহর অট্টালিকা আর কোথাও নাই, কিন্তু উদয়পুরের রাজ-বাড়ীর স্থপতিকর্ম্মে ও চিত্রকার্য্যে একটা বিচিত্রতা ও মহিমা আছে, তাহা আর কোন স্থানে দেখা যায় না। প্রাসাদ ছাড়িয়া আরও দূরে চাহ, দেখিবে উন্নত আরাবলী পর্ব্বত ঢেউ খেলাইয়া কতদূর চলিয়া গিয়াছে, তাহার আর শেষ নাই। উহার শিখর ভাগে রাশি রাশি বরফ রহিয়াছে, তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া শৃঙ্গগুলির এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিয়াছে। নগরের সকল দিকেই পাহাড়, দেখিলে

বোধ হয়, উহা যেন আরাবলীর কোলে শুইয়া আছে। বাস্তবিক আকবর কর্তৃক চিতোর উল্লঙ্ঘনের পর মহারাণা উদয়সিংহ পর্ব্বত-মধ্যে এই নিভৃত স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রাসাদের তলে হ্রদটী তিনিই পূর্ব্বে নির্ম্মাইয়াছিলেন। মহারাণা উদয়সিংহ এখানে আসিবার পর জলের ধারে ঐ রাজবাড়ী প্রস্তুত করান, ক্রমে তাহার চার পাশে এক নগর গজিয়া উঠিল। আর তাঁহার নামেতে ঐ নগর 'উদয়পুর' অভি-ধান পাইল।

আমরা কয়েকদিন উদয়পুরে থাকিয়া সমস্ত দেখিব, মনস্থ করিলাম। উহার মত চমৎকার নগর পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। আমি চারদিকে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াতাম, কখন কখন একলা পাহাড়ের উপর উঠিতাম, কখন বা নগরের বাহিরে অনেক দূর চলিয়া যেতাম। ক্রমে মাঘ মাস ফুরাইয়া আসিল। শিবরাত্রির দিন উদয়পুরে সব চুপ্‌চাপ্, রাজা হতে চাষা পর্য্যন্ত সকলেরই সেদিন উপবাস; সমস্ত রাত জাগরণে ও নানা-প্রকার ক্রিয়াকর্ম্মে কাটিল। পরদিন মহা ঘটা, ফাল্গুন মাসের আগমন উপলক্ষে সকলে মহা আনন্দিত। মহারাণা প্রধান প্রধান লোক ও চাকরদের সবুজ বস্ত্র বিতরিলেন, আর সকলে সেই পরিচ্ছদ পরিয়া বসন্তের প্রথম দিনে শোর শিকারে যাবেন বলিয়া প্রস্তুত রহিলেন।

আমরাও ১লা ফাল্গুনে বলিষ্ঠ রাজপুতদের ঐ উৎসব দর্শনের মানসে যাত্রা করিলাম। রাজা, তাঁহার পুত্রেরা, সকল প্রধান লোক ও তাঁহাদের অনুচরেরা এক স্থানে মিলিয়া বুনো শোরের শিকারে বাহির হলেন। সকলেরই অতি সুন্দর সবুজ পোষাক; প্রত্যেকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘোড়ার উপর আসীন, হাতে শড়কি, পাশে তরওয়াল; আর সকলেই বিক্রমে ও চাতুর্য্যে পরস্পরকে অতিক্রমিবার বাঞ্ছায় উচ্ছ্বসিত হইয়া চলিলেন। উপত্যকার নাল ও গুহার মধ্যে শোরদের বাস, সেইখানে শিকারীরা

গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ফুক্‌রাতে লাগিলেন। কোলাহলে এপাশ ওপাশ থেকে কতকগুলা ভীষণাকার শোর বেরিয়া আসিল; শস্ত্রধারীরা তাহাদের চারদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ালেন। তার পর প্রত্যেক শওয়ারী সজোরে ঘোড়া ছুটালেন, আর হাতে শড়কি বা তরওয়াল ঝুলাইয়া, পাষাণ, জঙ্গল, গুহা, গাছ কিছুই দৃক্‌পাত না করিয়া, তীব্রগতি হরিণের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে শোরদের দিকে ধাবিলেন। দুর্ভাগা প্রাণীরা বেশীক্ষণ নিস্তার পাইল না। শড়কির খুঁচুনিতে ও তরওয়ালের ঘায়ে চারদিক রক্তময় হইয়া গেল। শিকারীদের মধ্যে দুই একজন গুহা ডিঙ্গাতে গিয়া বাহু ভাঙ্গিলেন, দুই একজন অসম পাষাণের উপর ঘোড়া চালাতে গিয়া পড়িয়া আহত হলেন। শুনিতে পাই, কখন কখন এই বসন্তের শিকারে কেহ কেহ জীবন পর্য্যন্ত হারান্; বুনো শোরেরা প্রাণের জ্বালায় ঘোড়াকে বা শওয়ারীকে দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে; কখন বা শিকারী দুঃসাহসের মূল্যস্বরূপ নিজের প্রাণ দিয়া থাকেন। কিন্তু কোনও বিপদ বা আশঙ্কা রাজপুতের তেজকে দমিতে পারে না। যাহাতে যত বিপদের সম্ভব, তাহাতে তাঁহাদের তত উল্লাসের উদ্ভব। শিকার শেষ হলে সকলে এক প্রান্তরে গেলেন, অনুচরেরা শড়কি বা খাঁড়ার দ্বারা কাটা শোরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া হাঁড়িতে চড়াইয়া দিল। মহা যজ্ঞ বসিল। সকলে মহা আনন্দে বুনো শোরের মাংস ও পিয়ালা পিয়ালা মাদক পানীয় খাইলেন। এই ভোজের পর প্রত্যেকে নিজের নিজের বাড়ী ফিরিলেন।

শুনিয়াছিলাম, মেওয়াড়ে অনেক কৃত্রিম হ্রদ আছে। রাজপুতজী বলিলেন, জয়সমুন্দর্ অর্থাৎ জয়সমুদ্র নামে উদয়পুরের নিকটে যে হ্রদ আছে, তাহা সকলের অপেক্ষা বড়। আমরা সকলে মিলিয়া একদিন উহা দেখিতে গেলাম। হ্রদটী দেখিয়া কোনমতে কৃত্রিম বলিয়া বোধ হল না। উহা বেড়ে প্রায় যোল ক্রোশ, আর জল থই থই করিতেছে;

উহা হতে চাষবাসের যে কত উপকার ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। শুনিলাম, জয়সমুন্দরের মত বড় হ্রদ ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। উহার স্থানে পূর্ব্বে এক ছোট নদী ও জলাশয় ছিল, মেওয়াড়ের রাজা জয়সিংহ ঐ দুইটা জোড়া দিয়া ও চার পাশে অনেক বাড়াইয়া ঐ ছোট সমুদ্র নির্ম্মাইয়া ছিলেন। তাঁর নামেতেই উহার নাম জয়সমুন্দর হইয়াছে। হ্রদের চারদিক শান বাঁধান; কিন্তু শুনিলাম, এখন উহার সে পূর্ব্বের গৌরব নাই, অনেক স্থানে উহার বড় মন্দ অবস্থা হইয়াছে।

আমাদের দিন যাইতে লাগিল। উদয়পুরে এক সপ্তাহের বেশী থাকিলাম, অন্যান্য স্থানে এখনও অনেক দেখিবার আছে, এই জন্য ঐ নগরে আর বিলম্ব করা উচিত বিবেচনা করিলাম না। আমরা উদয়পুর থেকে প্রস্থান করিতে উপক্রমিলাম। রাজপুতজী বলিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহাদের প্রধান উৎসব হোলিখেলা হবে, তাহা দেখিতে আমাদের অনেক জেদ করিলেন। কিন্তু হোলিখেলা কিরূপ, তাহা অনেকটা জানিতাম, বাঙ্গালায় বাঙ্গালীদের ও হিন্দুস্থানীদের ফাগের কারবার অনেক দেখিয়াছিলাম, সে কারণে উহার জন্য আর অপেক্ষা করিতে মন উঠিল না। রাজপুতজীকে হোলিখেলার সর্ব্বাঙ্গ বর্ণিতে অনুরোধিলাম। তিনি ঐ সময়ে রাজপুতদের ক্রিয়াকাণ্ড সবিশেষ বলিলেন। তাঁহার বর্ণনা শ্রবণমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থে বিবৃত বসন্ত-উৎসবের কথা মনে পড়িল; অনেকাংশে সেই প্রকার বলিয়া বোধ হল। আমরা শীঘ্র উদয়পুরকে বিদায় দিতে প্রস্তুত হলাম। এই অবকাশে আমি রাজপুত স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে দুই চারটা কথা বলি।

প্রাচীন কালের আর্য্য নারীদের গুণ ও কীর্ত্তি কাহারও অবিদিত নাই। সাধারণতঃ হিন্দু স্ত্রীদের ন্যায় পতিভক্তি, সতীত্ব, দয়া, মায়া আর কোন দেশের স্ত্রীলোকে দেখা যায় না। আমাদের বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের

কোমল গুণ সকলেই জানেন, কিন্তু তেজ, সাহস, প্রভৃতি দৃঢ় গুণে কেবল রাজপুত-নারীরাই পূর্ব্বকালীন আর্য্য স্ত্রীদের সমকক্ষ হতে পারে; কেবল রাজপুত-নারীরাই নিজ হাতে শত্রুর রক্তপাত করিয়া প্রাচীন বীর-জায়াদের নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বাঙ্গালীদের ক্ষীণ, দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদের মধ্যে অধিক তেজ বা সাহস নাই। যেখানে ভীরুতা, সেই খানে নিষ্ঠুরতা; আমরা নিজে অতিশয় ভীরু, এজন্য আমাদের স্ত্রীকন্যাদের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া থাকি। আর একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, ভারত-বর্ষের যে ভাগের লোকেরা বেশী দুর্ব্বল, ভীরু, ও পরপীড়িত, সেই খানের স্ত্রীলোকদের বেশী অধম অবস্থা। সচরাচর ইহার স্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায়। কলিকাতা বা মুর্শিদাবাদ অপেক্ষা ভিতর বাঙ্গালার পাড়াগাঁর বা আসামের স্ত্রীলোকদের অবস্থা অনেক ভাল। সকলেই জানেন যে, আসল পাড়াগাঁর স্ত্রীরা কলিকাতাবাসিনীদের মত পিঞ্জরাবদ্ধ নয়; তাহাদের মৌখিক বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাদের অনেক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাজনিত গুণ আছে। আবার বাঙ্গালার অপেক্ষা পশ্চিমের স্ত্রীলোকদের অধিক বল, তেজ, ও সাহস; কিন্তু রাজপুতানায়, বিশেষ উদয়পুরে, হিন্দু স্ত্রীদের যথার্থ স্ত্রীত্ব দেখা যায়। আমরা বাঙ্গালায় খাঁড়াহাতে মাটীর কালী ও তরওয়াল হাতে মা দুর্গা দেখিয়াই প্রাচীন আর্য্যনারীদের তেজ, বিক্রম, ও সাহসের পরিচয় পাই, কিন্তু এই মেওয়াড়ে ও অন্যান্য রাজপুত-রাজ্যে সাক্ষাৎ পার্ব্বতী, সীতা, সাবিত্রী রাশি রাশি রহিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল ইতিহাসকারেরাই রাজপুত-নারীদের গুণ গাইয়াছেন, আর সকলেই রাজপুত-রমণীদের বীরত্ব, সাহসিকতা, সতীত্ব, পতিপরায়ণতায় একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছেন। এখন রাজপুতদের অবস্থা অতিশয় অবনত হইয়া আসিয়াছে। বহুবিবাহ, স্ত্রৈণতা প্রভৃতি নানা দোষে ও কামান্ধ মুসলমানদের অত্যাচারে রাজপুত-পরিবারদের অতি

হীনদশা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও রাজপুত্রীদের যে অবস্থা দেখিলাম ও জানিলাম, তাহাতে উহারাই যে যথার্থ আর্য্যনারীর বংশজাতা, সে প্রতীতি আমার বিলক্ষণ জন্মিল, আর সমস্ত হিন্দু রমণীদের মধ্যে উহারাই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা স্পষ্ট বোধ হল।

রাজপুত-নারীদের বীরত্বের দুই একটী দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি, ইহাদের সমস্ত বীরকথা লিখিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড ইতিহাস হইয়া পড়ে। তাহাদের তেজের আর একটী প্রচলিত কথা লিখি। আম্বেরের রাজা প্রসিদ্ধ জয়সিংহ হরবতীর এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ঐ রাজ-কন্যার চালচলন ও পরিচ্ছদ আম্বেরের সুমার্জ্জিত মহিলাদের হতে প্রভিন্ন ছিল, এইজন্য তিনি অন্যান্য রাজমহিষীদের ও রাজার কাছে হাস্যাস্পদা হইয়াছিলেন। একদিন মহারাজা বিরলে হরবতী কন্যার সঙ্গে কৌতুক করিতে করিতে বলিলেন, তিনি মহিষীর বড় লুটন্ত ঘাঘরার কিছুভাগ কাঁচি দিয়া কাটিয়া দিবেন। এই ব্যঙ্গে মহিষী নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া রাজার তরওয়াল ছিনিয়া লইয়া অতি ভীষণ ভাবে রাজাকে বলিলেন,—যে কুলে আমার জন্ম, সে কুলের স্ত্রীরা কখন এরূপ ব্যঙ্গ সহে না, পরস্পরের সম্ভ্রম রক্ষা, কেবল সুখের নয়, ধর্ম্মেরও মূল সূত্র; আবার যদি কখন তুমি আমাকে এরূপ অপমান কর, দেখিবে, আম্বেরের মহারাজ যেমন কাঁচির ব্যবহার জানেন, এই হরবতীকন্যা তাহার অপেক্ষাও ভাল তরওয়াল চালাতে জানে।

রাজপুতদের অবস্থা ক্রমে বড় হীন হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনও ইহারা স্ত্রীলোকদের প্রতি যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করে। আমরা বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকদের প্রতি হিন্দুস্থানী দরওয়ানদের সদ্ব্যবহার দেখিয়া লজ্জা পাই, অন্ততঃ আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত, কিন্তু রাজপুতানায় স্ত্রীলোকদের প্রতি পুরুষদের আচরণ দেখিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্য ও আহ্লাদিত

হইয়াছিলাম। এখানে অতি সামান্য মূর্খ লোক পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে ধৃষ্টভাবে কিম্বা অসৎ মনে কথা কহিতে সাহস করে না। উদয়পুরে যেখানে সেখানে ভদ্র স্ত্রীলোক দেখিতাম, কখনও তাহাদের সঙ্গে পুরুষদের অশ্রদ্ধা-ভাবে সম্ভাষিতে দেখি নাই। রাজপুতেরা সকল বড় বড় কাজে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে, অবরোধের বন্দোবস্ত থাকিলেও কখন স্ত্রীকে হেয় ভাবে না, সর্ব্বদা স্ত্রীর সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা রাখিয়া চলে। রাজপুতদের মধ্যে একটী কথা প্রচলিত আছে—কখন, কোন রাজপুতকে তার ঘোড়া, তার স্ত্রী, ও তার দেশ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসিও না; আর যদি ঐ তিন বিষয়ে কথা কহ, অতিশয় ভক্তি ও সম্মানের সঙ্গে জিজ্ঞাসিবে, নচেৎ তৎক্ষণাৎ রাজপুতের তরওয়াল তোমার রক্তে আর্দ্র হবে।—এরূপ তেজ এখনকার রাজপুতদের আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু রাজপুতেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি অতি সম্মান করিয়া চলে, আর রাজপুত-রমণীরা নিজেদের স্বাধীনতা ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতে জানে। দেশভক্তিতে রাজপুত-স্ত্রী কখন তাঁর স্বামীর অপেক্ষা নীচে নয়, দেশরক্ষার্থে কত শত রাজপুত-রমণী অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। নিজের মানরক্ষার্থে সমস্ত জলাঞ্জলি দিতে বা প্রাণ ত্যজিতে রাজপুত-রমণী এক মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কুচিত হয় না। রাজপুতদের মধ্যে যে পূর্ব্বে নিষ্ঠুর জোহর, সতীদাহ ও কন্যাহত্যার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা অতি মন্দ ও জঘন্য হলেও তাহার মূল ভাল। নিজেদের স্ত্রীকন্যার মানরক্ষার নিমিত্তই রাজারা জোহর ঘোষিত; স্ত্রীরা পতিভক্তির দরুণই জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিত, রাজপুত নিজ কন্যার সমগোত্রীর সঙ্গে বিবাহ না হবার আশঙ্কায় তাহাকে বলি দিত। নিজ স্ত্রীর ধর্ম্মনাশ ও নিজ কন্যার দুঃখ রাজপুত কখনই সহিতে পারে না। স্ত্রী পরের হাতে বন্দী হবার আগে, তার বুকে অসি চালায় কি তাকে আগুনে মরিতে আদেশ করে, নিজ

কন্যার অভিমত সমান লোকের সঙ্গে বিবাহ না ঘটিলে কিম্বা যথেষ্ট যৌতুক দিতে না পারিলে তার প্রাণবধের আজ্ঞা দেয়। এ সকল প্রথা অতিশয় নিষ্ঠুর ও ভীষণ বটে, আর এখন উহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়, কিন্তু উহার মুল অতি উৎকৃষ্ট—স্ত্রীলোকের মানরক্ষা ও সম্মান উহার একমাত্র কারণ। আবার বলি, এখন হিন্দুদের অনেক অবনতি হলেও রাজপুতবালাদের ন্যায় তেজ, সাহস, আত্মাভিমান, ধর্ম্মভাব, পতিপরায়ণতা পৃথিবীর অন্য কোন জাতীয় রমণীদের মধ্যে দেখা যায় না।

ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিন সকালে আমরা মেওয়াড়ের আধুনিক রাজধানী উদয়পুরকে নমস্কার করিয়া চলিলাম। এখন শীত কমিয়া আসিয়াছে, দিনের বেলা সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমে প্রখর হতে লাগিল। আমরা আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রমিয়া যোধপুর হইয়া জয়পুরে ফিরিব, এই মানসে ঐ পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিলাম। বাঁ দিকে পাহাড়গুলি রাখিয়া উপত্যকার মধ্যে যাইতে যাইতে সতৃষ্ণভাবে আবার উদয়পুর ও তাহার কীর্ত্তিচিহ্নসকল দেখিলাম। ডানদিকে কিছুদূরে লতাপাতাদলের মধ্য হতে এক মন্দিরের চূড়া উকি মারিতেছে, পরে একটী ছোট গ্রাম, সুমুখে একটী ছোট নদীর উপর একটী ছোট খিলান করা পোল; দুই একজন লোক গল্প করিতেছে, দুই একজন লোক নদীর মাছদের খাবার দিতেছে। কিছুদূরে অনেক খেজুর গাছের ঝোপের মধ্যে এক রাজপুত ঠাকুরের কোটের গম্বুজ ঝকিতেছে, তার পর দুই একটা দেবালয়ের শুভ্র, সুন্দর, উন্নত শিখর উঠিয়া সমস্ত উপত্যকার বিচিত্রতা সাধিতেছে। সে গ্রাম ছাড়িয়া আরও দুই পাহাড়ের মধ্যে এক নালের ভিতর দিয়া চলিলাম। পিছনে উপত্যকা পড়িয়া রহিল, দুপাশে পাহাড়, চূড়া পর্য্যন্ত কাঁটাল গুল্মে ঢাকা, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গাছ ছড়াইয়া রহিয়াছে। উদয়পুরের প্রায় চার ক্রোশ পরে এক গ্রামে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। এক প্রকাণ্ড

তেঁতুল গাছের তলে বসিয়া সুমুখে এক দূরস্থ কোটের কাঙ্গরাময় প্রাকার দেখিতে দেখিতে আমাদের শরীরের সেবা করিলাম।

আমরা আরও উপরে উঠিতে লাগিলাম, আরও ঠাণ্ডা বোধ হল; উর্ব্বরতার চিহ্ন কমিয়া আসিল, গাছপালাও ক্রমে বিরল দেখিলাম। এ স্থানের প্রতিপদে কর্কশ অথচ বিচিত্র মাহাত্ম্য পরিস্ফূট হইল। আবার এক নালের মধ্য দিয়া গিয়া সুমুখে অনেক লতাপাতা দেখিতে পেলাম; বড় বড় থোবাল খেজুর ও লাবণ্যময় তালগাছ শোভা দিতেছে। জানিলাম, উর্ব্বরা স্থানে আসিয়াছি, কিছুক্ষণ পরে গোগুন্দা নামে এক গ্রামে পৌঁছিলাম। উপরে গাছশূন্য পর্ব্বত উঠিয়া গিয়াছে, নীচে স্লেট-ঢাকা বাড়ী ও মন্দিরের ছাদগুলির এক অপূর্ব্ব মনোহারিতা হইয়াছে, পর্ব্বতের পিঠে নানা রঙের পাথর ও নুড়ি সূর্য্যের কিরণে ঝকিতেছে। এখানে একজন ঝালা রাজপুত ঠাকুরের বাস, তাঁর সম্পত্তি চারদিকে বিস্তৃত।

ঐ স্থানে মার্হাট্টাদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের অনেক নিশানা দেখিলাম। দুর্দ্দান্ত পাঠানের অপেক্ষা নির্ম্মম মার্হাট্টীরা রাজস্থানের অধিক সর্ব্বনাশ করিয়াছে। উদয়পুরে আসিতে ও উহা থেকে যাইতে ক্রমাগত মার্হাট্টীদের নিষ্ঠুর ব্যবহারের ও লুঠপাটের চিহ্ন আমার চোকে লাগিয়াছিল। রাজপুতদের নিজের দোষে এই মার্হাট্টীরা তাঁদের দেশে আসিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দেয়। রাজপুত রাজারা অতি প্রাচীন কাল অবধি অন্তর্ব্বিবাদে রত, তাঁহাদের ঘরোয়া কলহের দরুণই বিধর্ম্মী মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়া এক রাজার সাহায্যে অপরকে পরাস্ত করে, তাঁহাদের পরস্পরের মহাবিদ্বেষ বশতঃই কোন কোন রাজা সমদেশী, সমধর্ম্মী ও সমগোত্রীর উচ্ছেদসাধনের নিমিত্তই প্রথমে পাষাণ-হৃদয় পাঠান, পরে মর্ম্মশূন্য মার্হাট্টীদের সাহায্য প্রার্থনা করে। অন্তর্ব্বিবাদ আমাদের

সর্ব্বনাশের মূল; রাজপুত-রাজাদের মধ্যে মিল থাকিলে কখনই মুসলমানেরা হিন্দুস্থানে দাঁড়াইবার জায়গা পাইত না। হিন্দুদের পরস্পর ঐক্য থাকিলে কখনই আজ সোণার ভারতের এ অধম দশা ঘটিত না।

আমরা ক্রমে আরাবলীর অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। চার দিকে শিখরের উপর শিখর ভেদিয়া গিয়াছে, এস্থলে প্রকৃতি এক অনির্ব্বচনীয় মহিমাময় শোভা ধরিয়াছে। এই পর্ব্বতের দেশে আকাশ-ভেদী পাষাণ ও অধোগামী সরিতের মধ্যেও অনেক ঘাসাল মাঠ ও চষা জমী দেখিতে পেলাম। আমাদের সুমুখে কতকগুলি পাহাড়ী রাজপুত জড় হল। তাদের বলিষ্ঠ বাহু, উন্নত শরীর, অভিমানী বদন, ও সতেজ কান্তি নিরখিয়া একমনে তাদের আলোচিতে লাগিলাম। তাদের দেখিয়া বোধ হল যে, যদিও তাহারা নিজহাতে মাটী চষিয়া জীবন ধরে, তবুও তাহাদের উন্নত উদ্ভব ও পূর্ব্বগৌরব বিলক্ষণ স্মরণ আছে; ঢাল, তরওয়ালের ব্যবহারে তাহারাও নীচু নয়, লড়াই ও যুদ্ধই তাহাদের জন্মসিদ্ধ ব্যবসা। আমরা কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিলাম। তাহারা আঙ্গুল দিয়া প্রসিদ্ধ স্থানগুলি আমাদের দেখাতে থাকিল, আর পূর্ব্বকীর্ত্তির ও পূর্ব্বগৌরবের কথা বলিয়া আমাদের একেবারে ভাবময় করিয়া দিল। আমরা অতি সম্মান ও ভক্তির সঙ্গে তাদের বিদায় দিয়া আরাবলীর বড় নালের দিকে চলিলাম। যাইতে যাইতে অনেক ঝরণা ও প্রস্রবণ আমাদের চোখ আকর্ষিল; যে বানাস নদী পারিয়া উদয়পুরে গিয়াছিলাম, সেই বানাস নদীর সূত্র ঐখানে দেখিলাম। ক্রমে আমরা এক বড় নালে উপস্থিত হলাম।

নালটী সরু ও বাঁকিয়া চুরিয়া প্রায় বার ক্রোশ চলিয়া গিয়াছে; ইহার ভিতর উঠিয়া নামিয়া যাওয়া বড় কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃতির অপরূপ মহিমা আর রাজপুতজীর স্বজাতীয়ের তেজ ও সাহসের বৃত্তান্তের

নিকটে সে কষ্ট, কষ্ট না হইয়া বরং আমোদই বোধ হইয়াছিল। আমরা নালের মাঝখানে পৌঁছিয়া এক রমণীয় আরণ্য স্থানে থামিলাম; আমাদের সুমুখে এক প্রস্রবণ। এস্থানে সকলই মনোহর ও অপূর্ব্ব; দেখিলে বোধ হয়, প্রকৃতি ইহাকে কেবল তার প্রিয়পাত্রদের বাসভূমি নির্দ্দেশিয়াছে; রিপুপরবশ মানুষ কখন এ পবিত্র দৃশ্যের শান্তি জানিতে পারে না। আকাশে মেঘের রেখামাত্র নাই, কোকিলেরা গভীর পাতারাশির মধ্য হতে সহর্ষ কুহু কুহু রবে পরস্পরকে উত্তর দিতেছে; বাঁশের ঝাড়ের ভিতর রৌদ্র প্রবিষ্ট হওয়াতে কুক্‌ড়োরা সকাল ভাবিয়া চীৎকার স্বরে ডাকিতেছে, সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণ চারদিকে বিস্তৃত হওয়ায় গাছের ঝুপির ভিতর থেকে তিতর ও ঘুঘুরা আনন্দধ্বনির প্রকাশে প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছে। আরও কত রকম পাখী যে উড়িতেছে, বসিয়া আছে ও গাইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই; তাহাদের মধ্যে কাঠঠোক্‌রা শক্ত কাঠের উপর শক্ত ঠোঁঠ চালাতে চালাতে সরু ডাক ছাড়িতেছে, তাহা আবার চারদিকে প্রতিধ্বনিতেছে। বিবিধ প্রকারের ফল অরণ্যবাসীদের নিমন্ত্রিতেছে। পরিশ্রমী ভ্রমর সাদা চামেলি থেকে হল্‌দে চামেলিতে উড়িতেছে, তাদের মধু পীতেছে আর গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গাইতেছে; আবার সেগুলি ছাড়িয়া সুদৃশ্য কাম্বির ও কানোয়ার দিকে ধাবিতেছে, পর্ব্বত-নদীর উপর দুই পাশে আরদ্ধ ও বেতস লতা ভাসিতেছে, এবং তার দুই ধারে সুগন্ধ কিনের ফুটিয়া মন মোহিতেছে, আরু, বাদাম, আঞ্জের, ডুমুর, আতা, প্রভৃতি কত রকম আরণ্য ফল ফলিয়াছে। ফলের ও ফুলের সংখ্যা নাই।

আমরা ঐ রমণীয় স্থান ত্যজিয়া আবার চলিলাম, ক্রমে সে ফলফুলময় মনোহর প্রদেশ ছাড়িয়া অতি ভীষণ গুহাগহ্বরময় স্থানে আসিয়া পড়িলাম। চারদিকে কেবল আরণ্য গাছ ও স্খলন্ত পাষাণ; নালের

দুপাশে কতদূর পাহাড় উঠিয়া গিয়াছে, সূর্য্যের কিরণ আর দেখিতে পেলাম না; মধ্যে মধ্যে কেবল ঝরণার জলের ঝর্ ঝর্ শব্দ শুনিতেছি, আর আমাদের কথার শব্দ এক কন্দর হতে আর এক কন্দরে প্রতিধ্বনি-তেছে। ক্রমে নাল আরও সংকীর্ণ হইয়া আসিল, এখানকার পথ এত সরু যে, ইহাকে নলী বলে; শরীরের মধ্যে গলার নলী যেরূপ অপ্রশস্ত, পর্ব্বতের পথমধ্যে নলীও সেইরূপ। ইহার ভিতর দিয়া দুইটা উট, পাশাপাশি বা একটা বড় হাতী অতি কষ্টে যাইতে পারে। ঐ নলী দেখিয়া মনে হল যে, সেখানে অল্প লোকে রাশি রাশি শত্রুকে দমিয়া রাখিতে পারে। আমাদের সঙ্গী রাজপুতজী ঐ নলীতে পৌঁছিবামাত্র যেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন, তাঁর বদন রক্তবর্ণ ধরিল, তাঁর শরীর, কাঁপিতে লাগিল, তিনি চীৎকারস্বরে বলিলেন,—এই যে নলী দেখিতেছ, ইহা এক সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপুতদের পবিত্র রক্তে প্লাবিত হইয়াছিল; ঐ যে গুহা দেখিতেছ, ঐখানে আমাদের মহারাণা প্রতাপসিংহ যুদ্ধের পর প্রাণের স্ত্রী ও প্রাণের সন্তানদের সঙ্গে লইয়া অনাহারে দিনের পর দিন কাটাইয়াছিলেন। মহারাজা প্রতাপসিংহের অসীম প্রতাপের কথা তোমরা সকলেই জান, আমার আর বলিবার আবশ্যক নাই। যতদিন একজন শিশোদিয়ার ধমণীতে রক্ত বহিতে থাকিবে, ততদিন প্রতাপসিংহের নাম ও কীর্ত্তি কখন—কখনই বিলয় পাবে না। রাজপুতজীর এই ভাবময় বাক্য শুনিয়া আমার অন্তরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, প্রতাপসিংহ ও হল্‌দীঘাটের যুদ্ধ আমার মনে পড়িল। আমি তাঁহাকে অতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসিলাম,—এই কি সেই চিরস্মরণীয় হল্‌দীঘাট? তিনি উত্তরিলেন,—হাঁ, এই নলীর পাশের প্রান্তরকে হল্‌দীঘাট বলে, এইখানেই মহারাণা—তাঁর চোক দিয়া দর্‌দর্ জল পড়িতে লাগিল, ক্ষণেক পরে আবার—তোমরা সব জান—এই বলিয়া তিনি ভাবময় হইয়া রহিলেন। আমি

হল্‌দীঘাটের যুদ্ধের বিবরণ অনেকবার শুনিয়াছিলাম ও পড়িয়াছিলাম, কিন্তু অমন তেজ, অমন সাহস, অমন বীরত্বের কথা, সেই তেজ, সাহস, ও বীরত্বের স্থানে, সেই তেজী, সাহসী, ও বীরদের পরপুরুষের মুখে শুনিতে যারপরনাই উৎসুক হইয়া, তাঁহাকে অতি ব্যগ্র ভাবে প্রার্থনা করিলাম, —বল, বল, আবার সেই বীরত্বের বার্ত্তা বল; নিস্তেজ বাঙ্গালীর হৃদয় একবার উচ্ছ্বসিত হউক, একবার এই অধম পরাধীনের অন্তরে আগুন জ্বালাইয়া দাও।

রাজপুতজী কহিলেন,—আকবরের পুত্র যুবরাজ সেলিম রাজা মানসিংহ ও মহাবৎ খাঁ নামে আর একজন স্বধর্ম্মত্যাগী রাজপুত দ্বারা পরিচালিত হইয়া রাশি রাশি সৈন্যের সঙ্গে মহারাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রমিলেন। প্রতাপসিংহ পর্ব্বতময় দেশ ও তাঁহার বাইশ হাজার মাত্র রাজপুতের বিক্রমের উপর নির্ভরিয়া মোগল সম্রাটের সৈন্যব্যূহ দমিতে প্রস্তত থাকিলেন। শত্রুরা অনায়াসে আরাবলীর পশ্চিম ঘর্ঘর-গুলি অতিক্রমিয়া আসিল। প্রতাপসিংহ সসৈন্যে এই হল্‌দীঘাটের নালে দাঁড়াইলেন। দুইপাশে দুর্গম পাহাড়ের ও চূড়ার উপর বিশ্বাসী ভীলেরা তীরধনুক ও শত্রুদের মাথার উপর গড়াইয়া দিবার জন্য বড় বড় পাথর লইয়া স্থির থাকিল। নীচে নালেতে মেওয়াড়ের সকল গোত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষেরা মহারাণা প্রতাপের সঙ্গে উহার রক্ষার জন্য নিশ্চয়-মরণকে আলিঙ্গিতে উদ্যত হলেন। মোগল-সৈন্যেরা প্রচণ্ড তুফানাহত সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় হুহুঙ্কার রবে অল্প সংখ্যক বীর রাজপুতদের বিরুদ্ধে ধাবিল। রাজপুতেরা এক বিন্দু হটিল না। ব্যক্তির পর ব্যক্তি, দলের পর দল, মণ্ডলের পর মণ্ডল উন্মত্তের ন্যায় সেই উদ্বেলিত, উচ্চণ্ড সমুদ্রের বেগ রোধিতে ধাবিল। যেখানে ঘোর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেইখানেই বীর প্রতাপ-সিংহ নিজহাতে পতাকা ধরিয়া ভয়ঙ্কররূপে যুঝিতেছিলেন। চারদিক

রক্তে ভাসিয়া গেল। মুণ্ডহীন যবন সেনারাশির দ্বারা ভূমি আচ্ছন্ন হল, বীর রাজপুতেরা একে একে স্বদেশের জন্য প্রাণ দিল। প্রতাপ-সিংহ নিজহাতে সেলিমের রক্ষকদের বিনাশিলেন। সাহসী পুরুষ চেতক নামে সাহসী ঘোড়ার উপর বসিয়া হাতীর উপর আসীন সেলিমের প্রাণ প্রায় সাংহারিয়াছিলেন; ঐখানে মহা হত্যাকাণ্ড ঘটিল। মোগলেরা সেলিমের রক্ষার্থে ধাবিল, মেওয়াড়ের বীরেরা রাজা প্রতাপের প্রাণ বাঁচাতে ছুটিল। প্রতাপ সাত স্থানে আহত হইয়াও মহাবেগে যুঝিতেছিলেন। রাশি রাশি যবন তাঁহাকে ঘিরিল, তিনবার তিনি মহাসঙ্কটে পড়িলেন, তিনবার রাজ-পুত-সেনারা তাঁকে উদ্ধারিল। অবশেষে দল দল শত্রু তাঁর উপর ঝাঁকিয়া পড়িল, শত্রুহাতে তাঁর প্রাণ যায়, এমন সময়ে উদার ঝালার ঠাকুর নিজের প্রাণ দিয়া প্রতাপকে বাঁচালেন। পাঁচটী মাত্র সিংহ পঞ্চাশটা ভাল্লুকের সঙ্গে কতক্ষণ লড়িতে পারে? মোগলদের রাশি রাশি সৈন্য ছাড়া অনেক বড় কামান ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ছিল, রাজপুতেরা কেবল সামান্য শস্ত্র ও নিজে-দের বীর্য্যের উপর নির্ভরিয়াছিল। ঐরূপ দুঃসাহসিক শৌর্য্য ফলদায়ক হল না। বাইশ হাজার রাজপুতদের মধ্যে কেবল আট হাজার মাত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জীবন্ত ফিরিয়াছিল। প্রতাপসিংহ সর্ব্বশরীরে আহত হইয়া তাঁর আহত উন্নতচেতা চেতকের উপর বসিয়া একাকী পাহাড়মধ্যে অন্তর্হিত হলেন।

রাজপুতজীর মুখে ঐ ভীষণ কাণ্ডের বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে আমরা চিরস্মরণীয় হলদীঘাটের নাল উৎরিলাম। রাত্রে এক গ্রামের মধ্যে আশ্রয় লইয়া পরদিন প্রাতে আবার যাত্রা করিলাম। আদিম নিবাসী ভীল মণ্ডলীদের মধ্য দিয়া গিয়া অনেক নদী পাহাড়ের পর অবশেষে আরা-বলীর শিখর আবুর নিকটে পৌঁছিলাম। সেইখানে আমরা থামিয়া গুরু শিখরের উপর চড়িতে উদ্যত হলাম। কতকগুলি পাহাড়ী লোক

সঙ্গে করিয়া আমরা উপরে উঠিতে আরম্ভিলাম। পর্ব্বতটী অতি উঁচু ও গড়ানে, মাঝে মাঝে গভীর গর্ত্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর সকল দিকই অত্যন্ত দুরারোহ! আমরা কতকদূর ঝোলের উপরে, কতকদূর লাঠীর সাহায্যে পায়ে পায়ে অতি কষ্টে উল্লঙ্ঘিলাম; পাহাড়ী দর্শকেরা আমাদের বরাবর দেখাইয়া নিয়া গেল। আবু শিখর মহাতীর্থের স্থান, মন্দির ও দেবালয়ে পরিপূর্ণ! তীর্থদর্শনের জন্য একজন রাজপুত-গুরু আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে ও ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা উঠিতে থাকিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, পাশে ভীষণ জঙ্গল, তার মধ্য হতে শিয়ালের ও অন্যান্য জন্তুদের ডাক ঐ বিজন স্থানকে সশব্দ করিয়া দিল। আমরা এক ছোট দেবালয়ে রাত্রিতে আশ্রয় নিলাম।

পরদিন সকালে আবার চলিলাম। কতকক্ষণ পরে গণেশের ঘাটে উপস্থিত হইয়া গণেশের মন্দির দর্শন করিলাম, আর অল্প বিশ্রামের পর ভয়ানক বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া উঠিতে থাকিলাম। চারদিকে বাঁশের ঝোপ ও কাঁটাল খূব রহিয়াছে, কিন্তু বড় বড় গাছ দেখিলাম না। এক এক ছোট নদী মহাবেগে নীচে ধাবিতেছে; তাহার তটে নানা রকমের নুড়ি ও ছোট পাথর কর্কশভাবে ছড়ান রহিয়াছে; কোথাও কোথাও নীল শ্লেট ও নানা রঙের মর্ম্মর টুকরা লক্ষিলাম। যত উপরে উঠিলাম, তত বেশী শীত বোধ হল, সঙ্গে যাহা কিছু গরম কাপড় ছিল, তাহা জড়াইয়াও আমাদের শীত ভাঙ্গিল না, মুখ ও হাত যেন জমিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে সূর্য্যের কিরণ প্রখর হওয়াতে ও দুরারোহ পর্ব্বতের আরোহণশ্রমে শরীর গরম হইয়া আসিল; আমরাও ক্লান্তি অনুভবিতে লাগিলাম। সুমুখে কত শিখরের চূড়া দেখিলাম; সকলকে অতিক্রমিয়া গুরুশিখর আবু মাথা তুলিয়া মহিমা বিস্তারিছে, অদূরে অনেক ব্রাহ্মণ ও

জৈনদের মন্দির পবিত্র শান্ত শোভায় শোভিতেছে। পথের দুপাশে কতকদূর রাশি রাশি করন্দ ফুল ফুটিয়াছে, কোথাও বা বিবিধ ফলফুল-বিশিষ্ট অনেক প্রকার গুল্ম ও লতা সারি সারি চলিয়া গিয়াছে। তাদের সকলের উপর সোণার চাঁপা টেক্কা দিতেছে। সোণার চাঁপার বাহার সুন্দরীদের কাল চুলের উপর, কিন্তু ঐ আরণ্য স্থানেও তার এক অপূর্ব্ব কান্তি প্রকাশ পাইতেছে, আর তীব্র সৌরভে চারদিক গন্ধময় হইয়া গিয়াছে।

অবশেষে সূর্য্য আমাদের ঠিক মাথার উপর উঠিল, আমরাও আবুর সকলের উঁচু গুরুশিখরের চূড়ার উপর উঠিলাম। এখন ফাল্গুন মাস, আর দুপর বেলা, কিন্তু এখনও এখানে কলিকাতার পৌষ মাসের দুপর রাতের অপেক্ষা বেশী ঠাণ্ডা লাগিল। আমরা কম্বল জড়াইয়া এক আশ্রিত স্থানে দাঁড়াইয়া শিখরের উপর হতে প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষিতে লাগিলাম। এ দৃশ্য অতি অভিনব ও মহিমাময়। মাথার উপর নীল আকাশ, প্রখর সূর্য্য তার কপালে বিরাজিতেছে, আমাদের পায়ের নীচে মাঝে মাঝে পাতলা মেঘ উড়িতেছে, সে মেঘ কোথাও বা পর্ব্বতের পিঠে লাগিয়া থামিয়া যাই-তেছে, কোথাও বা গুহার মধ্যে ঢুকিয়া চোকের অগোচর হইতেছে। কখন কখন সূর্য্যের কিরণ সে পাতলা মেঘ ফুঁড়িয়া পৃথিবীর নিকটে নিজের অক্ষত গৌরব বিকাশিতেছে। শিখরটী পৃথিবীর পিঠ হতে এত উঁচু যে, নীচের দিকে চাহিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া পড়ে! আমাদের কাছে নীচে এক পাশে এক প্রকাণ্ড গুহা, পরিধিতে প্রায় পঞ্চাশ হাত, তার মধ্যে দাতা ভৃগু ও রামানন্দের পদচিহ্নময় দুই পাষাণ খণ্ড রহিয়াছে। শুনিলাম, ঐ ভীষণ কন্দরে এক সন্ন্যাসী বাস করেন, তীর্থযাত্রীদের দানে তাঁর জীবন ধারণ হয়। পর্ব্বতের চারদিকে আরও অনেক গুহা দেখা গেল, আর মাঝে মাঝে অনেক রন্ধ্র দেখিলাম। দূরে পূর্ব্বদিকে ছোট বড়

অনেক পাহাড় ও সবুজ গাছপালা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পশ্চিমে মরু-ভূমির উপর বালি ধূ ধূ করিতেছে। অনেক দূরে একটী সাদা জিনিস দেখিলাম, শুনিলাম, উহা যোধপুরের রাজপ্রাসাদের চূড়া; সময়ে সময়ে উহা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। আবার কতক এদিকে এক শস্যময় উর্ব্বরা উপত্যকা অবলোকিলাম। আরও নিকটে আরাবলীর শিখর সকল উঠিয়াছে; কোনটার গায়ে মেঘ লাগিয়া আছে, কোনটার মাথায় বরফ গলা জলের চিহ্ন রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে পুরাণ দেবালয় ও প্রাচীর-বেষ্টিত কোটের ভগ্নাবশেষ আরাবলীর পূর্ব্বগৌরবের পরিচয় দিতেছে। সকলই অদ্ভুত ও সকলই নিস্তব্ধ। কিছু ডানদিকে দৈলওয়াড়ায় মন্দির রাশির শুভ্র চূড়াসকল ছুঁচের মত উঠিয়া সূর্য্যরশ্মিতে ঝকিতেছে, তাদের চারপাশে লতা ও বনজঙ্গল, মাঝে মাঝে রূপার দড়ির মত অতি সরু নদী বাঁকিয়া চুরিয়া ঢালু পর্ব্বতের পায়ের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ঐ পর্ব্বতময় প্রদেশের চারদিকে এক অনুপম, অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছে; প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব বৈপরীত্য ভাব ঘটিয়াছে—নীলবর্ণ আকাশ ও বালিময় প্রান্তর, মর্ম্মর মন্দির ও বিনম্র কুটীর, মনোহর নিকুঞ্জ ও কর্কশ পাষাণ। স্বভা-বের মাহাত্ম্যের পর্য্যালোচনায় আমরা মুগ্ধ রহিলাম। আমাদের মন ধ্যানময় হল। নিজেকে অতি অকিঞ্চিৎকর ভাবিলাম। মনে হল, যেন প্রকৃতির স্রষ্টার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহার অচিন্ত্যনীয় ক্ষমতা ও প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় মহিমার চিন্তায় মগ্ন থাকিলাম!—বেলা হতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে ধ্যান ভাঙ্গিয়া আমরা নীচে নামিতে আরম্ভিলাম।

গুরু শিখর হতে নামিতে অধিক কষ্ট হয় নাই। গন্ধময় কুঞ্জের ভিতর দিয়া চলিলাম, আর এখানে সেখানে কত মন্দির দাঁড়াইয়া আছে, পাশে অনেক গুহা হাঁ করিয়া রহিয়াছে, দুই একটার ভিতর বিকটাকার মানুষও দেখিলাম। দুই ঘণ্টার মধ্যে আমরা অচলেশ্বর শিখরের তলায়

পৌঁছিলাম। অচলেশ্বরের দেবালয়ে একটী বিস্ময়কর দৃশ্য আছে, ইহাকে 'মহা অগ্নিকুণ্ড' বলে। ইহা প্রায় ছয়শ হাত লম্বা ও এক শ আশি হাত চওড়া, নিরেট পাষাণের মধ্য হতে উৎখাত, ইহার চার পাশে নিরেট পাথরের গাঁথুনি। এই কুণ্ডের এক পাশে ছোট ছোট মন্দির, অপর পাশে আবু পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অচলেশ্বরের পবিত্র ধাম। মন্দিরের চার দিকে অনেক প্রকাণ্ড গাছ, তাদের মধ্যে আমের গৌরব অধিক; আম-গাছের ডালের উপর আবার দ্রাক্ষালতা জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়াছে। পাশে চাঁপা, চামেলী, সেউতি, মোগরা প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া চমৎকার মনোহারিতা জন্মাইয়াছে।

অচলেশ্বর ত্যজিয়া আমরা অচলগড় নামে এক পুরাণ ধ্বংসাবশিষ্ট গড় দেখিতে গেলাম। এক কালে ইহা প্রামারা রাজপূতদের রাজভবন ছিল, এখন ইহার অতি দুরবস্থা। দুর্গের চারদিকে পাথরের দিয়াল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে বলভী, কিন্তু সকলই এখন ধ্বসিয়া পড়িতেছে। আমরা চাঁপাপোল নামে এক দরজার ভিতর দিয়া ঢুকিলাম, প্রবেশ মাত্র জৈনদের পরেশনাথ মন্দির দেখিতে পেলাম। গড়ের সুমুখে একটী ছোট হ্রদ, ইহাতে এখনও জল আছে। প্রামারা রাজ-পুতকুল অত্যন্ত বীর ও সাহসী ছিল, তাহারা নিজেদের রাজ্য রক্ষা করি-বার জন্য এই গড়ে থাকিয়া বহুকাল যুঝিয়াছিল, নিজদেশের নিমিত্ত ধনপ্রাণ, সকলই বিসর্জ্জিয়াছিল। অচলগড় রাজপুতদের একটী মহা তীর্থস্থান।

অচলগড় হতে নামিয়া অনেক জৈন মন্দির দেখিতে দেখিতে আমরা দৈলওয়াড়ায় গেলাম। রাত্রিতে এক মন্দিরের পাশে আশ্রয় নিয়া পর দিন জৈনদের প্রসিদ্ধ বৃষভদেবের মন্দির দর্শনে বেরুলাম। আবু পর্ব্বতের অধিত্যকায় যে সকল মন্দির বা দেবালয় দেখিলাম, তাদের মধ্যে, আমার

বোধ হয় সমস্ত ভারতবর্ষে, বৃষভদেবের মন্দির সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট। তাজ-মহল বাদ দিলে এমন রমণীয় ঐশ্বর্য্যময় অট্টালিকা পৃথিবীতে আর কোন স্থানে দেখা যায় না। জৈনদের এই চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভের সৌন্দর্য্য বর্ণিতে আমি একান্ত অক্ষম। এত শতাব্দের পর, এত অত্যাচারের পর এই অক্ষয় কীর্ত্তির পূর্ব্বগৌরব হ্রাস পায় নাই। সমস্ত মন্দির শুভ্র, বিশুদ্ধ মর্ম্মর পাথরে নির্ম্মিত, প্রত্যেক স্তম্ভ ও গম্বুজ নানাপ্রকার আকৃতি ও অলঙ্কারখচিত; তাদের সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিতা একেবারে অবর্ণনীয়। প্রতি ঘরের ভিতর দিয়ালে ও ছাদে এমন উৎকৃষ্ট কাজ যে এক একটী ঘরে এক এক দিন কাটালেও তার শোভা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ধন, পরিশ্রম, কৌশল ও রুচি সকলেরই অজস্র অপরিমিত ব্যবহার এই অতুল প্রাসাদে জাজল্যমানরূপে লক্ষিত হয়। এক একটী সামান্য থামের শিল্প চাতুরী বিস্তারে লিখিতে গেলে এক একটী অধ্যায় হইয়া পড়ে, আর তার লাবণ্যের যথার্থ বর্ণনা করা কজনের সাধ্য? এইখানে স্থপতিবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখিলাম; গৃহ-নির্ম্মাণে হিন্দুরা যে কি পর্য্যন্ত পারদর্শী ছিল, তাহা এই মন্দির দর্শনে জানিলাম। কতকক্ষণ পরে আমরা একটী বড় ঘরে কেশবনাথের পূজা দেখিয়া মন্দির হতে প্রস্থান করিলাম। যাইতে যাইতে জৈনদের অনেক দেবতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম, প্রতি বড় স্তম্ভের গায়ে কত জিনেশ্বরের প্রতিরূপ খোদা রহিয়াছে। আর একটী বিষয় লক্ষিতাম, এখানেও যবনদের অত্যাচারের চিহ্ন রহিয়াছে। এমন ধনী মন্দির নাই, যেখানে দুর্দান্ত যবনের কুঠারের আঘাত দেখি নাই।

বৃষভনাথের মন্দির হতে নামিয়া আরও অনেক মন্দির দেখিলাম কিন্তু উহার কাছে আর কোনটা ভাল লাগে না। অবশেষে আমরা বশিষ্ঠের মন্দিরের উপলক্ষে যাত্রা করিলাম। এ স্থানটী অতি রমণীয়;

এখানে অনেক উদ্ভিজ্জের সদ্ভাব, লোকজনের অধিক সমাগম, আর ছোট নদী ও লতাপাতার বিশেষ প্রচুরতা। শস্য ও আম, বেদানা, খেজুর প্রভৃতি বড় গাছ রাশি রাশি রহিয়াছে, চার দিকে রাজার কোট ও প্রজার কুটীর উঠিয়াছে, আর জলের ধারে চাঁপা, চামেলী প্রভৃতি ফুলের ছড়াছড়ি। বিবিধ প্রাচীন মন্দির, বাড়ী, ও কন্দরের পাশ দিয়া আমরা 'নুকি তালাও' নামে একটী পরম সুন্দর হ্রদের নিকটে আসিলাম। হ্রদটী প্রায় আট শ হাত লম্বা, ইহার দৃশ্য এমন সুরম্য যে, ইহার ধারে সমস্ত জীবন কাটালেও কষ্ট বোধ হয় না। হ্রদের চারদিকে পাহাড়, শিখরের পর শিখর উঠিয়া গিয়াছে, জলের চার পাশে নানারকমের গাছ, গুল্ম, লতা ও ঝোপ, হ্রদের বুকে অনেক প্রকার জলজন্তু মনের আনন্দে ভাসিতেছে। আমরা এই মনোহর হ্রদের শোভা দেখিতে দেখিতে বশিষ্ঠ আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম।

দেবালয়ের পূজা দেখিয়া আমরা আশ্রমের পাশে বিশ্রাম নিলাম। আমরা মন্দির দর্শনে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, অধিত্যকা। বশিষ্টমন্দির আমাদের শেষ দ্রষ্টব্য স্থান, অতএব এইখানে অকুণ্ঠিত ভাবে শরীর ও মনের আরামে প্রবৃত্ত হলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমি এক পাথরের উপর বসিয়া স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্য পর্য্যালোচিতে থাকিলাম। ঐ আশ্রম ও হ্রদ দেখিয়া আমার অতি প্রাচীন কালের কথা মনে আসিল। বোধ হল যেন আমি বাল্মিকীর আশ্রমে উপস্থিত, একদিকে মহর্ষি বাল্মিকী ধ্যানে মগ্ন, আর এক দিকে পতিপ্রাণা সীতা বিষণ্ণভাবে বসিয়া পতিচিন্তায় রত আছেন। নির্ম্মলহৃদয় লবকুশ মাকে ছাড়িয়া হ্রদের ধারে প্রফুল্ল মনে অবাধে খেলা করিতেছে। —আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। ক্ষণেক পরে আরতীর বাজনার শব্দে আমি জাগিয়া উঠিলাম। সন্ধ্যাকালের পূজা দেখিয়া আমরা সকলেই নিদ্রা

গেলাম। পরদিন সকালে আবু পর্ব্বত থেকে অবতরিতে প্রস্তুত হলাম।

পর্ব্বত হইতে নামিতে নামিতে অনেক ভাঙ্গা থাম ও পড়া মন্দির দেখিতে পেলাম, ভাবিলাম এ সকলের এক কালে কেমন গৌরব ও আদর ছিল, আজ এ গুলির কি দুরবস্থা। আবুর মাহাত্ম্য দেখিয়া ভাবিলাম, প্রাচীন কালে হিমালয়ের কৈলাস পর্ব্বতের কি শোভা ও গৌরব ছিল! অবনতি ও অত্যাচারের সময়েও হিন্দুরা এই সকল কীর্ত্তি স্থাপিয়াছে, না জানি সমৃদ্ধি ও গৌরবের সময়ে আর্য্যদের কি সমুন্নত ও সম্ভ্রান্ত অবস্থা ছিল! অতি মনের কষ্টে আবু পর্ব্বতকে বিদায় দিলাম। প্রাচীন হিন্দুদের কথা মনে আসিল, তাঁদের অসামান্য গুণ ও কীর্ত্তিকলাপ স্মরিলাম। ভাবিলাম তাঁদের ন্যায় সাহস, দেশভক্তি, ধর্ম্মভক্তি, মান, আতিথেয়তা ও সরলতা আর কোন্ জাতিতে দেখা যায়? আবার অনেক কাল উৎপীড়নের পর হিন্দুদের অবস্থা ভাবিলাম। আকবরের মন্ত্রী আবুল ফাজ্‌ল হিন্দুদের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—হিন্দুরা ধার্ম্মিক, সদাচারী, অতিথি সেবারত, প্রফুল্লচিত্ত, জ্ঞানপ্রিয়, ন্যায়পরায়ণ, কর্ম্মিষ্ঠ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, ও অটলবিশ্বাসী। বিপদকালে তাদের চরিত্র সর্কলের অপেক্ষা সমুজ্জ্বলভাবে শোভা পায়। তাহাদের সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কখন পালাতে জানে না, আর যখন রণে পরাজয়ের সম্ভাবনা হয়, তাহারা ঘোড়া থেকে নামিয়া বিক্রমের ঋণ পরিশোধস্বরূপ অকাতরে নিজেদের জীবন ফেলিয়া দেয়।

এখনকার রাজপুতদের বর্ত্তমান অবনতি সত্ত্বেও তাহাদেরই যথার্থ আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল; তাহারাই রামলক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির-অর্জুনের যথার্থ পরপুরুষ, আর সাধারণতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুরাই যথার্থ হিন্দু নামের যোগ্য, বাঙ্গালীরা হিন্দুদের অপভ্রংশমাত্র। ভাবিলাম

এই শ্রেষ্ঠ জাতির আজ কি দুর্দ্দশা উপস্থিত; অনৈক্য, মূর্খতা, কুসংস্কার, পরাধীনতা ও ঔদাসীন্যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। এক কালে যে হিন্দু নাম জগদ্বিখ্যাত ও সকলের মাননীয় ছিল, আজ সে হিন্দু নামের জ্যোতি একেবারে লোপ পাইয়াছে, এখন হিন্দুরা কেবল পরের নিন্দা ও অবজ্ঞার আস্পদ হইয়াছে!

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মা।

আমরা আরাবলীর অধিত্যকা হতে নামিয়া ক্রমাগত পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিলাম। এখন আমরা মেওয়াড় ছাড়িয়া মারওয়াড় দেশের ভিতর উপস্থিত। ক্রমে সে গাছপালা, বনজঙ্গল, হ্রদনির্ঝর, পাহাড়-পর্ব্বত, মন্দিরদেবালয় ছাড়িয়া নীরস ও উদ্ভিজ্জহীন স্থলে আসিয়া পড়িলাম। দিনের বেলা ভয়ানক গরম, কিন্তু রাত্রি বেশ ঠাণ্ডা; পথে মধ্যে মধ্যে অতি কষ্টকর গরম বাতাসের ঝলকা বহিতে লাগিল। ফাল্গুন মাসের শেষ, ইহার মধ্যেই এখানে সকাল বেলা দশটার সময় রাস্তায় চলা ভার, আর বাতাস সর্ব্বদাই শুক্‌না, জলবায়ুও সাধারণতঃ অত্যন্ত শুক্‌না। ক্রমে আমরা আরাবলীর তলে এক ছোট নগরে পৌঁছিলাম। সেখানে এক রাত্রি বিশ্রাম করিয়া আমরা মারওয়াড়ের রাজধানী যোধপুরের দিকে চলিলাম। এখানে আর হাতীও চলে না, ঘোড়াও চলে না; আমরা প্রকাণ্ড উটের উপর বসিয়া জনপ্রাণীশূন্য মরুভূমির ভিতর দিয়া অতি বিষণ্ণ মনে যাত্রা করিলাম।

এখন চারদিকে কেবল বালি ধূ ধূ করিতেছে, সবুজের নামমাত্রও নাই; চোকের তৃপ্তিকর একটীও বস্তু নাই, কেবল সূর্য্যের তীব্র কিরণ বালিকনার উপর পড়াতে বালি রাশি চিকিমিকি করিতেছে, তাহাতে দর্শন ইন্দ্রিয়ের কষ্ট দুগুণ বাড়াইতেছে। দুপাশে আলগা বালি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট বালির পাহাড় ও উপত্যকা।

বাতাসের বেগে এই সকল কৃত্রিম পাহাড় ও উপত্যকা কখন ভিন্ন আকার পাইতেছে, ও কখন বিলীন হইয়া যাইতেছে; আবার কোথাও বা বালি রাশি জমা হইয়া নূতন পাহাড় ও উপত্যকা সৃজিত হইতেছে। বালির পাহাড়গুলি উঁচুতে পনর হাত থেকে প্রায় ষাট হাত পর্য্যন্ত, আর সে গুলির বিচিত্র আকার দেখিলে আশ্চর্য্য হতে হয়। এই সুমুখে একটা পাহাড় দেখিলাম, ক্ষণেক পরে এক বাতাসের ঝলকে তাহা লণ্ড ভণ্ড হইয়া গেল। সময়ে সময়ে চারদিকে এত বালি উড়ে, যে যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়, শুনিয়াছি গ্রীষ্মকালে ঝড়ের সময়ে এই মরুভূমির উপর গমনা-গমন একেবারে স্থগিত থাকে। কোথাও বা একটা বড় পাহাড় এমনি কাঠিন্য ভাব ধরিয়াছে যে সেটা ভস্‌কা বালির নির্ম্মিত বলিয়া জ্ঞান হয় না, আর তাহার উপর ঘাস ও বাবুর, বৈর প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ গজানতে স্বাভা-বিক পর্ব্বতের ভ্রম জন্মাইয়া দেয়। মাঝে মাঝে দুই একটা ছোট গোল খড়ুয়া ঘর দেখিতে পেলাম। সেগুলির উপরভাগ মোচার আগার মত সরু, দেখিতে অবিকল শস্যের গোলার ন্যায়। তাহার ভিতর এই নির্জ্জলা মরুভূমিতে কিরূপে যে লোকে বাস করে তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক।

পথে দুই একটা শাখা নদী পারিয়া ক্রমে আমরা লূনী নদীর নিকটে উপস্থিত হলাম। ইহার পাশের জমী কিছু ভিজা ও উর্ব্বরা, আর দুই পাশে শস্যও জন্মিয়াছে। এইখানে পৌঁছিয়া আমরা বিশ্রাম নিলাম। আবার সবুজ দেখিয়া নরলোকে আসিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল; গৌরব-ময় আরাবলী পর্ব্বতের পরে ক্রমাগত বালির উপর চলার কষ্ট যথাসাধ্য দূর করিতে চেষ্টা পেলাম। কিছুকাল এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ালাম। দেখিলাম লূনীর জল লোনা, এই জন্যই নদীর নাম লূনী; মারওয়াড়ের অর্দ্ধেক শস্যের উৎপত্তি এই নদীর উপর নির্ভরে। ইহার আর একটী বিচিত্রতা দেখিলাম। কোন কোন স্থানে নদীর দুই পাশেই কতকদূর

উর্ব্বরা, কোন স্থানে বা এক দিকে সবুজ অন্য দিকে বালি, আবার কোথাও বা কোন পারেই কিছু শস্য হয় নাই। নদীর পাশে মাঝে মাঝে গভীর কূয়া প্রস্তুত হইয়াছে, সেগুলির জল মিষ্ট, উহা পীয়াই গ্রামের লোকেরা প্রাণ ধরে।

লুনী নদী পারিয়া আবার আমরা যোধপুরের দিকে চলিলাম। ক্রমে বালি আরও ভারী হইয়া আসিল; কিন্তু উটেরা ও মারওয়াড়ীরা, মাঠে যেমন লোক চলে, সেইরূপ অনায়াসে মরুভূমির উপর দিয়া যাইতে লাগিল। দূরে যোধপুরের উঁচু গড় এক পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম এ মরুভূমি কখন মানুষের বাসযোগ্য স্থান হতে পারে না, কিন্তু এই বালির মধ্যেই মারওয়াড়ের রাজধানী যোধপুর স্থাপিত হইয়াছে। আমরা নগরে পৌঁছিয়া দুইদিনের জন্য সেখানে অবস্থান করিলাম।

রাজপুতেরা অনেক ভিন্ন কুলে বিভক্ত; তাহার মধ্যে চৌহান, শিশোদিয়া, রাহতোর ও কাছওয়া প্রধান। চৌহানদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লী ছিল, তাহাদের রাজ্য একেবারে লোপ পায়, এখন তাহারা নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের আর সে পূর্ব্ব প্রভাব বা গৌরব নাই। শিশোদিয়া কুলের বাসস্থান মেওয়াড়, কাছওয়াদের রাজ্য জয়পুর, আর রাহতোরদের রাজধানী যোধপুর। যোধপুর, জয়পুর বা উদয়পুরের মত অপরূপ নয়। নগরের চারপাশে ছোট পাহাড়, তাদের মধ্যে সকলের উঁচুটীর উপর এক গড় নির্ম্মিত হইয়াছে। দুর্গটী নগর থেকে একেবারে স্বতন্ত্র, উহার উপরভাগে রাজার প্রাসাদ; রাজবাড়ী সমতল হতে প্রায় দুই শ হাত উঁচুতে অবস্থিত। অন্যান্য রাজপুত রাজধানীর ন্যায় যোধপুরও চারিদিকে কঠিন প্রাচীরে বেষ্টিত, আর পাহাড়ের উপরে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গোল বলভী উঠিয়া পাহারা দিতেছে।

উহাদের ভিতরে যাবার জন্য অনেকগুলি বড় দরজা আছে, আর নগরের পথ অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহাড়ের উপরে উঠিয়া গিয়াছে। ঐ কুটিল-গামী পথে নানা প্রতিবন্ধক নিক্ষিপ্ত আছে, মধ্যে মধ্যে প্রহরীরা সতর্ক-ভাবে উহার রক্ষা করিতেছে ; শত্রুরা শীঘ্র এ নগর উল্লঙ্ঘিতে পারে না। নগরের ভিতরে দুইটী হ্রদ ও একটী কুণ্ড ; রাস্তাগুলি অতি পরিপাটী ও উহাদের দুইধারে চমৎকার পাথরের বাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাজবাড়ী কেবল একটী নয়, অনেকগুলি মনোহর প্রাসাদ একত্রে শোভা পাইতেছে ; ভিন্ন ভিন্ন রাজা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রাজভবন নির্ম্মাইয়াছেন।

আমরা যোধপুরের প্রধান দৃশ্যগুলি দেখিয়া এই মরুভূমির রাজধানীকে বিদায় দিলাম। এইবার আমাদের দৃশ্য দেখা শেষ হল বলিয়া মনে বড় বিষাদ জন্মিল। অতি দুঃখভরে আবার সেই নীরস, মর্ম্মভেদী মরুভূমির উপর দিয়া জয়পুর উপলক্ষে যাত্রা করিলাম। উমাচাঁদ বাবু ছাড়া আমার সঙ্গে আর কোন ভদ্রলোক ছিল না, মেওয়াড়ী রাজপুতজীকে উদয়পুরে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, এখন কেবল জনকতক মারওয়াড়ী পথদর্শক আমা-দের পথ দেখাইয়া নিয়া গেল। উমাচাঁদ বাবু ও আমি, আরাবলী, বৃষভ-দেব, উদয়পুর, রাজপুতজাতি সম্বন্ধে নানা গল্প করিতে করিতে চলিলাম। কিন্তু আমার মন ক্রমে বড় বিষণ্ণ হইয়া আসিল, কিসের দুঃখ তাহার নির্ণয় নাই, কিন্তু আমার অন্তরে যেন একটা অকথণীয় শোকভাব বাজিতে লাগিল। আমার স্বভাব চিরকালই এরূপ, একটা না একটা হৃদ্বৃত্তি সর্ব্বদা আমাকে আন্দোলিয়া থাকে ; আমার হৃদয়ের কখন বিশ্রাম নাই। বোধ হয় মহিমাময় স্বাভাবিক দৃশ্যের পর মৃত্যুবৎ মরুভূমি দর্শনে আমার অন্তরে ঐরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সাংসারিক মানুষের সুখের পর দুঃখ, হর্ষের পর খেদ, সৌভাগ্যের পর দুর্ভাগ্য প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু এমন বিচিত্র প্রদেশে ভ্রমণকালে সহসা আমার মন ঐরূপ মলিন হইয়া

আসিল—ইহার কারণ কি? যাহা হউক, আমার বিষাদের কথা উমাচাঁদ বাবুর কাছে না প্রকাশিয়া আমি নিস্তব্ধভাবে চলিলাম।

চারিদিকে ক্রমাগত শুক্না বালি ধূ ধূ করিতেছে, তাহার আর অবধি নাই। ভাবিলাম যেন বালির সমুদ্রের উপর ভাসিতেছি, আকাশ আমাদের একমাত্র সহচর। অনেক দূর পরে আবার একটি ছোট সবুজ স্থান দেখিতে পেলাম। অনেক কষ্টের পর সুখ হলে লোক যেরূপ উচ্ছ্বসিত হয়, আমরা সেইরূপ উল্লসিত মনে ঐ মরু মধ্যস্থ শাদ্বল স্থানের দিকে চলিলাম। ক্রমে ঐ ওয়াসিসে উপস্থিত হইয়া মানুষ, জন্তু, সকলেই কয়েক ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম নিলাম। সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের মত মরু মধ্যে এই উর্ব্বরা ভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে। স্থানটী অপ্রশস্ত, উহাতে একটী ছোট জলাশয় আছে, আর নানা রকমের ফল ফুলের গাছ উঠিয়াছে। কি মানুষ, কি জন্তু আমরা সকলেই প্রাণ ভরিয়া এই সুখময় দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম, আর সতৃষ্ণভাবে চারদিকে বিচরিলাম। কিন্তু স্থানটী অতি ক্ষুদ্র, আর এখনও অনেক মরুভূমি অতিক্রমিতে হবে এইজন্য অতি অল্প সময় সেখানে থাকিলাম। ভাবিলাম এই ওয়াসিসকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাই, কিন্তু সে সংকল্প বৃথা। মানুষ সর্ব্বদা সুখ চাহে, কিন্তু সংসারে দুঃখের অপেক্ষা সুখের ভাগ অনেক অল্প ও অনেক ক্ষণ-স্থায়ী। মরুভূমির মধ্যে উর্ব্বরা স্থান পাইয়াও আমাদের সেইরূপ সুখ হল।

এইরূপে ক্রমাগত বালির উপর চলিয়াও অনেক দূর অন্তর এক একটী ছোট ওয়াসিসে আশ্রয় নিয়া কয়েক দিন কাটিল। আমরা বরাবর যোধপুরের উত্তর পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিলাম। এক দিন সকালে এক অপরূপ দৃশ্য দেখিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সময়ে রাজ-পুতানায় দিনের বেলা বেশ গরম হলেও রাত্রে কলিকাতার অপেক্ষা অধিক শীত হয়। ঐ সকালের আগের রাত্রিতে অতিশয় শীত লাগিয়া-

ছিল। পরে আর একবার মরীচিকা দেখিয়াছিলাম, তাহা ইহার অপেক্ষাও চমৎকার বোধ হইয়াছিল, কারণ তখন গভীর শীতকাল ছিল, শীতকালেই প্রায় ঐরূপ অদ্ভুত ঘটনা ভাল দেখা যায়। প্রথমে দিঙ্-মণ্ডলের প্রান্ত হ'তে গাঢ় ধোঁয়া আকাশে উঠিল, ক্রমে সে ঘন ধোঁয়া রাশি স্বচ্ছ হইয়া আসিল, আর তাহাতে নীচস্থ বস্তু প্রতিফলিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য পরিস্ফুটিল। আকাশে যেন এক রমণীয় উদ্যান সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে সকল উদ্ভিজ্জই অতি বিচিত্ররূপ ধরিয়াছে। সামান্য ঘাস রাই শস্যের মত উঁচু দেখিলাম, গুল্মগুলি বড় বড় গাছের আকার পাইয়াছে একটা চাবা বাবুল দীর্ঘাকার অশ্বত্থ গাছের পরিমিত বোধ হল। উদ্যানে এক সুন্দর জলাশয় ঝকিতেছে, চার পাশে দেবালয়ের চূড়া উঠিয়াছে, মধ্যে এক মনোহর প্রাসাদ বিরাজিতেছে, সকল দ্রব্যের এক অনুপম শোভা। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উহার নিকট হীনপ্রভ মনে হল। সকলই যেন এক অপ্রতিম চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত রহিয়াছে। হঠাৎ ধোঁয়া রাশি ভেদিয়া সূর্য্যের রশ্মি চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ সে প্রাসাদ, মন্দির, শিখর, গাছপালার সংলগ্নতা ভাঙ্গিয়া গেল। সকলই অবিচ্ছিন্ন ও অস্পষ্ট দেখিলাম। ক্রমে যত সূর্য্যকিরণ প্রবেশিয়া ধোঁয়াজালকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিল, তত সে চিত্র বিচিত্রিত হল; এক সংলগ্ন প্রতিকৃতির পরিবর্ত্তে বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন ছায়া অবলোকিলাম। সূর্য্যের জ্যোতি আরও তীক্ষ্ণ হওয়াতে সে অপূর্ব্ব দৃশ্য বিলীন হইয়া গেল, যেন কোন কুহকীর মন্ত্রজালে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে জলাশয়, দেবালয়, রাজনিকেতন—সকলই একেবারে লোপ পাইল। শুনিয়াছি এরূপ চাক্ষুস ভ্রম মরুভূমিতে প্রায় ঘটিয়া থাকে। এরূপ সুন্দর ও অপরূপ দৃশ্য পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

এই আকাশে চিত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার চলিলাম। তখন

আমার জীবনেও ঐরূপ কত মরীচিকা দেখিতেছিলাম, আর সেগুলি কি মধুর ও মনোহর বোধ হত! আঃ হুঁতোরাম! তোমার বয়সে তুমি কত জীবন মরীচিকা দেখিয়াছ, তাদের মায়াজালে পড়িয়া কতবার দিশেহারা হইয়াছিলে, কতবার তাদের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে এই জীবন মরুতে কতদূর বিপথে ধাবিয়াছ! যৌবনকালে আকাশ মরীচিকা অপেক্ষা সংসার মরীচিকা কিরূপ অধিক প্রলোভক ছিল, তাহা কি এখন মনে পড়ে? তখন কি বিশ্বাস করিতে যে, আকাশের অপেক্ষা জীবনে অনেক অধিক মুগ্ধকারী মায়াজাল বিস্তৃত আছে? তরুণ বয়সে সরল হৃদয়ে সকলই সরল বুঝিতে; ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ নূতন আকাশকুসুম রচিতে, তোমার নিকট জগত, সংসার সমস্তই প্রাসাদ, পর্ব্বত, জলাশয় বিশিষ্ট রমণীয় কানন বোধ হত। কিন্তু হায়! দারুণ বিধি তোমার সে সব প্রাসাদ, পর্ব্বত, জলাশয় একে একে ভাঙ্গিয়া দিল; অভিজ্ঞতাসূর্য্য সে সব জীবনমরীচিকা বিকীর্ণ করিল!

ক্রমে আমরা মরুভূমির প্রান্তে উপস্থিত হলাম, বালি কমিয়া আসিতে লাগিল, আর সুমুখে দুই চারটা পাষাণময় পাহাড় দেখিতে পেলাম। জমী এখনও নির্জ্জল ও অনুর্ব্বরা কিন্তু দূরে বালির পরিবর্ত্তে নুনের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। চারদিকে নোনা ও চূনা পাথর দেখিলাম, সমতল মরু-ভূমি ছাড়িয়া ঐ দুই পাথরময় পাহাড়ের প্রদেশে পৌঁছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মারওয়াড় রাজ্যের সীমাস্থিত সম্ভর হ্রদ আমাদের পথ রোধিল। আমরা সেইখানে থামিয়া ঘণ্টা কয়েক বিশ্রাম নিলাম ও ঐ হ্রদের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ালাম।

হ্রদের জল নোনা। কথিত আছে, নিকটস্থ পাহাড় হতে নুন ধুইয়া গিয়া উহার জলকে নুনময় করিয়াছে। হ্রদটী লম্বে প্রায় দশ ক্রোশ, প্রস্থে এক ক্রোশ হতে চার ক্রোশ, আর পরিপূর্ণ অবস্থায় এক হাত হতে

তিন হাত মাত্র গভীর। কিরূপে নুন তয়েরি হয় তাহা দেখিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনিলাম গরমকাল নুন সংগ্রহিবার সময়। জিজ্ঞাসাতে জানিলাম যে, বর্ষাকালে বৃষ্টিতে হ্রদটী জলে পরিপূর্ণ হবার পর শরৎকাল উপস্থিত হলে উহার জল উপিতে আরম্ভে, পরে আট মাস ঐরূপে ক্রমাগত জল শুকাতে থাকে। সমস্ত জল উপিয়া গেলে হ্রদের তলায় ছানির মত নানা রঙের জমাট নুন পড়িয়া থাকে। মজুরেরা —স্ত্রী, পুরুষ—সকলে কাদা ভাঙ্গিয়া গিয়া হাত দিয়া সেই শক্ত নুন তুলে আর ঝুড়িতে পুরিয়া তীরে নিয়া আসে। নীল, সাদা ও লাল এই তিন রকম নুন হ্রদে পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর গড়ে নয় লক্ষ মোণ নুন উঠে। হ্রদটীতে জয়পুর ও যোধপুরের মহারাজা দুজনেরই অধিকার, আগে তাঁদের লোকদ্বারাই নুন সংগ্রহিত হত, কিন্তু কয়েক বৎসর হল, ইংরেজ সরকার সন্ধির দ্বারা সম্ভর হ্রদের পাট্টা নিয়াছে। এখন ইংরেজরাই নুন সংগ্রহে, পরিষ্কার করে ও অন্যত্র চালান দেয়।

আমরা সম্ভর হ্রদ ছাড়িয়া আবার যাত্রা করিলাম। ক্রমে সে রাশি রাশি বালি দূরে ফেলিয়া গাছপালার জমীতে আসিলাম। পরদিন সকালে আমরা জয়পুরে পৌঁছিলাম। উমাচাঁদ বাবু আবার তাঁর কাজে ব্যস্ত থাকিলেন। আমি দিন দুই চার জয়পুরে বিশ্রাম করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাব নির্দ্ধারিলাম। এইবার ভ্রমণ শেষ হতে চলিল বলিয়া আমি যার পর নাই কষ্ট পেলাম, আমার মন ক্রমে আরো বিষন্ন হইয়া আসিল। দিনরাত্রি আমি খালি আরাবলী, আবু, উদয়পুর, হলদীঘাটের নাল, প্রতাপসিংহ, রাজপুতকুল, প্রাচীন হিন্দুজাতি আমাদের পূর্ব্বগৌরব স্মরিতে লাগিলাম। কখন বা কলিকাতার কথা ভাবিয়া কাতর হলাম। আবার গিয়া মাকে দেখিব, তিনি আমার জন্য চিন্তিত আছেন, আমাকে আবার সুস্থ ও সবল আর কত নূতন জ্ঞানে জ্ঞানী দেখিয়া কত আহ্লাদ করি-

বেন; পিতা প্রভৃতি সকলেই আমার কুশল জানিয়া নিশ্চয়ই অতিশয় আনন্দ লভিবেন; জগদম্বা আমাকে এতদিনের পর পাইয়া কেমন হর্ষিত হবে, তাকে কত নূতন দেশ, নূতন লোক, নূতন জিনিসের কথা বলিয়া তার বিরহ যাতনা ভুলাইয়া দিব—এই সকল বিবিধ চিন্তায় আমার অন্তর অস্থির হইয়া রহিল। সকলের অপেক্ষা মাতার কথা ভাবিতে আমার হৃদয়ে অধিক ঘা লাগিল। তিনি, আমার কলিকাতা ছাড়িবার সময় বলিয়াছিলেন—হঁতো, বাবা, অনেক দিনের জন্য দূর দেশে যাচ্ছ, তা নিজের ভালর জন্য যেখানে যাও তাতেই আমি সুখী; বেঁচে থাকি ত আবার তোমাকে ভাল দেখিয়া মন জুড়াব।—আমি চিন্তিলাম এইবার মা আমাকে ভাল দেখিয়া কত সন্তুষ্ট হবেন—কিন্তু ক্ষণেক পরে আবার আমার মন যেন কেমন কেমন হল; ভাবিলাম আসিবার সময় মাকে বেশ সুস্থ দেখিয়াছিলাম, তবে তিনি "বেঁচে থাকি" একথা ব্যবহার করিলেন কেন? আবার ভাবিলাম, না, ও কথার কথা, মার প্রাণ, মা ছেলের জন্য কি না বলিয়া থাকেন? তিনি এখনও ঢের দিন বাঁচিয়া থাকিবেন। আজন্ম মাকে কষ্ট দিয়াছি, এইবার বড় হইয়া কত বড় কাজ করিব, তাঁকে কেমন সুখী করিব, তাঁর মলিন মুখ প্রফুল্ল দেখিব।

এইরূপ নানা বিচিত্র ভাবনায় আমার অন্তর জড়ীভূত থাকিল, এদিক ওদিক বেড়াইয়া নিজেকে স্থির রাখিতে চেষ্টা পেলাম। উমাচাঁদ বাবুর বন্ধু সেই রাজপুতজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কতক সময় কাটাতাম। তিনি আমাকে, আমি কি কি দেখিলাম, সে সম্বন্ধে কি ভাবিলাম, রাজপুতবংশ সম্বন্ধে আমার মনে কি হইতেছে—এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসিলেন। আমি তাঁকে অকপটভাবে তাঁর সকল প্রশ্নের উত্তর দিলাম; আর বলিলাম, এতদিন হিন্দুজাতির কীর্ত্তি ও যশ, রাজপুতকুলের বীরতা ও সাহসিকতা, স্বাধীনহৃদয়ের তেজ ও স্ফূর্ত্তি কেবল বইয়ে পড়িয়াই জানিতাম, এখন সে

সকল নিজ চোকে দেখিলাম, এত দিনের পর সে সকলের যথার্থ জ্ঞান লভিলাম। কিন্তু রাজপুতজীকে ঐ কথা বলিবার সময় ঐ সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে অত্যন্ত বেদনা পেতাম। আমাদের বাঙ্গালীদের হীনতা, নিঃসত্বতা ও গৌরব শূন্যতার বার্ত্তা আমার হৃদয়কে তিমিরাচ্ছন্ন করিল। কিন্তু সে মনের দুঃখ মনেতেই রাখিলাম, রাজপুতজীর নিকটে সে সকল কিছুই প্রকাশিলাম না। এইরূপে দুইদিন কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে হাত মুখ ধুইয়া বাড়ীর বারাণ্ডায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে ডাকওয়ালা উমাচাঁদ বাবুর নামে কলিকাতার এক চিঠি আনিল।

ওরে চিঠি! তুই এককালে আমাব কত আদরের ধন ছিলি, তুই আমাকে কত আশ্বাস দিয়া বাঁচিয়া রাখিতিস, তুই সময়ে সময়ে আমার মৃত দেহে জীবন সঞ্চারিতিস, কিন্তু সেই তুই আবার এমন নির্ম্মম, কঠোর, পাষাণহৃদয়! তুই সেদিন আমাকে কি সংবাদ আনিলি—তুই আমার তরুণ হৃদয়ে কি আঘাত দিলি! তোর অমৃতের সঙ্গে এত গরল! তুই যেমন আদরের ধন সেইরূপ অন্তরের শূল! তুই যেমন বাঁচিয়া রাখিস, সেইরূপ মারিয়া ফেলিস; তুই যেমন জীবন সঞ্চারিস, সেইরূপ জীবন সংহারিস!

মা! তোমার মৃত্যুর কথা শুনিয়া আমি যে চোকের জল ঝরিলাম তা কি তুমি জানিতে পারিয়াছিলে? সংসারে না প্রবেশিতেই সংসারের প্রধান গ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল, সে ব্যথা কি বুঝিয়াছিলে? পশ্চিমে যাইবার আগে তোমার কাছে যে বিদায় নিয়াছিলাম, সেই কি আমার কাছে তোমার শেষ বিদায় হল? ... না তা কখনই নয়। মা! আমি যে তোমার হৃদয়ে সদাই ছিলাম, তুমি আমাকে বুকের ভিতর করিয়া এ পৃথিবী হতে চলিয়া গিয়াছ। আমি তোমার সঙ্গেই আছি। তা না হলে কেন আমি তোমাকে দেখিতেছি?—কেন তোমার মুখের ছবি সদাই আমার সুমুখে আসিতেছে?

নিরন্তর কেন তুমি আমার হৃদয়ে জাগরুক আছ? তবে কে বলে যে তুমি আমাকে চিরকালের তরে ছাড়িয়া গিয়াছ—না—ঐ যে দেখিতেছি তুমি দরদরে অশ্রু বিসর্জ্জিলে, ঐ যে শুনিতেছি তুমি আমাকে শেষ আশীর্ব্বাদ আশীর্ব্বাদিলে, ঐ যে দেখিতেছি তুমি আমাতে শেষ চাহন চাহিলে।—ঐ যে পাষাণেরা তোমায় হরে নিয়ে গেল, ঐ যে ভীষণ হরিনাম আমার বুকে ধ্বনিল, ঐ যে ক্রুর শয্যায় তোমাকে শোয়াইল, ঐ যে পাষাণ্ড আগুণ তোমাকে গ্রাসিল!!!

মা! সেই যে দুলিতাম আমি তোমার কোলে আর হাসিয়ে হাসিয়ে তুলিতে আমারে মুখের কাছে, নাচাইয়ে নাচাইয়ে দেখাতে আমারে পরের নিকটে—সে যে এখনও আমার অন্তরে জাগিতেছে। মা! সেই যে আমি বলিতে না বলিতে, চাহিতে না চাহিতে আমার সাধ ও আবদার, আমার হর্ষ ও বিষাদ বুঝিতে একদণ্ডে, মা মা বলে ডাকিতাম তোমারে, তুলিতে আমারে বুকের উপরে—সে যে এখনও আমার অন্তরে জাগি-তেছে। মা! সেই যে আধ আধ কথায় বলিতাম তোমারে মনের কথা, ধরিতাম জড়িয়ে তোমার গলা, ধরিতে তুমি আমারে জড়িয়ে, দিতে গালে গাল, পাড়াতে ঘুম গাইয়ে গাইয়ে—সে যে এখনও আমার অন্তরে জাগিতেছে। মা! সেই যে শুনিতে আমার বুকের বাজনা, টানিতে আমার মধুর নিশ্বাস, চুমার পর চুমা বসাতে আমার মুখে, থাকিতে চাহিয়ে ঘুমালে পর, ঢালিতে চাহিতে মার ভালবাসা—সে যে এখনও আমার অন্তরে জাগিতেছে। মা! সেই যে ব্যারামের কালে বসিতাম আমি তোমার শিওরে, বুলাতাম হাত তোমার কপালে, বাবা বলে ডাকিতে আমারে, ফেলিতাম অশ্রু তোমায় নিরখিয়ে, চমকিয়ে উঠিতে থাকিয়ে থাকিয়ে, অন্বেষিতে আমারে 'হুঁতো হুঁতো' বলিয়ে—সে যে এখনও আমার অন্তরে জ্বলিতেছে। মা! মিশিলাম যবে মন্দ ছেলেদের

সাথে, পিতা করিলেন দূর ছাই, তথাপি তুমি ছাড় নাই আমার আশা, বলিতে সকলকে—হব আবার ভাল আমি; নিন্দিলে পিতারে অযত্নের তরে, ভৎর্সিলে তাঁরে নির্ম্মম বলে, ধরিলে আমারে বুকের উপরে—সে যে এখনও আমার অন্তরে জ্বলিতেছে। মা! শিখিলাম যবে আবার লেখাপড়া, ত্যজিলাম সকল অসৎ সঙ্গ, দিলাম মন পুস্তকের ভিতরে, উঠিলাম ছাড়িয়ে সকলেরে, পিতা তখন হলেন গর্ব্বিত, করিলেন তিনি আদর আমার, হয় নি তখন তোমার কোন গর্ব্ব, বলিলে কেবল—কহিয়াছিলাম হুঁতো আমার ভাল হবে আবার—সে যে এখনও আমার অন্তরে জাগিতেছে। মা! আবার যখন গেলাম বর্দ্ধমানে, হইল আমার বুদ্ধিভ্রম, আনিলেন খুড়া সঙ্গে করে, টলিল আমার প্রতি পিতার ভালবাসা, দেখিলেন তিনি আমারে কঠোর চোকে, করনি তখন তুমি হেয়জ্ঞান হুঁতোরে, তখনও ভালবাসিলে যেমন ভালবাসিয়াছিলে তুমি চিরকাল আমারে—সে যে এখনও আমার অন্তরে জ্বলিতেছে। মা! আবার অর্জ্জিলাম কত বিদ্যাজ্ঞান, হইল আমার যশরব, জুটিল কত বন্ধুবান্ধব, ডুবিল আমার প্রাণ নূতন প্রেমরসে, ধাবিল আমার মন নূতন আকাঙ্ক্ষায়, তথাপি বটগাছ ছড়ায় যেমন কত শাখশাখা চারদিকে, বিস্তারে কিন্তু বাহু তার জননী পৃথিবীর পানে, তেমনি অন্তর আমার আসিল ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তোমার হৃদয়ে—সে যে এখনও আমার অন্তরে জাগিতেছে। মা! হইল যখন ব্যারাম আমার, থাকিতে দিবারাতি বসিয়ে আমার পাশে, দিয়ে হাতে হাত, করে কোলে আমার মাথা, পারিতাম না এক পলক করিতে তোমার চোকের আড়াল, উঠিতাম আমি চমকিয়ে চমকিয়ে, তাকাতাম সতৃষ্ণে তোমার পানে, ঝাঁকিতে তুমি আমার উপরে, দিতাম তোমার হাত আমার বুকে, আবার ঘুমাতাম শিশুর মত শান্তভাবে—সে যে এখনও আমার অন্তরে জাগিতেছে। মা! থাকিতে যদি তুমি বাঁচিয়ে

এখন, হত না কথন পিতার হতবুদ্ধি, যেত না সংসার ছারখার হয়ে, ডুবিতাম না আমি বিষাদসাগরে, বেড়াতাম না ঘুরে বিজনে বিস্থানে, থাকিতাম মনের আনন্দে, রত হয়ে নিজ দেশের হিতে, করিতাম সুখী সকলেরে, মনের উল্লাস দিতাম তোমারে—সে যে এখনও আমার অন্তরে জ্বলিতেছে !! ‡

‡ এই অধ্যায়টীর ভাষা পাঠকদের কাছে অতি বিচিত্র বোধ হবে, কিন্তু উহা বদলাইলে স্বর্গীয় গ্রন্থকারের মনের ভাবগুলি ঠিক রাখা অসাধ্য হইবে এই বিবেচনায় উহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই। প্রকাশক।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

চাকরী।

কলিকাতায় পৌঁছিবার আগেই আমার মনে নানাপ্রকার দুঃখের চিন্তা উঠিল। মাতার বিয়োগ কষ্টে আমি একান্ত জর্জ্জরিত ছিলাম, কিন্তু তাহা ব্যতীত অন্য কারণে আমি যার পর নাই বেদনায় পিষিত হতে লাগিলাম। পূর্ব্বে অনেক দিনের পর বাড়ী ফিরিয়া যাবার সময় আমি কত আনন্দিত ও হর্ষিত হতাম, কিন্তু এবার পিতা, স্ত্রী, ও অপর অপর স্নেহের লোক বর্ত্তমান থাকিলেও একা মাতা বিহনে আমার কাছে নিজের বাড়ী অতি নিরানন্দ ও কষ্টদায়ক বোধ হল। ভাবিলাম এই-বার আমাদের লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল। বাস্তবিক মাই বাড়ীর প্রাণ ছিলেন, তাঁর অন্তর্ধানে তাঁর বাসস্থানও জীবনশূন্যপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। কে যেন আমার অন্তরে বলিয়া দিল যে, এইবার আমার সুখের জীবন ফুরাল, এখন কঠোর সংসারের বিষম যাতনা সহিতে আমাকে প্রস্তুত হতে হবে। যে কারণেই হউক আমি অতি বিষণ্ণভাবে ও সশঙ্কিতে পুনর্ব্বার নিজের বাড়ীতে পা দিলাম।

বাড়ী পৌঁছিয়া আমার হৃদয়ে যে কি তীব্র বেদনা অনুভবিয়াছিলাম তাহা আর বর্ণনার আবশ্যক নাই। রাজপুতানার নির্জ্জন মৃতবৎ মরু-ভূমি অপেক্ষাও উহা অধিক নির্ম্মম ও হৃদয়ভেদী বোধ হইয়াছিল। আসিয়া দেখিলাম সকল জিনিসেরই মহা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, চারদিকে সকল বিষয়েই মহা গোলমাল উপস্থিত। সমস্ত বাড়ী যেন জ্যোতিশূন্য,

ভাবিলাম একজন লোকের অবর্ত্তমানে কি ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা জন্মিয়াছে। কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, ক্রমে একটু একটু করিয়া ঐ পাষাণ ভূমিতে থাকিতে অভ্যস্ত হইলাম। বিদ্যালয়ে আবার যোগ দিয়া পড়িবার ও এম,এ উপাধি লইবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান গোলযোগে সে ইচ্ছা মনেতেই রহিল। কীর্ত্তিময় রাজপুতানায় ভ্রমণকালে যেমন নির্ম্মল সুখ ও আনন্দ লভিয়াছিলাম, দীপ্তিপূন্য নিজবাড়ীতে অবস্থানকালে সেরূপ তীব্র দুঃখ ও ক্লেশ ভুগিলাম। সুখের পর দুঃখ অতিশয় কষ্টকর; বিশেষ যে সময়ে লোকে দুঃখের বিন্দুমাত্রও আশা করে না সে সময়ে সুখে হতাশ হওয়া একেবারে মারাত্মক। ফিরিয়া আসিবার পর আমি কারও সঙ্গে বেশী মিশামিশি করিতাম না, অন্তরের যাতনা ভুলিবার বাসনায় নূতন নূতন বই পড়িতে থাকিলাম। বই আমার চির সহচর, এ জীবনে অনেক অবস্থা দেখিয়াছি, কিন্তু কি সুখে, কি দুঃখে, আমি কখন বইছাড়া হইয়া থাকিতে পারি নাই। পৃথিবীতে যদি বইয়ের সৃষ্টি না হত তাহা হলে নিশ্চয়ই অনেক কাল আগে আমার জীবন লোপ পাইত। আমি ঐ সময়ে পুস্তকেই ডুবিয়া রহিলাম।

মাতার জন্য পিতাকে অতিশয় দুঃখিত বোধ হল, তিনি সকলের নিকট অত্যন্ত খেদ প্রকাশিতে লাগিলেন। তাঁর সংসারে চিরকাল ঔদাস্য ছিল, মার মৃত্যুর পর সে ঔদাস্য আরো প্রবল হইয়া দাঁড়াল; গার্হস্থ্য জীবনে তিনি একেবারে আস্থাশূন্য হলেন। যত দিন যাইতে লাগিল তত তাঁর সংসারের প্রতি তাচ্ছল্য বাড়িয়া উঠিল। তিনি একান্ত নিস্পৃহভাবে কাল যাপিতে লাগিলেন। কিন্তু মানুষ সংসারের ভিতর থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকিতে পারে না। তিনি সকলের নিকট জীবন অসহ্য হইয়াছে বলিয়া অতিশয় বিলাপ করিতে আরম্ভিলেন আর নিজের মনকষ্টের লাঘবের জন্য গান বাজনায় প্রবৃত্ত হলেন। পিতার

অনেক বন্ধু জুটিল, তিনি কর্ম্ম করিয়া বাড়ী আসিলে পর তাহাদের সঙ্গে বসিয়া নানাপ্রকার গল্প ও কথাবার্ত্তা করিতেন আর গানবাজনায় মত্ত থাকিতেন। আমার দিদিরা আসিয়া সংসার চালাতে লাগিলেন নচেৎ ঐ সময়ে আমাদের বাড়ীতে যেরূপ বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছিল, তাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সব ছারখার হইয়া যাইত। বাড়ীর সঙ্গে পিতার প্রায় কোন সম্পর্ক রহিল না; তিনি অর্থ উপার্জ্জিতেন, টাকার দ্বারা পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন; উহাতেই তাঁর কর্ত্তব্য পালন হইয়াছিল ভাবিতেন। ওদিকে পুত্রকন্যাদের মধ্যে কার কি দশা উপস্থিত; বা সংসার রসাতলে গেল কি না সে বিষয়ে একবারও দৃক্‌পাত করিতেন না।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার পর জগদম্বাকে দেখিয়া কত আহ্লাদ করিব, তার সঙ্গে কত নূতন বিষয়ের কথা কহিব ইত্যাদি ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু দৈবের দুর্ঘটনায় সে সব কিছুই সিদ্ধ হল না। মাস কয়েক পরে তার একটী সন্তান জন্মিল। প্রথম পুত্র দেখিয়া লোকের অন্তরে যার পর নাই আনন্দ হয় আর আমিও নিজের বংশধরকে পাইয়া অতিশয় সুখী হব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু মন যখন বিমর্ষ থাকে তখন হাজার আহ্লাদের কারণ সত্বেও কিছুই ভাল লাগে না। জগদম্বাকে অনেক দিনের পর দেখিয়া যেরূপ বিশেষ আহ্লাদিত হই নাই, নূতন পুত্র পাইয়াও সেরূপ মনে কোন বিশেষ হর্ষের সঞ্চার হয় নাই। বন্ধু অন্নুর নিকটে গিয়া মনের কথা বলিতাম আর তার কাছে নিজের শোক প্রকাশিয়া হৃদয়কে শান্ত করিতে চেষ্টা পেতাম। অন্নুর স্বভাব অত্যন্ত করুণাত্মক ও সমভাবিক; তার অমায়িক কথাবার্ত্তায় আমি সকল কষ্ট ভুলিয়া যেতাম; তার সমভাব প্রকাশে আমার অন্তরের যাতনা অনেক লঘু হইয়া আসিত। খুড়াখুড়ী যাতে আমাদের কাহারও ক্লেশ না হয়

তার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন ও আমার প্রতি তাঁদের বড় ভালবাসা ছিল, কিন্তু তাঁরাও অতিশয় বিষণ্ণভাবে থাকিতেন।

এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। আমার বয়স তখন প্রায় তেইশ বৎসর পূর্ণ হল। এর মধ্যেই বিদ্যাশিক্ষা ছাড়িতে আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না, বরং আরো দুই এক বৎসর সমনোযোগে কোন নূতন বিষয় শিখি তাই আমার আন্তরিক অভিলাষ ছিল। কিন্তু পিতার সে বিষয়ে কোন আস্থা দেখিলাম না, তিনি ঐ সম্বন্ধে হাঁ বা না করিলেন না। তাঁর ব্যবহার দেখিয়া বোধ হল যে, আমি আবার টাকা খরচ করিয়া বিদ্যালয়ে পড়ি এ তাঁর অভিমত নয়। আমার বেশ বয়স হইয়াছে, আমি একটা চাকরীর যোগাড় দেখি, এইরূপ ইচ্ছা তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে প্রকাশিলেন; কিন্তু তিনি নিজে যে আমার জন্য ঐ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করেন তাতে তাঁর প্রবৃত্তি দেখিলাম না। আমি গতিক ভাল না বুঝিয়া অতি মনের কষ্টে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বিদায় দিয়া কোন চাকরীর অনুসন্ধানে নিরত থাকিলাম। বর্দ্ধমানে একবার চাকরী করিয়াছিলাম, তার যে দশা ঘটিয়াছিল তা আমার মনে বিলক্ষণ জাগরুক ছিল আর সাধারণত চাকরীর উপর চিরকাল আমার বিষম বিদ্বেষ। কিন্তু কি করি, অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অগত্যা কলিকাতায় এক কাজের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ালাম। অনেক কষ্টের পর এক স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হলাম।

আমার বিদ্যাজ্ঞানে অনেকটা অধিকার জন্মিয়াছিল, আর আমার শিক্ষকতার আবশ্যকীয় গুণ ছিল বলিয়া আমি বেশ বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ভাবিলাম অত দিন ধরিয়া ভাল স্কুল ও কলেজে লেখাপড়া শিখিয়াছি, তিনটা পাশ করিয়াছি, মনে কত জ্ঞান হইয়াছে আর আমার বয়স তেইশ বৎসর, নিশ্চয়ই স্কুলের ছেলেদের অনায়াসে পড়াতে পারিব।

এই ভাবিয়া আহ্লাদিত মনে নূতন চাকরী আরম্ভিলাম আর অতি আগ্রহের সঙ্গে নিজের কাজে রত থাকিলাম। স্কুলের অন্য শিক্ষকেরা আমাকে আদর ও মান্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিলেন; আর আমার বি. এ, উপাধির গৌরব আগেই আমার নাম গাইয়া দিয়াছিল; সুতরাং সকলেই আমি চমৎকার শিক্ষকতা করিব এই বিশ্বাসে আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেন। শুনিলাম স্কুলের ছাত্ররাও নূতন শিক্ষক হুঁতোরাম বি, এর কাছে পড়িবে বলিয়া মহা আহ্লাদিত হইয়াছিল। আমিও অতিশয় সুখী হলাম ও নানা আশা ও আকাঙ্ক্ষায় উচ্ছ্বসিত হইয়া এক মনে স্কুলের ছাত্রদের পড়াতে লাগিলাম।

বাড়ীতে জগদম্বাকে লেখাপড়ায় মন দিতে অনুরোধিলাম। নানা প্রকার বিঘ্ন ও দৈবঘটনায় তার শিক্ষার অত্যন্ত অবহেলা হইতেছিল, আর আমিও তাকে অনেক দিন পড়াতে পারি নাই। আমি একদিন তাকে বলিলাম—দেখ জগদম্বা, সংসার বল, সন্তানসুখ বল, সে সকলই অনিত্য, তোমার নিজের মনই যথার্থ সুখের পরম আকর, অতএব সেই মনকে বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও জ্ঞান-উপার্জ্জনের দ্বারা সবল করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাও। ভবিষ্যতে দেখিবে এই মায়াময় সংসারে পুস্তকই প্রকৃত বন্ধু।—জগদম্বাও বিদ্যাশিক্ষায় নিরাস্থ ছিল না, সে উহাতে বরাবরই আন্তরিক অনুরাগ দেখাত, আর নূতন বিষয় শিখিতে ও জানিতে সে চিরকালই অতিশয় উৎসুক। সময় মত জগদম্বা পড়িতে আরম্ভিল, আমিও তাকে কিছু কিছু ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দিতে লাগিলাম, আর আমি নিজেও স্কুলে পড়ানর পর বাড়ীতে অবকাশ পাইলেই কোন না কোন বই পড়িতাম। পড়াবার চাকরী জুটাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইয়াছিল। অন্য কাজ করিলে হয় ত বইগুলিকে একেবারে বিদায় দিতে হত, কিন্তু শিক্ষকতায় লেখাপড়ার সঙ্গে আমার সমস্ত সংস্রব বজায়

রহিল আর পরকে বিদ্যা দিয়া নিজের বিদ্যা বাড়িবে এই আশায় আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভবিলাম।

আমি যতই নূতন বিষয় পড়িলাম আমার পাঠতৃষ্ণা ততই আরও প্রখর হইয়া উঠিল। যত বই পড়িতে লাগিলাম, ততই নিজেকে মুর্খ বলিয়া জ্ঞান হল, আর নিজেকে ধিক্কার করিয়া কেবল বই পড়াতেই মগ্ন থাকিলাম। ঐ সময়ে আমার একটী বড় ভ্রম জন্মিয়াছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে, কোন বই পড়িয়া যথার্থ উপকার লভিতে হলে, তাতে যে সকল জিনিসের উল্লেখ আছে পাঠকের সে সমস্তেরই জ্ঞান থাকা উচিত; একবারও ভাবি নাই যে অনেক সময়ে গ্রন্থকার নিজে সে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানে অধিকারী নন, যেমন দরকার হইয়াছে, তিনি অন্য বই থেকে অনেক জিনিস সম্বন্ধে সংবাদ আহরিয়াছেন। এই ভ্রমবশতঃ কোন বই পড়িতে পড়িতে ক্ষণে ক্ষণে থামিতাম আর ক্রমাগত এক বই হতে অন্য বইতে ধাবিতাম। এরূপে যে কত সময় নষ্ট করিলাম তার ঠিকানা নাই। আর পরিণামে কোন উপকার দর্শিল না, একটীও বিষয় ভাল বুঝিলাম না বা শিখিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে কিছু দিন পরে আমার ভুল বুঝিতে পারিলাম ও একটী প্রকাণ্ড গোলকধাঁধার ভিতর ঘুরিতেছি জানিলাম, আর তাতে একেবারে পথ না হারাতে হারাতেই নিজের উদ্ধার সাধিলাম।

ঐ সময়ে বিজ্ঞান শিখিতে আমার বড় ইচ্ছা গেল। বিজ্ঞান শিক্ষায় একবার প্রবেশিলে প্রথমেই একটী বিষয় স্পষ্ট লক্ষিত হয়। উহা বিবিধ বিজ্ঞানের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধের বলে ঐগুলির মধ্যে অতিশয় যোগ ও মিল আছে, আর উহারই গুণে একটী বিজ্ঞান ছাড়িলে অন্যটী বুঝা যায় না। কিন্তু মানুষিক বুদ্ধি সকল বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় না, একটার উপরেই অনেক সময়ে সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে না; অথচ সকলগুলি জানার দরকার। এরূপ বিভ্রাটে পড়িয়া আমি

এক কল্পনা করিলাম। ভাবিলাম আমি এক একটী বিজ্ঞান আলাদা আলাদা পড়িব আর যে পর্য্যন্ত না তাদের সংযোগ বুঝিতে পারি সে অবধি সকলগুলি পরে পরে শিখিব। সেগুলির সম্মিলন হৃদয়ঙ্গম হলে আবার ফিরিয়া আসিয়া কেবল একটী বিজ্ঞান তন্ন তন্ন করিয়া অভ্যাসিব। এই সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের উপায়ে আমি অনেকটা বিজ্ঞান শিখিলাম, আর এই অনুক্রমের ও নিজের অনুধ্যানের সাহায্যে বিজ্ঞান শিক্ষায় অনেকটা সফল হলাম। কিন্তু বিজ্ঞানের সীমা নাই, কতক দূর শিখিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। শিক্ষকীয় ও সাংসারিক কার্য্যে অধিক সময় লাগিত এজন্য নিজের পাঠে ইচ্ছামত মন দিতে পারিতাম না।

বিজ্ঞানে ক্লান্তি বোধ করিবার পর দর্শন শিখিতে অগ্রসর হলাম। কিন্তু দার্শনিকদের মধ্যে পরস্পর অতিশয় অনৈক্য দেখিলাম। বিজ্ঞানে যেমন গ্রন্থকারদের মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ে মিল, দার্শনিকদের মধ্যে প্রায় সকল বিষয়েই অমিল। কপিল, গৌতম, লক, লাইব্‌নিট্জ, ডেকার্ট, হামিল্টন, মিল প্রভৃতির মধ্যে মহা বিরোধ। আমি পাগলের ন্যায় তাঁদের মত মিলাবার চেষ্টা পেলাম; কিন্তু মিথ্যা মাথা ঘুরাইয়া মরিলাম, অনেক সময় নষ্ট হল, অথচ দর্শনে ব্যুৎপত্তি জন্মিল না। অবশেষে এ মিথ্যা বিড়ম্বনা ত্যজিয়া এক নূতন উপায় অবলম্বিলাম; প্রত্যেক দার্শনিকের বই পড়িবার সময় ভক্ত শিষ্যের ন্যায় কেবল তাঁরই যুক্তি ক্রমান্বয়ে হৃদ্গত করিলাম, এইরূপে কিছু কালের পর সত্য মিথ্যা অনেক বিষয়ের জ্ঞান লভিলাম। পরে নিজের যুক্তি ও অনুধ্যানের বলে সেগুলি থেকে আমার অভিমত সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিলাম। এ ধারায় অনেক অসুবিধা আছে বটে কিন্তু এতে আমার মনের বেশ শিক্ষা হইয়াছিল আর ভবিষ্যতে এই মানসিক শিক্ষা হতে অনেক উপকার পাইয়াছিলাম।

দর্শনের পর ভাষা শিখিতে আমার অতিশয় কৌতুহল জন্মিল।

চিরকাল আমার বিদেশ ভ্রমণে উৎকট ইচ্ছা ছিল, আর বিদেশীদের সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানিতে আমি চিরকাল বড় উৎসুক। কিন্তু আমার ওরূপ অভিলাষ করা বামনের চাঁদে হাত দেওয়ার সমান। ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের এত ঘনিষ্ঠতা, এত ইংরেজী বই পড়ি, এত ইংরেজী সংবাদ শুনি; সেই ইংরেজদের দেশে গিয়া তাদের বাড়ীঘর, আচারব্যবহার ইত্যাদি দেখিতে আমার যে কি পর্য্যন্ত ইচ্ছা যাইত তা বলিতে পারি না। তার পর আবার ঐ সময়ে দুই এক জন দেশীয় লোক বিলাতে গিয়া অনেক খ্যাতি প্রতিপত্তি ও বিদ্যাজ্ঞান লভিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আমার সে বাসনা আরও তীক্ষ্ণ হইয়া দাঁড়াল। কিন্তু কোথায় বা বিলাত আর কোথায় বা আমি। কয়েক বৎসর আগে বন্ধু অমুকে স্পর্দ্ধিয়া বলিয়াছিলাম যে কখন না কখন ইংলণ্ডে যাবই যাব, কিন্তু সে যৌবন-সুলভ স্পর্দ্ধা স্পর্দ্ধাই রহিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। অন্য উপায় না দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, বিদেশীদের ভাষা শিখিয়া তাদের লিখিত নানারকমের বই পড়িলে ও সেগুলির মর্ম্ম গ্রহিতে পারিলে তাদের বিদ্যাজ্ঞান, আচারব্যবহার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে অনেক সংবাদ পাব।

ঐ মানসে আমি বিদেশী ভাষা শিখিতে আরম্ভিলাম। ইংরেজীতে আমার অনেকটা অধিকার জন্মিয়াছিল, এখন ফরাসী ও ফার্সী ভাষা ধরিলাম। অনেকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে ইউরোপে যেমন ফরাসী ভাষার আদর, আসিয়ায় সেরূপ ফার্সীর মর্য্যাদা। দুইই অতি প্রাঞ্জল ও মধুর, আর দুইয়েরই সাহিত্য অতি চমৎকার। নিজে নিজে ইংরেজীতে লেখা এক ফরাসী ব্যাকরণ অভ্যাসিতে লাগিলাম আর এক 'মুন্সী'র কাছে মধ্যে মধ্যে ফার্সী শিখিতাম। ফার্সীর ব্যাকরণ বড় সরল, সুতরাং শীঘ্রই মুন্সীজিকে বলিয়া একখানা সহজ বই ধরিলাম। কিন্তু বালকদের

উপযোগী বই পড়িতে আমার ভাল লাগিত না, আমার একখানা ভাল কাব্য পড়িবার ইচ্ছা হল। ওদিকে ফরাসী ভাষা নিজের চেষ্টায় যতদূর পারিলাম শিখিলাম। কিন্তু ওর ব্যাকরণ সরল নয়, আর পরের সাহায্য বিনা ঐ ভাষা শিখিতে বিলক্ষণ কষ্ট হইয়াছিল। ভবিষ্যতে সে কষ্টের সুখ পাইয়াছিলাম আর ফরাসীদের রচনা পাঠে আমি যে কত আনন্দ অনুভবিয়া থাকি তা একমুখে প্রকাশিতে পারি না। ফার্সীতে বিখ্যাত কবি সাদীর গ্রন্থ পড়িতে সুরু করিলাম। তাঁর রচনালালিত্যে ও ভাব-মাধুরীতে আমি একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। সাদীর একটী শ্লোক প্রায় প্রতিদিন আমার মনে পড়ে, সেটী এখানে না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্লোকটী হিন্দুস্থানী ধরণে পড়িতে হয়।

"মকুন্ তকিয়া বর্ মুল্কি দুনিয়া ঊ পুষ্ত্,
কি বিসিয়ার্ কস্ চূনতর্ পরওয়র্দ্ ঊ কুষ্ত্।
চূন্ আহঙ্গি রফ্তন্ কুনদ্ জানি পাক্,
চি বর তখ্ত্ মুর্দন্—চি বর রূয়ে খাক্?"

অর্থাৎ—

দিও না ঠেসান, শুইও না সংসার শয্যায়,
হয়েছে অনেকের অতি সুখ ও মৃত্যু তায়।
কি ভেদ—পবিত্র প্রাণ ত্যজিতে চলে যখন,
মর রাজাসনে বা পাষাণ উপরে তখন?

এই রকমে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। স্কুলে বালকদের পড়ানতে যা ভাবিয়াছিলাম তার বিপরীত ঘটিল। আমার বিদ্যাজ্ঞানে ও মধুর স্বভাবে পড়াবার জন্য বেশ উপযুক্ত ছিলাম, কিন্তু আমার উগ্রতা সে সব মাটী করিয়া দিল। যখন দেখিতাম যে সকলই আমার মনের মত চলিল আর আমার যত্ন ও কষ্ট সফল হল, তখন আমি কোন পরিশ্রমের ত্রুটি

করিতাম না, আমি একেবারে সদাশিব ছিলাম; কিন্তু যখন দেখিতাম সবই আমার অভিমতের উল্টা দিকে যাইতেছে, ছেলেগুলা আমার কথা শুনিতেছে না, আমি বড়্ বড়্ করিয়া বকিতাম, আর তাদের মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা যাইত,—এরূপ উপায়ে তাদের বিদ্যাশিক্ষাও হত না, তাদের জ্ঞানলাভও হত না।

তেইশ বৎসর বয়সে ও অত বিদ্যাজ্ঞান থাকাতে ঠিক করিয়াছিলাম যে সহজেই স্কুলের ছেলেদের পড়াতে পারিব; বোধ হয় একটু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাহায্যে সফল হতে পারিতাম; কিন্তু সে সময়ে ঐ দুইটীর একটীও আমাতে ছিল না। আমার দ্বারা কোন উপকার দর্শিল না, ছাত্রেরা যা ইচ্ছা তাই করিতে লাগিল। আমাতে অধ্যবসায় বা পরিশ্রমের অভাব ছিল না, কিন্তু সমচিত্ততা বিশেষ প্রজ্ঞা কাকে বলে জানিতাম না। অর্থ বা উপদেশ দ্বারা অনেক বিষয়ের অধিকারী হওয়া যায়, অভিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞতা লাভের একমাত্র উপায় অভিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞতা। স্কুলের ছাত্রদের শিখাবার জন্য আমি তিন উপায় অবলম্বিতাম, সে তিনটী বালকদের পক্ষে অনর্থক ও অপকারক—সাধনা, যুক্তি ও ক্রোধ। কখন যাদু বাছা বলিয়া তাদের পড়ায় মন দিতে সাধিতাম, ভাবিতাম আমার মত তাদের হৃদয়ও শীঘ্রচেতন। কখন বা যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া বলিতাম, মনে করিতাম তারা আমার সব যুক্তি অনায়াসে বুঝিতে পারিত। আবার কখন তারা কথা শুনিত না বলিয়া রাগে অন্ধ হইয়া যেতাম ও তাদের প্রতি প্রচণ্ডতা প্রকাশিতে ধাবিতাম, কিন্তু উহাতে তাদের যথার্থ উপকার না সাধিয়া নিজেরই শিশুত্বের পরিচয় দিতাম।

ক্রমে আমার নিজের সব দোষ দেখিতে পেলাম, ছাত্রদেরও মনের গতি বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু দোষ দেখিয়া তার প্রতিকার না সাধিতে পারিলে কি উপকার? সকল বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব জানিয়াও আমি কোনটীর

নিরাকরণ করিতে সক্ষম হলাম না, শিক্ষকতায় সফলতা লভিলাম না, ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যা করিলাম তাই বিফল হল। মনে বড় বেদনা পেলাম। ভাবিলাম এত আশ্বাসের সঙ্গে এই চাকরী আরম্ভিয়াছিলাম, সামান্য কাজ বলিয়া শিক্ষকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এত কষ্ট, এত যত্ন, এত পরিশ্রম সকলই যদি বিফল হল তবে এ কাজে আর নিযুক্ত থাকার কি দরকার? এই সকল চিন্তায় আমার মন আন্দোলিতে লাগিল, কি করিব তা নির্ণীতে পারিলাম না। আবার কত ক্লেশের পর এই চাকরী জুটিয়াছিল, শীঘ্র যে অন্য কোন কাজ পাইতে পারি তারও আশা নাই, আর নিজের স্বাধীনভাবে কোন কর্ম্ম করারও ক্ষমতা নাই। কিন্তু একটা কাজে হাত দিয়া তাতে সফল হলাম না এ যাতনা আমার প্রাণে সহিল না। আমি একদিন স্কুলের কর্ত্তার নিকটে গিয়া নিজের কর্ম্মত্যাগের প্রস্তাব করিলাম। তিনি আমাকে অনেক বুঝালেন ও অনভিজ্ঞ, উষ্ণপ্রকৃতি যুবক বলিয়া দুই একটা মিষ্ট ভৎর্সনাও করিলেন, কিন্তু আমি তাঁর কথা উপেক্ষা করিয়া শিক্ষকতার কাজ ছাড়িয়া দিলাম।

এইরূপে আমার জীবনের দ্বিতীয় চাকরী শেষ হল। আমি একরকম নিষ্কর্ম্মাভাবে বাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। আমার চাকরী গেল কি থাকিল সে বিষয়ে পিতার কোন অনুসন্ধান ছিল না, অন্য সকলে শুনিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশিতে লাগিলেন। তাঁদের সে দুঃখ আমার নিজের কষ্টের কাছে অতি তুচ্ছ বোধ হল; আমি আন্তরিক যাতনায় অস্থির হইয়া থাকিলাম। আমার মতে কাজ করিবার সময়ে বিনা কর্ম্মে বসিয়া থাকার অপেক্ষা অধিক কষ্ট আর নাই; আর সুধু কষ্ট নয়, এতে লোকের যেমন মন্দ ঘটিবার সম্ভাবনা এমন আর কিছুতে ঘটিতে পারে কি না সন্দেহ। নিষ্কর্ম্মত্ব লোকের মনকে সংকীর্ণ করিয়া দেয়, অন্তরকে কর্কশ করিয়া তুলে, আর জীবনকে বিস্বাদ করিয়া ফেলে। কাজের বয়সে কাজ না থাকিলে

মানুষ অতি তুচ্ছ বস্তুতে বিরক্তি প্রকাশে আর কোন কারণের অসত্ত্বেও নিজের হৃদয়ে কষ্ট অনুভবে। দিন রাত্র এক বিষয়ের আন্দোলনে তার মনবৃত্তি মলিন হইয়া যায়, তার হৃদ্‌বৃত্তি জড়ভাব ধরে।

আমার যৌবনকালের এই দীর্ঘ বৃত্তান্ত পড়িয়া অনেকে বিরক্ত হইয়া থাকিবেন, কেহ কেহ ছেলেমানুষী বলিয়া আমার প্রথম জীবনের ঘটনাগুলিকে উড়াইয়া দিবেন। সে জন্য আমি কিছু দুঃখিত। বাল্যকাল হতে মানুষের মত বুঝিলে ও অনুভবিলেও আমি অনেক দিন ছেলেমানুষ ছিলাম, আর আমি এখন এই প্রৌঢ় অবস্থাতেও অনেক অনেক বিষয়ে ছেলেমানুষ আছি। আমি সাধারণের সমক্ষে একজন বড় লোক বা বিজ্ঞলোকের জীবনবৃত্তান্ত লিখিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি নাই; আমি যেমন, ঠিক তেমনটী বর্ণিব বলিয়া অঙ্গীকৃত ছিলাম। আমি সেই অঙ্গীকার পালিতেছি, আর আমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্যকরূপে বুঝিতে হলে প্রথম জীবনের বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কোন লোকের যৌবন পর্য্যন্ত জীবনচরিত উত্তমরূপে পর্য্যালোচিলে তার সমস্ত জীবনের মর্ম্ম বেশ বুঝা যায়। কার্য্যকারণের নিয়ত সম্বন্ধ; জীবনের প্রথমে কারণ নিহিত হয়, জীবনের শেষে কার্য্য পরিস্ফুট হয়। আর যৌবন অবধি মানুষের প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের অনুক্রম অতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, কারণ সে সময়ে ঐগুলি অতি বিমল থাকে; ভবিষ্যৎ জীবনে ঐগুলি নানাকারণে অবিশুদ্ধ হইয়া যায়, আর উহাদের পরম্পরা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। এই জন্যই আমি আমার জীবনের কার্য্য সকলের পর্য্যায় দেখাবার মানসে প্রথম কারণগুলি যথাসাধ্য সম্পূর্ণরূপে বর্ণিতে চেষ্টা করিয়াছি। পাঠকের চোকের সামনে আমার আত্মাকে স্বচ্ছভাবে স্থাপিতে যত্নবান হইয়াছি, আর এই জন্যই যাতে তিনি আমার জীবনের সকল বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব ও মূলতত্ত্ব বুঝিতে

পারেন এই আশয়ে সকল রকমে সকল দিক হতে সকল কার্য্য ও কারণ যথাবিধি নির্দ্দেশিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি। আমি যদি পাঠককে একেবারে বলিতাম যে—আমার চরিত্র এই এই রকমের, আমি এই এই কাজ করিয়াছি, অন্যে যে আমাকে পাগল বলে সে মিথ্যা প্রবাদ মাত্র—তা হলে আমার তাঁকে প্রবঞ্চনা করা হত, আর নিশ্চয়ই তিনি আমার সম্বন্ধে ভ্রমবিচার করিতেন। কিন্তু আমি সরলভাবে সমস্ত কার্য্যকারণ, ও কখন্ কি করিয়াছি, কি চিন্তিয়াছি, কি অনুভবিয়াছি তা সকলই তাঁর সুমুখে ধরিয়াছি। ঐ সকল উপাদান সংগ্রহ করা তাঁরই কাজ, উহা হতে একটা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা তাঁরই কর্ম্ম, তাতেও যদি তাঁর আমার সম্বন্ধে ভ্রমবিচার হয়, তবে সে তাঁরই দোষ হবে। কোন্ ঘটনাটী দরকারী, ও কোন্‌টী অদরকারী সে বিচার আমার কর্ত্তব্য নয়; আমি না বাছিয়া বিশৃঙ্খভাবে ভালমন্দ সবই বলিয়াছি। এতদূর পর্য্যন্ত সাহসে ভর করিয়া আসিয়াছি, আশা করি আমার সে সাহস বরাবর অপ্রতিহত থাকিবে। অনেকে এখনকার বর্ণনা পড়িয়া অসন্তুষ্ট হতে পারেন, সে দোষ আমি স্বীকার করিতেছি, কিন্তু উহার নিরাকরণের উপায় নাই। মানুষের প্রথম জীবন সর্ব্বদাই বিচিত্র ও সুখময়, মানুষের শেষ জীবন প্রায়ই নীরস ও দুঃখময়!

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নূতন জীবন

এইবার আমি নূতন জীবন আরম্ভিলাম। এতদিন কেবল নিজেকেই বুঝিতাম, বাহ্যিক দ্রব্যে ব্যস্ত থাকিতাম, এখন আমি মানুষের অবস্থায় পড়িয়া পৃথিবী ও সংসারকে অভ্যাসিতে প্রবৃত্ত হলাম। মানুষ ও তার সম্বন্ধে বিচার মানুষের মুখ্য অধ্যয়নের সামগ্রী। যত দিন মানুষ কেবল নিজের শারীরিক অস্তিত্ব বুঝে, ততদিন কেবল নিজের অস্তিত্বের জ্ঞানলাভ ও অভ্যাস তার কর্ত্তব্য; উহা শিশুকালের প্রধান নিয়োগ। যতদিন মানুষ নিজের শারীরিক অস্তিত্ব ব্যতীত বাহ্য বস্তুর সত্তা বুঝে ততদিন বাহ্য বস্তুর ও তার সম্বন্ধের জ্ঞানলাভ ও অভ্যাস তার কর্ত্তব্য; উহা যৌবনকালের প্রধান নিয়োগ। যখন মানুষ নিজের নৈতিক ও মানসিক অস্তিত্ব বুঝে, তখন অন্য সমপ্রাণীদের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ অবধারণ করিয়া নিজের ও অন্য মানুষদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও অভ্যাস তার কর্ত্তব্য; উহা সমস্ত জীবনের প্রধান নিয়োগ। যে ব্যক্তি কেবল নিজেকে দেখিয়াছে, আর যার জ্ঞান কেবল বাহ্য বস্তুতে সীমাবদ্ধ এ পৃথিবীতে তার প্রকৃত জ্ঞান কখনই হয় নাই। তার সমস্ত জ্ঞানই বৃথা ও নিস্ফল; সে এ সংসারের মর্ম্ম কিছুই জানে না; প্রতি মুহূর্ত্তে তার প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা; সে ক্রমাগত এক ভ্রম হতে অন্য ভ্রমে পড়ে। কারণ কেবল বাহ্য বস্তুর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বিচার মানুষের একমাত্র অধ্যয়নীয় বিষয় নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নির্ণয় ও বাহ্য বস্তুর সঙ্গে তার

সম্বন্ধের আলোচনা—এই দুইই মানুষের পরম অধ্যয়নীয় বিষয়। জগৎসংসারের আলোচনা সহজ কর্ম্ম নয়; আর কিরূপে ও কি অবস্থায় উহার সম্যক জ্ঞান পাওয়া যায় তাহার নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। বিজ্ঞ ব্যক্তি জগতের অনেক দূরে, আর সাংসারিক লোক উহার অতি নিকটে বাস করে। একজন এত অধিক দেখে যে, সে সম্বন্ধে তার চিন্তিবার ক্ষমতা থাকে না; অপরটী এত অল্প দেখে যে, সে সমস্ত জগতের বিচার করিতে পারে না। বিজ্ঞেরা এক সময়ে কেবল একটী বিষয় পর্য্যালোচিয়া অন্য বস্তুদের সঙ্গে তার সংযোগ ও সম্বন্ধ দেখিতে পায় না, এজন্য তারা সকল বিষয়ের যথার্থ কার্য্যকারণ নিরূপিতে পারে না। সাংসারিক লোকেরা পৃথিবীর ভিতরে থাকিয়া সকলই দেখে অথচ কিছুই পর্য্যালোচিবার সময় পায় না। পৃথিবীতে সকল জিনিস এরূপ অস্থির যে, সেগুলি পার্থিব ব্যক্তির জ্ঞানগোচর হলেও তার পক্ষে সেগুলির সম্যক্ নিরীক্ষণ সম্ভবে না। সেগুলি এত দ্রুতবেগে অন্তর্হিত ও বিলীন হয় যে দর্শকের মনে উহাদের অতি অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে।

লোকে যে একবার দেখিবে আর একবার চিন্তিবে তাও সাধ্য নয়; কারণ সংসারের দৃশ্য ক্রমাগত অবহিত ভাবে দেখিতে হয়, কিন্তু আবার ঐরূপ করিলে অনুধ্যানের ব্যাঘাত ঘটে। যে ব্যক্তি পর্য্যায়ক্রমে জগতে ও নির্জ্জনে সময় অতিবাহিতে ইচ্ছা করে তার কোন স্থানেই কোন উপকার হয় না, কেননা সে বিজনে চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে, আর সংসারে অপরিচিতের ন্যায় বাস করে। অতএব এস্থলে একমাত্র উপায় এই যে সমস্ত জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা উচিত; একটী দেখিবার নিমিত্ত, অপরটী চিন্তিবার নিমিত্ত। কিন্তু এরূপ প্রায় অসাধ্য, কারণ বিবেকশক্তিকে, একটা জড়বস্তুর ন্যায় ইচ্ছামত একবার রাখা ও একবার

তোলা যায় না; আর যে ব্যক্তি অনেক বৎসর বিনা চিন্তায় কাটাইয়াছে, সে জীবনে কথনই অনুধ্যানপর হতে পারে না।

আবার কেবল সামান্য দর্শকের মত জগতের আলোচনার ইচ্ছা মূঢ়তার বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি বাহিরে থাকিয়া সমস্ত আন্তরিক বিষয় জানিতে চাহে সে কিছুই জানে না, কারণ সকল কাজেই, নিজে না মিশিলে, কথনই তার মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না; আর যে ব্যক্তি কোন কাজের কাজী নয় সে কোথাও আদৃত হয় না ও লোকে তার সঙ্গে মিশিতে চাহে না। সামান্য বাল্যখেলা হতে জটিল সংসারকর্ম্ম পর্য্যন্ত কোন বিষয়ের সম্যক জ্ঞান লভিতে হলে নিজে উহার চর্চ্চা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ঐ সকল কারণেই বলিতেছি যে এ পৃথিবীতে যত প্রকার অধ্যয়ন আছে, সকলের অপেক্ষা জগৎসংসারের অধ্যয়ন কঠিন ও দুঃসাধ্য। আবার যথন উহা বিজ্ঞ ও সাংসারিক দুজনেরই পক্ষে অত কঠিন, তথন আমি না বিজ্ঞ না সাংসারিক, আর আমার মন ও হৃদয় অতিশয় বিচিত্র —অন্ততঃ লোকে আমাকে বিচিত্র বলিয়া জানে—অতএব আমার পক্ষে যে উহা কত সুকঠিন তা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। এইজন্য বলিতেছি যে, ঐ সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রম ঘটিতে পারে আর দুই এক স্থলে আমি অন্যায় সিদ্ধান্তও করিতে পারি। কিন্তু সে সকলই অকপট ভাবে পাঠকের সুমুখে ন্যস্ত করিব।

সংসারের প্রতি পিতার অনাস্থা ক্রমে বাড়িতে লাগিল, আমাদের সঙ্গে তাঁর প্রায় সকল সম্পর্কই চুকিয়া গিয়াছিল। আমি অনেক দিন নিষ্কর্ম্মা-ভাবে থাকিয়া যার পর নাই কষ্ট ভুগিতেছিলাম। একদিন পিতার এক বন্ধুর দ্বারা তাঁকে জানালাম যে, বাণিজ্য করা আমার আন্তরিক ইচ্ছা, তিনি যদি আমাকে অতি অল্প সাহায্য করেন তা হলে ভবিষ্যতে আমার

অনেক উপকার হতে পারে। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তাঁর আন্তরিক অভিলাষ বুঝিলাম যে, আমি একেবারে একটা বড়লোক হই, লোকে বলিবে অমুকের ছেলে অমন বড় কাজ করিতেছে —ইত্যাদি; তিনি তাই চান, আর তার পরে আমার সাহায্য করিতে পারেন। এ সংবাদে আমি অনন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বন্ধু অনুর কাছে সমস্ত জানালাম। অনুও তখন আমার মত যুবক, সে সবে সংসারে পা দিয়াছে, আর তার পিতাও একজন গৃহস্থ লোক, সুতরাং আমার জন্য সে বিশেষ কিছু করিতে পারিবে না জানিতাম। কিন্তু হৃদয়ে যখন দুঃখের মাত্রা পূর্ণ হয় তখন আপনাআপনি সে দুঃখ উথলিয়া পড়ে, আর অমন অমায়িক বন্ধুর কাছে মনের কষ্ট প্রকাশিলে সে কষ্টের অনেক হ্রাস হয়। লোকে কিছু করিতে পারে বা না পারে তোমার কষ্টের সময় কেহ যদি অতি সামান্য সমভাব মাত্র জানায়, তাতেই তোমার হৃদয়ের যন্ত্রণা হাল্কা বোধ হয়।

অনু আমার দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইয়া একটা উপায়ের উদ্ভাবনে নিযুক্ত রহিল, কিন্তু কোন উপায় না দেখিয়া আমার মত সেও অতি বিষণ্ণ হল। অবশেষে সে তার ও তার পিতার বন্ধুদের নিকট, নাম না করিয়া আমার সম্বন্ধে সমস্ত জানাল। তাঁহাদের মধ্যে একজন অনেক কষ্টের পর এক ইংরেজ বণিকের বাড়ীতে আমার জন্য কাজ জুটালেন। আমি তাঁর নিকট ও বন্ধু অনুর কাছে যে কি পর্য্যন্ত বাধিত রহিলাম তা কখন প্রকাশিতে পারিব না। লোকে সকল জিনিসকে তাচ্ছল্য করিতে পারে কিন্তু কেহ অন্যের সহৃদয়তাকে ভুলে না। কোন লোকের স্নেহ লভিবার জন্য নিজে তার প্রতি স্নেহ করিবার অপেক্ষা আর ভাল উপায় নাই। বন্ধু অনুর উপকার চিরকাল আমার মনে জাগরূক আছে, তার সহৃদয়তা চিরকাল আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে।

আমি ঐ নূতন চাকরী পাইয়া আবার অনেকটা স্থির হলাম; নিয়ম মত রোজ নিজের কাজ করিতে থাকিলাম, এইরূপে প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল; আমার বয়স তখন পঁচিশ বৎসর। মনে মনে সংসারের ও আমার ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিলাম। দুইবার চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছি, এইবার যেমন করিয়া হউক, কাজে লাগিয়া থাকিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। বাণিজ্য শিখা আমার বরাবর আকাঙ্ক্ষার বস্তু, এবার এমন সুবিধা পাইয়া উহা কখন হাতছাড়া করিব না; আর পরের দাসত্ব বল, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই পরের দাসত্ব করিতেছে, তবে আমি একজন সামান্য লোক হইয়া উহার প্রতি আমার এত বিদ্বেষ কেন? পরের দাসত্ব বড় হীন বলিয়া আমার যে সংস্কার আছে, তার দরুণ আমি বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়াছি, এখন সে সংস্কারকে মন হতে বিদায় করাই শ্রেয়। এইরূপ নানা কথায় মনকে সুস্থির করিয়া ঐ ইংরেজ ব্যবসায়ীর বাড়ীতে অতি অবহিতভাবে নিজের কর্ম্ম করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমাদের সংসারে একটা বড় পরিবর্ত্তন ঘটিল। পিতার খুড়া পশ্চিমে থাকিয়া বড় কারবার করিতেন, আর উহা হতে অনেক টাকা উপার্জ্জিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁর বয়স অধিক ও শরীর জীর্ণ হওয়াতে তিনি কারবার উঠাইয়া দিয়াছিলেন আর কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি অনেক বিষয়সম্পত্তি করিয়া কাশীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁর একদিন হঠাৎ মৃত্যু হয়, নিজের সন্তান না থাকাতে তিনি সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি পিতার নামে রাখিয়া যান। পিতা একেবারে হঠাৎ বড় মানুষ হইয়া উঠিলেন।

সহসা পিতাতে এক অপরূপ পরিবর্ত্তন দেখিলাম। তিনি আগে একেবারে নিস্পৃহ ছিলেন, এখন তাঁর অনেক নূতন অভিলাষ জন্মিল। আমাদের বাড়ী অতি সামান্য রকমের ছিল, পিতা সে বাড়ী বাড়াতে ও

ও ভাল করিয়া নির্ম্মাইতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি নিজে রোজ রাজমজুরদের তদারক করিতেন ও কাজ থেকে আসিতে না আসিতেই কতদূর বাড়ী প্রস্তুত হল তা জানিবার জন্য ব্যস্ত হতেন। বাড়ীর বাহির তয়েরি হয়ে আসিলে বাড়ীর ভিতরের বন্দোবস্তে তাঁর চোক পড়িল। নূতন বৈঠক-খানা ও বড় বড় ঘর নির্ম্মিত হল, আর কত নূতন আসবাব আসিল। চাকর চাকরাণীদের সংখ্যা বাড়িল আর পিতার যে কত নূতন বন্ধু জুটিল তার সীমা নাই। তিনি তাদের সঙ্গে গল্প ও আমোদে অনেক সময় কাটা-তেন, তারা তাঁকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিত। কি করিলে ভাল দেখাবে, কি করিলে লোকে ভাল বলিবে, কি করিলে তাঁর নাম সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হবে—এইরূপ বিষয়ে পিতা তাদের মুখে অনেক কথা শুনিতেন ও সেই কথার মত চলিতেন। আর তিনি একজন এখন শ্রেষ্ঠ বড়মানুষ, বড় লোকের উচিত কার্য্য করা তাঁর নিতান্ত কর্ত্তব্য, তা না হলে বড় লোকে-রাও তাঁকে গ্রাহ্য করিবে না—এইরূপ ভাবিয়া তিনি নিজেও যথাসাধ্য বড়মানুষী ধরণে চলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে কালী ও সরস্বতীর পূজা হত, মার মৃত্যুর পর তাও পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; এখন মহা আড়ম্বরের সঙ্গে দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী পূজা আরম্ভ হল। আর দোল দুর্গোৎসবের ঘটায় তাঁর নাম সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতাবশতঃ ঐ সকল বিষয়ে আড়ম্বর আরো বৃদ্ধি পাইল। পিতাকে দেখিয়া বোধ হল, যেন তিনি এক পরম সুখভোগে রত আছেন, আর তাঁর বহিরাকারে অতিশয় সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশিল। তাঁর যথার্থ আন্তরিক সুখ জন্মিল কি না সে বিষয়ে আমি কিরূপে নিশ্চিত বলিব? এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যত দিন যাইতে লাগিল, তাঁর ভোগলিপ্সা তত বাড়িয়া উঠিল, তাঁর অন্তরে অনেক নূতন আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, তিনি এক বিলাস হতে অপর

বিলাসে ধাবিলেন। সময়ে সময়ে তাঁকে অতিশয় চিন্তিত দেখিতাম, ভাবিতাম তিনি যে সুখের আশায় ঐরূপ আড়ম্বর করিতেছিলেন নিশ্চয়ই সে সুখ পান নাই, তা না হলে কেন তাঁর মন ক্রমাগত নূতন ভাবনায় ও নূতন আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিতে ছিল? পূর্ব্বে তাঁকে যেরূপ নিস্পৃহ দেখিতাম, এখন সেইরূপ উদ্বিগ্ন দেখিলাম। নিস্পৃহতা ও উদ্বিগ্নতায় অনেক প্রভেদ; কিন্তু নিস্পৃহ ব্যক্তি আর উদ্বিগ্ন ব্যক্তি—এই দুই জনের মধ্যে কোন্‌টী বেশী সুখী, কোন্‌টীই বা বেশী দুঃখী?

বিলাস অতি ভয়ঙ্কর সামগ্রী; যে ধনী উহা ভোগ করে আর যে দুর্ভাগা উহার জন্য লালায়িত হয়, বিলাস সে দুই জনেরই বিকার জন্মাইয়া দেয়। যেমন বর্ষাকালে কোন কোন সময়ে অতিবৃষ্টির পর সমস্ত প্রকৃতি অতিরিক্ত মধুরভাব ধরে, সমস্ত গাছপালা এক অপূর্ব্ব শোভায় ঝকিতে থাকে, আর মানুষের মন তাতে একেবারে তাক লাগিয়া যায়। কিন্তু সেই সমস্ত গাছপালা ও শস্যের মুলে পোকা জন্মিয়া সেগুলিকে অপুষ্টিকর ও বিষাক্ত করে, পশুপাখীদের ও মানুষের খাদ্যের অনটন ঘটায়, আর সকল স্থানে মৃত্যু ও মড়ক সঞ্চারে—সেইরূপ বিলাস, বাহ্যিক সুখসম্ভোগ ও চাকচিক্য সত্বেও সর্ব্বদা সকলের সর্ব্বনাশ করে; কি মানুষ, কি জন্তু, কি রাজা কি প্রজা, কি চাষা কি নগরবাসী, কি সামান্য পরিবার কি বিস্তৃত সাম্রাজ্য, বিলাস সকলেরই মুল জর্জ্জরিত করিয়া দেয়। যেখানে ধনসম্পত্তি, সেইখানেই বিলাসের প্রসর। এক কালে যে জাতি সকলের নিকট আদৃত ছিল, বিলাসে তার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এইরূপে যেমন কোন ব্যক্তি বা কোন রাজ্য একদিকে ধনী হতে থাকে, অপরদিকে সেরূপ দুর্ব্বল ও ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে; আর অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের পর খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও ধনসম্পত্তি লভিয়া, বিলাস প্রবেশিবামাত্র তাদের সে সমস্ত ধ্বসিয়া যায় ও পরে তারা অন্যের

পদদলিত ও ধিক্কৃত হইয়া থাকে। মিথ্যাভিমান, বাহ্যাড়ম্বর ও অলসতা বিলাসের সাক্ষাৎ পরিণাম।

অনেকে বলিতে পারেন যে, ধনীদের বিলাস না থাকিলে গরীবদের আহার জুটিত না; কিন্তু যদি কোন বিলাস না থাকিত তা হলে কোন গরীবও থাকিত না। বিলাস একশ গরীব লোকের ভরণ পোষণ করে, কিন্তু এক লাক দরিদ্রের প্রাণবিনাশ ঘটায়। ধনীদের ও তাদের সহকারীদের হাতে যে টাকা ঘুরে, তাহা শ্রমজীবীদের জীবন ধারণের নিমিত্ত কোন উপকারে আসে না। একজন চাষার গায়ে কাপড় নাই, কিন্তু একজন বড়মানুষের পাগড়ীতে জরী ঝকিতেছে। একজন বড়-মানুষের ভাণ্ডারে যে জিনিস নষ্ট হয়, তাতে পাঁচ শ গরীবের প্রাণ বাঁচে; একজন ধনী সোণার থালে পোলয়া, ফেলিয়া ছড়িয়া খায়, একজন গরীব ভূঁয়ে বসে কলাপাতের উপর সামান্য ডাল পর্য্যন্তও চাকিতে পায় না।

অন্যের ভাল অবস্থা ও সুখ স্বচ্ছন্দ দেখিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হই বটে, কিন্তু বৃথা বাহ্যিক আড়ম্বর—যাহা স্বাভাবিক নয়, যাতে কোন আন্তরিক সুখ নাই, যা কেবল লোকের চোক টানিবার জন্য—সে আড়ম্বর কিসের পরিচয় দেয়? ভাল রুচির? না, বড়মানুষদের বড়মানুষীর চেয়ে সামান্য লোকের সামান্য জিনিসে আমি অনেক ভাল রুচির পরিচয় পাই। আরামের? না, বিলাসীরা যে আরাম পায় তা সকলেই জানেন। মহত্বের? আমি বিলাসে কোন মহত্ব দেখিতে পাই না, বরং মহত্বের সম্পূর্ণ বিপরীতই লক্ষিয়া থাকি। যখন কেহ বড় বাড়ী নির্ম্মাণে ইচ্ছা করেন আমি মনে মনে ভাবি, সে বাড়ী আরো বড় কবে হবে? কবে তিনি বাড়ী ছাড়িয়া অট্টালিকা প্রস্তুত করাবেন? কবে আমাদের বিলাসী সে অট্টালিকা ত্যজিয়া রাজভবনের অভিলাষী হইবেন? তিনি কুড়িজন পরিচারকের বদলে কবে দুই শ জন ভৃত্য নিয়োজিতে অভিলাষিবেন?

জরীর পাগরী থেকে তিনি কবে সমস্ত বাড়ী সোনা দিয়া বাঁধাবেন? তিনি কোন্ দিন তাঁর বাড়ীর চূড়া আকাশ স্পর্শিবার ইচ্ছা করিবেন—কিন্তু সে আশা বৃথা, উহাতে কেবল তাঁর অক্ষমতারই পরিচয় পাওয়া যায়। হে নীচাশয়, মিথ্যাভিমানী মানুষ! তুমি যতই কেন ক্ষমতা দেখাও না, আমি তোমার অক্ষমতা দেখিতে পাইতেছি; তুমি যতই কেন আড়ম্বর কর না, আমি তোমার দুর্দ্দশা জানিতে পারিতেছি। তোমার নিজের উপর প্রভুত্ব নাই, তুমি একটা সামান্য খড়ের কুচির মত সমাজভয়ের ও লোকমতের বাতাসে একবার উঠ, একবার নাম। তোমার কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই, তুমি ভণ্ডামিতে পর্য্যন্ত লোকমতের অনুবর্ত্তী হইয়া চল।

লোকমত কি অপূর্ব্ব জিনিস! লোকমতই সংসারের রাজা; রাজারা পর্য্যন্ত উহার ক্রীতদাস। রাজা বলেন, প্রজারা তাঁদের অধীন, বেশ, কিন্তু রাজারা কি? মন্ত্রীদের অধীন; মন্ত্রীরা কি? তাঁদের কর্ম্মচারী কেরানীদের অধীন; তারাও আবার সামান্য লোকদের মতানুগামী। যখন পরের মতে কাজ করিতে হয়, পরের মতে চলিতে হয়, পরকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, পরের ইচ্ছামত ইচ্ছা করিতে হয়—তখন সে ছার ধনসম্পত্তির কি আবশ্যক? মান বল, গৌরব বল, সুখ বল, ক্ষমতা বল—সে সব প্রমাদ মাত্র; লোক মতে চলিয়া পরের উপর প্রভুত্ব, দাসত্বের অপর নাম। কারণ লোকের কুসংস্কারের উপর যদি নিজের সুখ নির্ভরে, লোকের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত যদি সকল কাজই করিতে হয়, তবে পরের উপর প্রভুত্ব ছাড়া নিজের উপর পর্য্যন্তও কোন প্রভুত্ব থাকে না। আর যখন অন্যের চোক দিয়া সকল জিনিস দেখিতে হয়, তখন অন্যের মন দিয়াও চিন্তা ও ইচ্ছা করিতে হয়। লোকমতাচারীরা বলিয়া থাকে যে তারা নিজ অভিলাষ অনুসারে চলে, কিন্তু কাজের সময় পরের অভিলাষমত কাজ করে।

বড়মানুষদের দানদাতব্যতা বল, আমার বয়সে আমি অনেক ধনী লোক দেখিয়াছি, অনেক ধনী লোকের দানের কথা পড়িয়াছি, ও শুনিয়াছি, কিন্তু তাদের মধ্যে কয়জন বদান্য? ঐ একজন বড়মানুষ পাঁচ শ ভিখারী বিদায় করিয়াছেন, তাঁর নাম সহরময় রৈ রৈ করিতেছে; ঐ একজন লোক বড় লাটসাহেবের ছেলের বিবাহের সময় পাঁচ হাজার টাকা উপহার পাঠাইয়াছেন, তিনি সরকার হতে খেতাব পেলেন। ঐ একজন ধনী এক নূতন রাস্তা তয়েরি করাইয়াছেন, রাস্তার মোড়ে তাঁর নামে এক প্লেট বসিল।—এই যে সব বড় মানুষদের বড়মানুষী দেখিতেছি, এদের আন্তরিক ভাবটা কি?—কেবল স্বার্থ ও মিথ্যাভিমান। আমি এখানে কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা বলিতেছি না, আমি সাধারণতঃ সকল দেশের বড়মানুষদের উল্লেখিতেছি। দাতা হলেই বদান্য হয় না, বড় কথা বলিলেই বড়লোক হয় না, ভাল পরিচ্ছদ পরিলেই ভাল মানুষ হয় না। লোকের অন্তর বাজিয়া দেখ, জানিবে, দুহাজার বড় মানুষের মধ্যে দুজন যথার্থ বদান্য আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু দুহাজার গরীবের মধ্যে, কেহ দানধ্যান না করিলেও, পনর শর হৃদয় যথার্থ বদান্য।

ওহে বড় মানুষ! এটা নিশ্চয় জানিও যে ঝর্ ঝর্ করে টাকা দিলেই দয়ালুতা হয় না। কেবল সিন্ধুক খুলিয়াই নিরস্ত থাকিও না; যদি পরের কাছে তোমার হৃদয় না খুল, দেখিবে পরের হৃদয়ও তোমার কাছে বন্ধ থাকিবে। লোকে মুখে যতই কেন বলুক না, কেবল টাকার ও মিষ্ট কথায় লোকের হৃদয় বাঁধিতে পারিবে না। তোমার সময়, তোমার যত্ন, তোমার স্নেহ, তোমার নিজেকেও পরের হিতে দেওয়া উচিত; কারণ যতই কেন অর্থ বিতর না, লোকে বেশ বুঝিবে যে, তোমার টাকা ও তুমি একবস্তু নও। সব দানের চেয়ে পরের ভাল

করার ইচ্ছা ও পরেতে যথার্থ আস্থা দেখান বেশী ফলদায়ী ও প্রকৃত উপকারক। কত দুর্ভাগা ও রোগী লোকের পক্ষে ভিক্ষা অপেক্ষা সান্ত্বনা অধিক আবশ্যক! কত উৎপীড়িত ব্যক্তি টাকার পরিবর্ত্তে রক্ষার প্রার্থনা করে! কত নিরাশ্রিত লোক অর্থ চাহে না, কেবল আশ্রয়ের অভিলাষী! দুর্ব্বলদের সহায় হও, পীড়িতদের সান্ত্বনা দাও, মূর্খদের উপদেশক হও, কুপথগামীদের ভাল পথ দেখাও, লোকদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ মিটাইয়া দাও, সন্তানদের বিদ্যাজ্ঞান বিতর, গুরুজনদের কর্ত্তব্যপালন শিখাও, নিরাশ্রিতের আশ্রয় হও, দুর্ভাগাদের দুঃখ মোচন কর, আর ন্যায়পরায়ণ, সমভাবী, পরোপকারী হও। কেবল দান করিও না, বদান্য হও; অর্থের অপেক্ষা করুণা অধিক উপকার সাধে; পরকে ভালবাস, সে তোমায় ভালবাসিবে; তাদের সেবা কর, তারা তোমার সেবা করিবে; তুমি তাদের ভাই হও, তারা তোমার ছেলে হবে।

কয়েক মাস কাটিয়া গেল, আমাদের বাড়ী এক নূতন ভাব ধরিল। বাড়ীতে এখন চাকরচাকরাণী দরওয়ান সরকারের ছড়াছড়ি, আর ক্রমাগত লোকজনের সমাগম। পূজার সময় অতিশয় ধূমধাম হত, আর তাছাড়া বাড়ীতে প্রায় রোজ সন্ধ্যার সময় বৈঠকখানায় গান বাজনা চলিত। পিতার নূতন নূতন পারিষদ জুটিতে লাগিল, তাদের সঙ্গে তিনি মহা হাসি কৌতুক করিতে রত থাকিতেন। তারা নূতন নূতন আমোদের কল্পনা করিল, পিতা তাদের পরামর্শে নানাপ্রকার অভিনব বিলাসের অনুবর্ত্তী হলেন। বাড়ীতে প্রায়ই ভোজ দেওয়া হত, আর পাশা, তাস ইত্যাদি সবই ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হল। পিতার বন্ধুদের হাসিরগড়ের শব্দ বাড়ী ছাড়িয়া সমস্ত পাড়াতে ধ্বনিতে লাগিল। পাড়ার লোকেরা, অমুকের বাড়ীতে আজ ভোজ, কাল গান, পরশু কেত্তন, ইত্যাদি পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল। পিতার অনুচরেরা তাঁর

কীর্ত্তির ভেরী বাজাতে থাকিল, আর তাঁর দৌলতে পাড়াটা একেবারে গম্‌গম্‌ করিয়া উঠিল। মার মৃত্যুর আগে আমাদের বাড়ীর কি নীরব ও শান্ত মূর্ত্তি ছিল, আর এখন কি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল! আমাদের সে বাড়ীকেও চেনা ভার, সে পিতাকেও চেনা ভার!

আমারও অনেক নূতন বন্ধু জুটিল। একে আমরা বড়মানুষ বলিয়া নাম রটিয়া গিয়াছে, তাতে আবার আমার এক বড় সাহেবের বাড়ী চাকরী হইয়াছে, পাড়ার কত লোক আমার সঙ্গে আলাপ করিতে ব্যস্ত হল। এদের সঙ্গে আগে কথন পরিচয় ছিল না; অনেকবার দেখা হয়েছিল, কিন্তু কথন আমার সঙ্গে আলাপে তাদের বিশেষ আগ্রহ দেখিতাম না। সহসা এদের বন্ধুতা ও অমায়িকতা লক্ষিয়া আমি আশ্চর্য্য হলাম। আমি কাজ করিয়া বাড়ী আসিবার পরেই দেখিতাম আমার অন্ততঃ দুই একজন নূতন বন্ধু উপস্থিত, আর তাদের কেমন মিষ্ট-মুখ, সদালাপ ও সহৃদয়তা। কেহ বা—হুঁতোরাম বাবু, আজ আপনার এত মলিন মুখ কেন—বলিয়া মমতা দেখাত; কেহ বা—হুঁতোরাম বাবু, আপনার মত বড় চাকরী অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে—বলিয়া স্তুতিবাদ করিত; কেহ বা—হুঁতোরাম বাবু, আপনার জন্য এই দণ্ডে মরিতে প্রস্তুত, এখন কি করিতে পারি বলুন—বলিয়া পরম সৌহার্দ্দ্য প্রকাশিত। আর কেহ কেহ এরূপ অকপটভাবে আমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা করিত, যে আমি সেই সময়ে তাদের প্রকৃত বন্ধু নির্দ্ধারিয়াছিলাম, আর অমায়িক ভাব দেখিয়া তাদের প্রতি যথার্থ বিশ্বাসও করিয়াছিলাম।

কিন্তু বন্ধু অনুতে কোন বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না। অনু পূর্ব্বেও আমার সঙ্গে যেরূপভাবে ব্যবহার করিত, আমাদের বড়মানুষীর কালেও সেইরূপ ব্যবহার করিল। তাতে কোন বিশেষ আড়ম্বর লক্ষিলাম না, বরং তাকে আগের চেয়ে কিছু কিছু লাজুক ও কথাবিমুখ দেখিলাম। আমার নূতন

বন্ধুদের অপরিমিত সুহৃদ্‌ভাব ও অনুর এইরূপ বিনম্রতা ও অনগ্রসরতা দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হলাম। একদিন অনুর ঘরে বসিয়া তাকে বলিলাম—ভাই অনু, সকলেই আমার প্রতি এমন খোলা ও অকপট-ভাবে ব্যবহার করে, তুমি আমার পুরাণ বন্ধু, তোমাতে এখন বিপরীত ভাব দেখিতেছি কেন ?—অনু কতকক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিল—ভাই হুঁতো, আমাতে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, তবে ভাই তোমরা আজকাল বড়মানুষ হয়েছ, আর আমরা সেই গৃহস্থ আছি, বড় মানুষেরা না কি গরীবদের প্রায় নীচু দেখে, আর ভাই, তোমার এখন অনেক নূতন বন্ধু জুটিয়াছে, তাই আমার ভয় হয়, পাছে তুমি আমাকে দূরছাই কর, আর তুমি ত জান নিজের মান নিজের কাছে।—অনুর এই উত্তর শুনিয়া আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হলাম, আমার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। আমি তাকে বলিলাম—ভাই অনু, তোমার কথা শুনিয়া আমি অন্তরে বড় পীড়া পেলাম। তুমি ত আমাকে জান—কি ধূলায় গড়াগড়ি দিই, কি সোণার খাটে শুই; কি অনাহারে মরি, কি বড় লাট সাহেবের গদিতে বসি, এ হুঁতোরামের হৃদয় চিরকাল সেই এক থাকিবে; এ হৃদয় কখন বিচলিত হবে না। এ নিশ্চয় জানিও যে, একবার যখন হৃদয় দিয়া হৃদয় বাঁধিয়াছ, সে বাঁধুনি কখন আল্গা হবার নয়—না, সে বাঁধুনি কখনই, কখনই খুলিবে না—এই কথাবার্ত্তার পরে অনুর সে লজ্জাভয় চলিয়া গেল, আমরা পূর্ব্বে পরস্পর যেমন ব্যবহার করিতাম, এখনও সেইরূপ করিলাম, চিরকাল সেইরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি।

ওদিকে পিতার আড়ম্বর ক্রমে আরো বাড়িয়া উঠিল, তাঁর পারিষদ ও ধামাধরারা তাঁকে আরো নাচাতে লাগিল। তিনি একবার গড়াতে আরম্ভিয়াছিলেন, এখন আর থামিতে পারিলেন না। জুড়ীঘোড়া, গাড়ী,

ফিটন, বন্ধুবান্ধব, গানবাজনা, চাকরপরিজন, নামযশ কিছুতেই তাঁর ভোগলালসা পরিতৃপ্ত হল না। ক্রমাগত নূতন নূতন আমোদ প্রমোদে তাঁর মন ধাবিল। একজন পারিষদ তাঁকে বলিল—মহাশয়, অমুক ব্যক্তির বিষয় এত অল্প, তথাপি তার বাড়ীতে পূজার সময় কেমন ধূম্‌ধাম্ হয়, আপনার ধনদৌলতের সীমা নাই, আপনি এ সামান্য যাত্রা ও গুটিকতক লোক খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন, মহাশয় এতে যে আপনার অপমান হয়, আমাদেরও পর্য্যন্ত অপমান বোধ হয়। সখের যাত্রা দিন, বাই নাচ দিন, দেশশুদ্ধ লোক খাওয়ান্, কালিয়া পোলয়ার ভোজ দিন, বড় বড় সাহেবদের নিমন্ত্রণ করুন, তবে আপনার নামের মত কাজ হবে, আমরাও লোকের কাছে ঘাড় উঁচু করে কথা কহিতে পার্‌ব।—পিতা ভাবিলেন—হাঁ তাই ত, এরা যা বল্‌ছে তাত বেশ সত্য, আমার অপযশ হবে এত প্রাণে সবে না, আর রামশ্যাম আজকালের লোক হয়ে আমাকে ছাড়িয়ে উঠ্‌বে? এ কখনই হবে না। আচ্ছা লাগাও, বাইনাচ দাও, উইলসন হোটেলে এক শ সাহেবের ভোজের জন্য ফরমাস্ দিয়ে এস।—এই বলিয়া তাঁর লোকজনকে আজ্ঞা দিলেন। তার পর থেকে বাড়ীতে মহা ধূম্‌ধাম্ পড়িল আর কত কি নূতন কাণ্ড আরম্ভ হল।

এইরূপ দেখিতে দেখিতে আমার ছাব্বিশ বৎসর পূর্ণ হল। কিন্তু এত সুখ ও বিলাসের মধ্যে থাকিয়াও আমার মনে সুখ বাড়িল না, বরং অনেক কমিয়া আসিল। সাহেব বাড়ীতে আমার বেশ চাকরী হতেছিল, ক্রমে ক্রমে আমার বেতন বাড়িতে লাগিল, প্রায় সকল দিকেরই সংবাদ ভাল; তবুও আমার মনে নানা গোলমাল উপস্থিত হল। আমি কখন কখন বিচিত্র ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকিতাম, নূতন নূতন আশঙ্কা আমার হৃদয়কে আলোড়িতে লাগিল। আমি সে সকল চিন্তা কারও নিকটে

কিছু না প্রকাশিয়া আমার সকল ব্যারামের মহা ওষুধ বইতে আশ্রয় নিলাম। যখন অবকাশ পেতাম তখনই আমার প্রিয় গ্রন্থকারদের আলোচনায় সকল চিন্তা ভুলিয়া যেতাম। কথন বা ভবভূতির করুণরসে অশ্রু ঝরিতাম, কথন বা বাইরণের বীররসে উদ্দীপ্ত হতাম; কথন বা হাফিজের প্রেমরসে গলিয়া যেতাম, কথন বা রুসোর উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হতাম।

একদিন ভাবিলাম, আমার চিরকাল স্বাধীনভাবে একটা কাজ করিবার ইচ্ছা, আর এতদিন বণিকের বাড়ীতে চাকরী করিয়া বাণিজ্যের গূঢ়তত্ত্ব অনেকটা শিখিয়াছি, পিতারও এই সময়ে অর্থের স্বচ্ছলতা, তবে আমার মনস্কামনা পূরিবার এমন সুবিধা আর কথন হবে না। এই ভাবিয়া একদিন পিতার নিকট ঐ বিষয়ে প্রস্তাব করিলাম ও অনেক বুঝাইয়া আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলই বলিলাম। পিতা লোকটা আসল মন্দ ছিলেন না, বাস্তবিক তাঁর মত বুদ্ধিমান লোক অল্পই দেখিয়াছি; কিন্তু তাঁর স্বভাবে অনেক বৈচিত্র্য ছিল, তাঁর কোন আন্তরিক বল ছিল না বলিলেই হয়, আর বোধ হয় সাত জনে মিলিয়া তাঁর মন বিগড়াইয়া দিয়াছিল। তিনি কান দিয়া আমার প্রস্তাব শুনিলেন ও আমার কল্পনায় অতি সন্তোষ ও আগ্রহ দেখালেন। আমি এত দিনের পর পিতাকে আমার মতানুবর্ত্তী করিলাম আর তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হলেন দেখিয়া আমি মহা উল্লাসিত হলাম। কিন্তু তার পরদিনই পিতা তাঁর পারিষদদের লয়ে বাগানে আমোদ করিতে গেলেন। বাগান হতে আসিয়া আর তিনি ওকথার কোন উল্লেখ করিলেন না, তাঁর প্রতিজ্ঞাপালন দূরে থাকুক, আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে যেন সবই ভুলিয়া গেলেন বোধ হল। আমিও কথন সে প্রস্তাবের আবার উল্লেখ করিলাম না। আমার সব উল্লাস জন্মের মত রসাতলে গেল।

এইরূপে কয়েক মাস চলিয়া গেল। আমার একটী কন্যা জন্মিল, আমি সে সময়ে ঐ ঘটনাতে বিশেষ আহ্লাদিত হয়েছিলাম কি না তা ভাল স্মরণ নাই। জগদম্বার আনন্দের সীমা রহিল না, তার বরাবর ইচ্ছা একটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়। আমি তার আহ্লাদ দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হলাম ও মনে মনে আশা করিলাম, আমার মত তারও আহ্লাদ পদে পদে ভাঙ্গিয়া না যায়। কন্যাটী বড় হতে লাগিল, বাড়ীতে তখন আর কচি ছেলে ছিল না সে জন্য সকলেই তার আদর করিত। পিতার মহা হর্ষ, তাঁর নাত্‌নীর প্রতি যত্ন ও ভালবাসা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কন্যার ভাতের সময় উপস্থিত হল। পিতা মহা ঘটা করিয়া ভাত দিবেন বলিয়া, ঠিক করিলেন। আমি বাহ্য আড়ম্বর কখনই ভালবাসিতাম না, আর ছেলের ভাতে কোন ঘটা হয় নাই, মেয়ের ভাতে ধূমধাম করিয়া মিথ্যা টাকাগুলা নষ্ট করার কি আবশ্যক? পিতা আমার এই কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হলেন। আর তাঁর নাত্‌নীর ভাতে কোন ঘটা হবে না এই বলিয়া পাগলের মত বকিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, এই সামান্য বিষয় নিয়া গুরুজনের অন্তরে পীড়া দেওয়ায় কোন দরকার নাই, আর পিতার মনে যখন একবার সক হয়েছে তখন তাঁকে সকছাড়া করা দুষ্কর। পিতাকে জানালাম, তাঁর যা ইচ্ছা হয় ঘটা করুন, আমরা তাতে বাধা দিব না। তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া বাড়ীতে মহা ধূম্‌ধাম্ লাগিয়া দিলেন; বাইনাচ, খেম্‌টানাচ, সখের যাত্রা সাহেব খাওয়ান প্রভৃতি সব চলিল। প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া আমোদ হল, হাজার হাজার টাকা গড়াল। পিতা সুখী হলেন। তাঁর সুখে আমরাও সুখী হলাম।

ষোড়শ অধ্যায়।

সংসার-খেলা।

ঐ সময়ে আমার সেই স্নেহময় খুড়া মহাশয়ের পরলোক হয়। তাঁর মৃত্যুতে আমি সংসারের আর একজন বন্ধু হারালাম ভাবিয়া বড়ই কাতর হলাম। প্রাণটা মাঝে মাঝে বড়ই শূন্য বোধ হ'তে লাগিল। বিধবা হইবার পর খুড়ীমা কাশীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, খুড়ার যা কিছু সামান্য বিষয় ছিল, তাহাতেই তাঁর ভরণপোষণ চলিত।

পিতার সকল বিষয়ে ওরূপ বাড়াবাড়ি দেখিয়া ক্রমশঃই আমার মন খারাপ হইতে লাগিল। যে সব বিষয় আমি অন্যায় বলিয়া জানিতাম, আমার চোকের সম্মুখে সে সব প্রত্যহ ঘটিত অথচ আমি এত দুর্ব্বল, স্বাধীন হইয়াও এত পরাধীন, যে কিছুরই প্রতিকার করিতে অক্ষম। এইরূপ ক্রমাগত চিন্তা করিতে করিতে আমার মাথা গরম হ'য়ে উঠিল। কেবল ঘরে বসিয়া ভাবিতাম কি উপায়ে আমার উদ্ধার সাধিব। আমি একলা নহি, স্ত্রী ও দুটী জীব আমার গলায় বাঁধা রহিয়াছে, আমি যদি বাড়ী থেকে কোথাও চলিয়া যাই তাহলে তাদের উপায় কি হবে? আমি চাকরী করিয়া মাসে যে ৫০৲ টাকা পাইতাম তাহাতে সামান্য ভাবে চলিতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে স্বচ্ছন্দে কলিকাতার খরচ নির্ব্বাহ করা একরূপ অসম্ভব। আর হঠাৎ যদি আমি মরিয়া যাই, তবে তারা কোথায় থাকিবে। পিতাকে একবার চটালে তিনি যে ভবিষ্যতে আবার আমার সন্তানদের ভার লইবেন এরূপ বোধ হয় না। এইরূপ নানা চিন্তায়

আন্দোলিত হইয়া আমার মনের বিকার জন্মিল; রাত্রে ঘুম হত না, কাহারও সঙ্গে বেশি কথা কহিতে ভাল লাগিত না; নির্জ্জনে আপন ঘরে বসিয়াই ভাবিতাম। জগদম্বা সর্ব্বদা নিজ ছেলে মেয়েদের কাজে ব্যস্ত থাকিত আর দিদিরা ও খুড়ীমা চলিয়া গেলে সংসারের ভার সমস্তই তার উপর পড়িয়াছিল, সেজন্য আমার মানসিক ভাবনা ও যন্ত্রণার কথা তাকে বেশি কিছু বলিতাম না। কিন্তু আমি না বলিলেও আমার বহিরাকার দেখিয়া সে কতক আমার মানসিক বিকারের সন্দেহ করিয়াছিল, কাজ সারা হলেই সে আমার কাছে আসিয়া বসিত, আমাকে কত বুঝাইত, আর আমার যন্ত্রণার কারণ তাকে বলিতে কত অনুরোধ করিত। দিন দিন আমার শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়িতেছে দেখিয়া সে ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইল। ডাক্তারবাবু আমাকে দেখিয়া বলিলেন, আমি যদি কিছু-দিন—অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য—চিন্তা হতে মনকে বিশ্রাম না দিই, তাহলে আমার মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হবার সম্ভাবনা। পিতাকে এবিষয় জানানতে তিনি বলিলেন—আমিত ওর সংসারের ভার সব বহিতেছি, ও এত সুখে আছে, ওর আবার কিসের ভাবনা? কিন্তু পিতা জানিতেন না যে, ঐরূপ অনিচ্ছায় বিলাসিতার মধ্যে থাকাতেই ক্রমশঃ আমার স্বাধীন মনে ঘুণ ধরিতেছিল। প্রশস্ত মনোবৃত্তিগুলি সংকুচিত হয়ে যাইতেছিল। বাস্তবিক, স্ত্রীপুত্রের দায়িত্ব আমি তখনও সম্যক্‌রূপে বুঝি নাই। বুঝিবই বা কিরূপে? আমাদের দেশে পিতামাতারাই পুত্রদের বিবাহ দেন। যতদিন না পুত্রেরা উপার্জ্জন করিতে পারে, (অনেক সময় তার পরেও) ততদিন পুত্রের সংসার নিজেরা চালাইয়া থাকেন। সুতরাং পিতামাতা বর্ত্তমান থাকিতে সংসারের দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে প্রায় পড়ে না, সেই জন্যই আমি ইচ্ছা সত্ত্বেও ঐ দায়িত্বের ভার মাথায় বহিতে ইতস্ততঃ করিতে-ছিলাম। জানিতাম, তাঁর বাড়ী থাকিয়া আমার মৃত্যু ঘটিলে তিনিই

আমার স্ত্রীসন্তানদের দেখিবেন। কেননা জগদম্বা আমার স্ত্রী বটে, কিন্তু তাঁর পুত্রবধূ, আর যে দুটী জীবকে পৃথিবীতে আনিয়াছিলাম, সে দুটীকে মানুষ করিয়া জগতের কার্য্যোপযোগী করা যে আমারই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত, তাহাও তখন বুঝিতে পারি নাই। আমার অপেক্ষা পিতাই তাহাদের অধিক আদর করিতেন। আর তাঁর কাছে অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইয়া ছেলেটী অতি আবদারে হয়ে উঠেছিল। জগদম্বা তাহাকে শাসন করিতে পারিত না, একটু ধমকাইলে বা মারিলেই সে ছুটিয়া তার দাদাবাবুর কাছে গিয়া নালিশ করিত। সময়ে সময়ে দুরন্ত ছেলের জ্বালায় তাকে বিষণ্ণ দেখিতাম, কিন্তু সে আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলিয়া কখন বিরক্ত করিত না। আমিও দেখিতাম, সংসারের কোন বিষয়েই আমার হাত নাই, কাজেই বুঝিয়াও চুপ করিয়া থাকিতে হত।

আমার অসুখের পরিণাম শুনিয়া অবধি জগদম্বা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হল, সর্ব্বদাই তাকে চিন্তিতা দেখিতাম। ডাক্তার বাবু আমার পীড়ার ওষুধ, কিছুদিনের জন্য সমুদ্রের হাওয়া খাওয়া বা সমুদ্র-ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, কিন্তু পিতা উহাতে কিছুই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না দেখিয়া, সে যেন কোনরূপ উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত রহিল।

একদিন আমি ঘরে বসিয়া আছি, সে আমাকে বলিল—দেখ, আমি অনেক ভাবিয়া একটা সিদ্ধান্তে আসিয়াছি, বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিও না, শুন। ডাক্তার বাবু তোমাকে সমুদ্রের হাওয়া খাইতে বলিয়াছেন, আর তুমিও অনেক দিন থেকে বিলাতে যাইবার জন্য ব্যাকুল আছ—তা এখন গেলে ভাল হয় না? আমি হাসিয়া বলিলাম—বিলাত যাওয়া কি তোমার কাজলায় যাওয়ার মত, যে ৪০।৫০৲ টাকা হলেই যথেষ্ট হবে; উহার জন্য অন্ততঃ তিন হাজার টাকার দরকার। অত টাকা কোথায় পাব, জানত আমার সামান্য হাতখরচের টাকা

রাখিয়া মাহিনার সব টাকাই পিতাকে দি। সে শুনিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য হল না, বলিল, আচ্ছা, ঐ টাকার যোগাড় হলেই তুমি সমুদ্র-ভ্রমণে যাবে ও সারিয়া আসিবে? আমি বলিলাম,—আমি যেন গেলাম, কিন্তু তুমি আমাকে ছাড়িয়া এতদিন একলা কি থাকিতে পারিবে—আমি ত ছ মাসের কমে ফিরিব না। আর তুমি যে মহাজন হয়েছ, তাও ত আমি জানিতাম না। সে মৃদু হাসিয়া প্রেমপূর্ণ চোক দুটীতে আমার দিকে চাহিল, আমার আরও কাছে আসিয়া তার একটী হাত আমার কাঁধে দিয়া একটী হাত আমার হাতে রাখিল, অতি কোমল অথচ একটু যেন ভীতস্বরে বলিল—আমার—আমার যা কিছু আছে, তাহা কি তোমার নয়, তুমি কি এখনও আমায় এত পর ভাব যে আমার কিছু লইতে ধার করা মনে কর? তুমি কি আমায় কখন চিনিবে না? আমি বলিলাম—জগদম্বা! এ জগতে পুরুষ যে কখন নারীজাতিকে—আমিও যে কখন তোমাকে চিনিতে পারিব, এরূপ বোধ হয় না। তোমাদের ঐ কোমলতার মধ্যে যে কি কঠিনতা, ঐ অল্পশিক্ষার মধ্যে যে কত উচ্চজ্ঞান, ঐ পরাধীন জীবনের ভিতর যে কত মানসিক স্বাধীনবৃত্তি নিহিত আছে—তাহা মহা পণ্ডিতগণও বুঝিতে অপারগ, আমি ত কোন ছার!—আমি আর বেশি কথা কহিতে পারিলাম না, অনেক কালের পর আমার যেন সেই পূর্ব্বেকার দুর্দ্দম প্রেম উথলিয়া উঠিল, আমি তাকে বুকে টানিয়া একটী সুদীর্ঘ চুমা খাইলাম। হৃদয়ের যত অশান্তি, মাথার যত যন্ত্রণা, যেন এক মুহূর্ত্তে দূর হয়ে গেল। যৌবন কালের যে প্রেমের স্রোতে হৃদয় আলোড়িত হত, এখন সেই অনন্ত প্রবাহ অন্তরকে প্রশান্ত করিল। আমি যেন প্রাণে দ্বিগুণ বল লাভিলাম, নিজ কর্ত্তব্য আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম।

দিনকতক পরে জগদম্বা একদিন তার গহনার বাক্সটী আনিয়া উহার

চাবিটী আমার হাতে দিয়া বলিল—তুমি ত জান, আমি কখনই গহনা পরিতে ভালবাসি না, ওগুলা মিথ্যা বাক্সতেই পড়িয়া আছে উহা বেচিলে যে টাকা হবে, তাহাতে তোমার বিলাত যাওয়া বেশ পোষাবে!" আমি তার হাত ধরিয়া বলিলাম—জগদম্বা! তুমি ত যথার্থ স্ত্রীর উপযুক্ত কাজ করিলে, এখন আমাকে তোমার স্বামীর যোগ্য কাজ করিতে দাও। মনে কোরো না যে আমি তোমাকে পর ভাবি বলিয়া তোমার সম্পত্তি লইতে অনিচ্ছুক, আমার মতে—যে স্বামীর, নিজ স্ত্রীর সঙ্গে একমন, একপ্রাণ ও একাত্মা না হয়, তারা প্রণয়ী হলেও দম্পতী নামের অধিকারী নয়—যে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শারীরিক সম্বন্ধের সঙ্গে মানসিক ও আধ্যাত্মিক মিলন না হয়, তারা যথার্থ প্রেমিক হতে পারে না—যেদিন তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে, সেই দিনই তোমাকে আমি নিজের করিয়া লইয়াছি, প্রেমময়ী স্ত্রীকে আপন করিতে কদিন লাগে? কিন্তু বিলাত ভ্রমণে আমার উৎকট ইচ্ছা থাকিলেও, আর ডাক্তার বাবু পরামর্শ দিলেও, তোমার স্ত্রীধন লইয়া বেড়াতে যাবার অবস্থা আমার এখনও হয় নাই, উহা করিলে চিরদিনের জন্য আমি নিজেকে অপদার্থ ভাবিয়া ব্যথিত হব। দেখ, পিতা নানা পথে ও আমোদে যেরূপ অপব্যয় করিতেছেন, তাহাতে তিনি যে বেশি সম্পত্তি রাখিয়া যাবেন, এরূপ বোধ হয় না, আমাদের দুটী সন্তান হয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এখন উহা রাখ, পরে দরকার হতে পারে। জগদম্বা কিছু না বলিয়া যেন বিষণ্ণ হয়ে অন্য কাজে চলিয়া গেল। আমি এক দৃষ্টে তার দিকে চাহিয়া রহিলাম। "ভাবিলাম, বিশ্বপাতা এ সংসারে যত কিছু মনোরম, ও সৌন্দর্য্যের দ্রব্য সৃজিয়াছেন, তার মধ্যে আমার চোখে এই প্রেমময়ী নারীমূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও পবিত্র বলিয়া বোধ হয়। ধন্য সেই পুরুষ যে এই দেবী মূর্ত্তিকে আপনার বলিতে পারে।

আমি অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি যে, মানুষের মনে কোন বিষয়ে

একটা প্রবল ইচ্ছা হলে, তাহা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তবে তিনিই কোন না কোন উপায়ে সেটা পূর্ণ করিয়া দেন। আমার বিলাত যাবার সুযোগও ঐরূপে ঘটিল। ঐ সময়ে আমাদের পাড়ার একটী ছেলে বিলাত যায়, তাঁর পিতা বাল্যাবস্থায় আমার পিতার সমপাঠী ছিলেন, ক্রমে আমার পিতার অবস্থা উন্নত হওয়ার পর, তিনি সে বাল্যবন্ধুতা অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যাহোক, তাঁর পুত্রের বিলাত-গমন-সংবাদে আমার পিতা যেন চমকিয়া উঠিলেন। তিনি তখন পারিষদের দ্বারা তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত খোঁজ খবর করিয়া সব জানিলেন। শুনিলাম, তাঁর সাংসারিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল না হলেও পুত্রের মঙ্গল-আশায় তিনি তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠিয়েছেন। ঐ কালে ধনী লোক মাত্রেরই পুত্রকে বিলাতে পাঠিয়ে ব্যারিষ্টার বা সিবিলিয়ান করিয়া আনা, সমাজের মধ্যে একটা ফেসানের মত হয়েছিল; কিন্তু আমাদের প্রতিবাসী ধনী না হলেও পুত্রকে বিলাতে পাঠিয়েছেন, আর আমার পিতামহাশয় অর্থবান হয়ে এখনও সে ফেসানের অনুবর্ত্তী হন নাই, সুতরাং তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ও কাজটা তাঁর অবশ্যকর্ত্তব্য, আর তাঁর পারিষদেরাও তাতে আগ্রহ দেখাল।

একদিন সকালে আমি খবরের কাগজ পড়িতেছি, পিতা আমাকে ডাকিয়া পাঠালেন। এক বাড়ীতে থাকিলেও প্রায় তিন মাস তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপাদি হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা চাটুকারগণ পরিবৃত থাকিতেন বলিয়া আমি সাধারণতঃ তাঁর ঘরে যাইতাম না।

আমি একটু বিস্মিত ও ত্রস্ত ভাবে তাঁর বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে অতি স্নেহের স্বরে বসিতে বলিয়া আমার বিলাত যাবার প্রস্তাব পাড়িলেন। বলিলেন—আমি ক্রমেই প্রাচীন হইতেছি, তোমার বড় দাদার মত তুমিও একটা বড় কাজ কর ও সংসারে সর্ব্বত্র

গণ্যমান্য হও ইহা দেখিতে আমার খুব ইচ্ছা, এখানে ত তোমার সে রকম বড় কাজের আশা নাই; তুমি ত জান, আইন ছাড়া আর কোন ব্যবসাতে আমাদের দেশে বেশি পয়সা হয় না, কিন্তু তোমার ওকালতি করিতে ইচ্ছা নাই, আর গবর্ণমেণ্টের খোসামোদ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ লইতেও রাজি নও। তাই আমি ভাবিতেছি, তুমি বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে এলেই সব দিকে ভাল হবে। এখন আমার ত টাকার অভাব নাই, আমি অনুসন্ধান লইয়া জানিয়াছি, মাসে ২৫০ আড়াই শ টাকা হলেই তোমার যথেষ্ট খরচ পোষাবে।

আমি পিতার সহসা ঐরূপ প্রস্তাবে এত আশ্চর্য্য হয়েছিলাম যে, শীঘ্র উত্তর দিতে পারিলাম না। একদিকে ইংলণ্ড দর্শনের যেমন উৎকট বাসনা —অপরদিকে ব্যারিষ্টারী করিতে সেইরূপ একান্ত অনিচ্ছা—এই দুটী বিপরীত ভাবের একত্র সমাবেশে আমার মন ভয়ানক চঞ্চল হল, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় চুপ করিয়া রহিলাম; আমাকে মৌন দেখিয়া তিনি বলিলেন—তুমি যেতে রাজি নও কি? আমি বলিলাম—আমি অনেক দিন থেকেই বিলাতে গিয়া জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য ব্যগ্র হয়ে আছি, কিন্তু আইনের বদলে আর কোন প্রফেশন শিখিতে ইচ্ছা করি, তবে আপনি যদি উহাতে মত না দেন, তাহলে অগত্যা আমাকে উহাই করিতে হবে। পিতা বলিলেন—সিবিল সার্ব্বিস ছাড়া আর কোন কাজে বাঙ্গালীদের অধিক মান্য দেখিতে পাই না; কিন্তু ব্যারিষ্টারীতে প্রচুর টাকা উপার্জ্জিতে পারিলে দেশে সাধারণের কাছে খ্যাতি প্রতিপত্তি যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাঁর ঐরূপ কথাতে আমি মনে মনে ভাবিলাম, পিতা! তুমি ত আমার জ্ঞানপিপাসা ও উচ্চ আকাঙ্খার কথা কিছুই বুঝিবে না, যে টাকাকে তুমি জীবনের প্রধান সুখ মনে কর, আমি তাহাকে যত অশান্তির কারণ ভাবি, তবে বৃথা তোমার সঙ্গে তর্ক করিয়া আমার বিলাত যাবার সুবিধাটা

ছাড়াই কেন? আমি অগত্যা ঐ সর্ত্তেই ইংলণ্ড যাইতে স্বীকৃত হইলাম। পিতা মহানন্দে লোকজনদের উপর আমার ইংলণ্ড গমনের জন্য সরঞ্জম প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন।

আমি নোটিসের বদলে এক মাসের বেতন ছাড়িয়া দিয়া সাহেব বাড়ীর চাকরী হতে অব্যাহতি পাইলাম। দুই সপ্তাহের মধ্যে বিলাতে যাইতে প্রস্তুত হতে হবে, সময়টা বড়ই অল্প মনে হল। আমাদের জীবনে সবই ঐরূপ; কোন বিষয়ে তীব্র ইচ্ছা হলে যতক্ষণ না সেটা করিতে পারি, ততক্ষণ আমাদের হৃদয় বড়ই চঞ্চল হয়, সেটী পাইবার বা করিবার জন্য যেন অস্থির হয়ে বেড়াই, কিন্তু সেটী আয়ত্তাধীন হলে তখন ভাবিবার সময় পাই, তখন উহার ভাল মন্দ বিষয়ে বিবেচনা করিতে সক্ষম হই। আমারও ঐরূপ হইল। হঠাৎ বিলাত যাবার সব ঠিকঠাক হওয়াতে মনটা যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল; ভাবিলাম, আমি কি এটা ঠিক কাজ করিতেছি? জগদম্বা ও দুটী শিশুকে একলা ফেলিয়া যাওয়া কি আমার উচিত কর্ম্ম হইতেছে। আমি জানিতাম আমার অনুপস্থিতিতে পিতা তাহাদের ভরণপোষণের জন্য কোন যত্ন বা অর্থ ব্যয়ের ত্রুটি করিবেন না, কিন্তু কোনরূপ বিপদে পড়িলে মানসিক সান্ত্বনা ও বল তাকে কে দিবে? কিন্তু তখনই মনে হল—কেন, ভগবান্। আর জগদম্বার বয়স বেশি না হলেও তাকে যেরূপ সব কাজে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় তিনিই তাহাকে শক্তি দিবেন।

আমার যাবার সব ঠিক হয়ে গেলে একদিন জগদম্বা আমার কাছে বসিয়া বলিল—আচ্ছা! ইংরেজরা যখন এদেশে আসে, তারা তাহাদের পরিবার সঙ্গে করিয়া আনে, তবে আমরা সেখানে কি যেতে পারি না; এত কাল তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে হবে ভাবিয়া প্রাণ যে বড়ই কাতর হয়ে পড়ছে। আমি বলিলাম,—জগদম্বা! এই অল্পদিন আগে তুমিই না

আমায় বিলাতে যেতে অনুরোধ করেছিলে, আর আজ তুমি কাঁদ্‌ছ? তুমি ত জান, তোমার চোখে জল দেখিলে হয়ত আমি এ সংকল্প ত্যাগ করিব। সে অশ্রু মুছিয়া বলিল—না, না, আমার চোখের জল কখন তোমার কোন সদিচ্ছার ব্যাঘাত করিবে না, তবে ছ মাস ও তিন বৎসরে অনেক প্রভেদ। সে মাস গুণিতে গুণিতে দিন কেটে যেত, এ যে বছর গুণিতে হবে।— আমার আর কিছু বলিবার শক্তি রহিল না, তার মুখ খানি বুকে ধরিয়া দুজনে নীরবে কাঁদিতে লাগিলাম। এই ভাবে আমরা যে কতক্ষণ ছিলাম, জানি না। অনেকক্ষণ পরে আমাদের ছেলেমেয়ে দুটী আসিয়া ডাকিল, আমরা যেন চমকিয়া উঠিলাম, বলিলাম ঐ দ্যাখ, আমার অনুপস্থিতিতে তোমার সান্ত্বনার জন্য ভগবান্ আগেই তোমার কাজ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

সে কালের অন্যান্য দেশীয়দের মত আমিও ইংরেজী পোষাক পরিয়া জাহাজে উঠিলাম। বিলাতে পৌঁছিয়া দিন কতক নূতন স্থান দেখিতে ব্যস্ত রহিলাম, পরে আর সময় নষ্ট করা উচিত নয় বিবেচনায়, শীঘ্রই ব্যারিষ্টারী শিক্ষার জন্য একটা 'ইনে' যোগ দিলাম, আর সেখানে 'ডিনার' খাইয়া 'টারম' রাখিলাম। প্রতি সপ্তাহে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি পাইতাম, পিতাও তাঁর কর্ম্মচারী দ্বারা মাঝে মাঝে পত্র দিতেন। জগদম্বা আমার জন্য কাতর হলেও, গার্হস্থ্য ও জননীর কাজে সে সর্ব্বদা বিব্রত থাকিত। কাজ মানব-জীবনে সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে ওষুধের ন্যায়। উহা দ্বারা কত দুর্ব্বল হৃদয় সবল হয়, কত নিরাশ অন্তরে আশা আসে, কত দগ্ধপ্রাণে সান্ত্বনা আনে। আমার জন্য কাতর ও উদ্বিগ্ন থাকিলেও জগদম্বা কাজের দ্বারা মনকে নিযুক্ত ও শান্ত রাখিতে পারিয়াছে জানিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম, আর সে আমার মনের মত স্ত্রী হবার আশায় সাধ্যমত বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জ্জিতেছে শুনিয়া, আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যখন আইন শিখিবার জন্য বিলাতে আসিয়াছি, তখন কিছু কিছু শিখিতে লাগিলাম। দেখিতাম, আমার সমপাঠীরা নাম মাত্র পাঠ করিয়া সর্ব্বদাই আমোদ ও ভোজনে রত থাকিত, আজ থিয়েটারে যাওয়া, কাল নিজেদের মধ্যেই সখের যাত্রা করা, পরশু ডান্‌সিং পার্টি প্রভৃতি আমোদে সময় নষ্ট করিতেন। আমার ওসবে যোগ দিতে বড় ভাল লাগিত না। আমি অল্প অল্প আইনের বই গুলি পড়িয়া যে সময় পাইতাম, আমার ইচ্ছামত ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যে ডুবিয়া থাকিতাম। প্রতি কলেজেই এক একটী লাইব্রেরী ঘর আছে, সেখানে প্রধান প্রধান সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকাগুলি লওয়া হয়। তার পর লণ্ডনের ব্রিটিস মিউজিয়মের সেই গোলাকার পাঠাগারটী- তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। আমি যখন একখানি চেয়ারে বসিয়া চারদিকে সেই পুস্তক রাশি দেখিতাম, এক তোলা থেকে তেতলা পর্য্যন্ত দেওয়ালে বইয়ের রাশি সাজান রহিয়াছে—কত রকমের ও কত ভাষার গ্রন্থ, যত ইচ্ছা পড়, বেলা ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্য্যন্ত কেহ তোমাকে বাধা দিবে না—আমি পুস্তকের অমৃত-রাশি পান করিয়া স্বর্গসুখ অনুভবিতাম। মনে হত, আমি অমর হইয়া কোন সুরপুরে বাস করিতেছি, তখনকার মত স্বদেশ, স্বজন, স্ত্রী, সন্তান আমার অন্তর হতে মুছিয়া যাইত। আমি যেন কোন আশ্রমবাসী ঋষির ন্যায় নির্জ্জনে জ্ঞানপিপাসা মিটাইতে মগ্ন থাকিতাম।

ইংরেজ ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশ বকা ছেলে ছিল, শুনিতাম, বিলাতে যে বালকেরা বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী বা অলস, তাহারাই আইন-ব্যবসা শিখিতে যাইত; কেননা, অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় উহাতে অধিক পরিশ্রমের বা গভীর জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, অল্প আইনজ্ঞান ও বাক-পটুতা থাকিলেই ঐ প্রফেশনে লোকে সফল হতে পারে। আমাদের

কতকগুলি ধনী ও গোমূর্খ স্বদেশী ভায়াও আসিয়া জুটিয়াছিলেন, আবার জনকতক গম্ভীর ও শিক্ষিত দেশীয় লোকও উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। একদিকে অশিক্ষিত ধনী-পুত্রদের বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া যেরূপ কষ্ট পাইতাম, অপর দিকে যথার্থ জ্ঞান ও শিক্ষার জন্য যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহ দেখিলে আহ্লাদ হত।

মূর্খ ছেলেরা ইংরেজদের বাহ্যিক চাকচিক্য অনুকরণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিত। ফিটকাট পোষাক, সাদা কলার, বুকে 'বাটন হোল,' কফে সোণার বোতাম, হাতে সরু ছড়ি, মুখে চুরুট—সাধারণ ইংরেজ ছাত্রদের এই বাহ্যিক চালচলনটা অনুকরিয়াই তাহারা ভাবিত যে, এইবার আমরা দেশে গিয়া বড় বড় ইংরেজদের সমকক্ষ হয়ে, সকল বিষয়ে তাদের ন্যায় আচরিব, আর দেশীয় লোকেরা 'বড় সাহেব' ভাবিয়া আমাদের প্রতি সাহেবদের ন্যায় সম্মান দেখাবে ও সেলাম ঠুকিবে। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রেরা একবারও ভাবিয়া দেখিত না যে, ইংরেজদের ঐ সাজপ্রিয়তা ও বিলাসিতার মধ্যেই উহাদের হৃদয়ে কতকগুলি অতি উত্তম গুণ নিহিত আছে। আমি লক্ষ্য করিতাম, তারা যতই কেন মূর্খ ও হালকাচরিত্র হোক না, তাহাদের অন্তরে যে কি একটা স্বজাতিপ্রিয়তা, কি একটা দৃঢ়তা আছে, যাহা আমরা সহজে ধরিতে পারিতাম না। ঐ দ্যাখ, মনে হতেছে যুবকেরা কিছুই গ্রাহ্য করে না, কেবল সাজ গোজ করিয়া ও চুরুট ফুঁকিয়া দিন কাটায়। ক্রিকেট, ফুটবল খেলায় যত উৎসাহ দেখায়, বিদ্যা ও জ্ঞানশিক্ষায় তার চতুর্থাংশও আস্থা দেখায় না। কিন্তু যেমন একটী ভারতবর্ষীয় ছাত্র বা ফরাসী যুবক একটী প্রাইজ পাইল, অমনি ঘোড়ার পিঠে কষাঘাতের ন্যায় তাদের নিদ্রিত বৃত্তিগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠিল। সকলে একজোট হয়ে একজামিনের কাগজ দেখিবার জন্য কমিটি বসাইল, পাছে কেহ ভুলক্রমে ইংরেজ বালককে বঞ্চিত করিয়া বিদেশীয়কে প্রাইজ দিয়া

থাকে, পাছে তাদের স্বদেশীকে উপেক্ষা করিয়া ভিন্ন দেশীয় ছাত্রের প্রতি অনুকম্পা দেখান হয়ে থাকে।

আবার, হাজার বিলাসপ্রিয় ও আরাম-অন্বেষক হলেও উহাদের মধ্যে সমবেত হয়ে কাজ করিবার নিমিত্ত মহা শক্তি নিহিত আছে। সামান্য ক্রিকেট, ফুটবল খেলা, ও নৌকা বহা থেকে যত কঠিন কল কারখানার নির্ম্মাণ ও চালনা ঐ সাধারণ ইংরেজদের সংঘশক্তি প্রভাবে ওরূপ সুশৃঙ্খলরূপে চলিয়া থাকে। যে কাজটি উহারা ধরে, সেটী প্রাণপণে সম্পাদন করে বলিয়া কর্ম্মনিষ্ঠা উহাদের অভ্যাসগত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজদের দেখিয়া ও উহাদের মধ্যে বাস করিয়া আমার সর্ব্বদাই মনে হত, আমরা ঐ জাতির বাহ্যিক আড়ম্বরগুলি না অনুকরিয়া উহাদের চরিত্রগত উন্নত গুণ গুলি যদি ধরিতে পারি ও আত্মগত করিয়া লই, তাহলে আমাদের কত উপকার হয়, দেশের কত লাভ হয়।

সে সময়ে যে সব ভারতবর্ষীয়েরা ইংলণ্ডে যাইত, তাহারা অধিকাংশই অল্পবয়স্ক যুবক—বিলাতে ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ব্বিসের জন্য স্বদেশ ছাড়িত, দুচারটি সিবিলসর্ব্বিসে সফল হয়ে দেশে ফিরিত, দুই একটী 'কুপারসহিলে' (Coopershill) এ যোগ দিত। কেউ কেউ উচ্চজ্ঞানের আশায় অক্সফোড বা কেম্ব্রিজে যেত, বাকি প্রায় তিন ভাগ ব্যারিষ্টার হত। ব্যারিষ্টারীর অত আদর দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিতাম, ভাবিতাম, উহাতেই বুঝা যায় আমাদের দেশের লোকেরা কতদূর অসার হয়ে পড়েছে, যথার্থ বিদ্যা জ্ঞানের অপেক্ষা অর্থের কত বেশি মান্য করে। এত সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে আমরা কিনা সামান্য আইন-ব্যবসা শিখিয়া দেশে যাই, ইউরোপের এত বিজ্ঞান; এত বিদ্যা, সব ঐ অর্থকরী ব্যবসার তুলনায় তুচ্ছ বোধ করি।

বিলাতে আমার নির্ব্বিঘ্নে দেড় বৎসর কাটিল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও,

সত্যভঙ্গের ভয়ে আমি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতেছিলাম। জগদম্বার পত্রে শুনিয়াছিলাম, আমাদের মেয়েটি আমাশয় রোগে ভুগিতেছিল, কিছুদিন পরে তার মৃত্যু-খবরে অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। ভাবিলাম, তার জন্মকালে জগদম্বার আনন্দ দেখিয়া যাহা মনে হয়েছিল, সত্য সত্যই তাহা ঘটিল! তাহার অত আশার ধন, অত সাধের খেলনাটি এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল! এই মর্ম্মান্তিক শোকে আকুল হয়ে সে যে কাঁদিতেছে, আর আমি এত দূরে পড়িয়া রহিয়াছি যে, একবার তাহাকে দুটা সান্ত্বনার কথা বলিবারও সাধ্য নাই। এইবার মানুষের অক্ষমতা ও হৃদয়ের ব্যাকুলতা আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিলাম। আমার চোক হতে নিঃশব্দে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

কতকক্ষণ পরে হৃদয়ের আবেগ কিছু প্রশমিত হলে জগদম্বাকে অনেক বুঝাইয়া চিঠি লিখিলাম—জগদম্বা! এই অল্প বয়সেই তোমাকে এরূপ কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়া ভগবান্ তোমাকে সংসারের অনিত্যতা আরও ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন; শোকের আঘাতে আমাদের হৃদয়কে আরও সবল করিয়া তাঁর কাজের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। সংসারের মহা মায়ার বন্ধন কাটিয়া আমাদের দুজনাকে আরো উঁচুদিকে তুলিতেছেন। তাঁহার দত্ত সুখের ন্যায় এ দুঃখের দানকেও মাথা পাতিয়া লইবে। জগতে দুর্ব্বল মন ও অবসন্ন হৃদয় লইয়া কোন কাজ করা যায় না। আবার শোক, দুঃখ, বিপদ, অভাবের কষাঘাত না থাইলে আমরা সহজে জাগিয়া উঠি না, সেই কারণেই বোধ হয়, সেই মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের ভালর জন্যই এত অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা অবোধ প্রাণী, তাঁর সেই মঙ্গল উদ্দেশ্য বঝিতে না পারিয়া শোকে অধীর হয়ে বেড়াই। কাতর হয়ো না, অবশ্য আমার চেয়েও তুমি অনেক অধিক সেই ক্ষুদ্র ফুলটীর অভাব বোধ করিতেছ, সেই ক্ষুদ্র খেলনাটী হারিয়ে আকুল

হয়ে বেড়াচ্ছ; কিন্তু এই বিশ্বপিতার অসীম অনন্ত রাজ্যে তোমার ঐ শোকটুকু কত তুচ্ছ, ঐ অভাব কত ক্ষণস্থায়ী!—ভগ্নীর চিঠিতে জানিতে পারিলাম, ক্রমেই তার হৃদয়ে শোকের প্রচণ্ডতা কমিয়া প্রশান্ত ভাব ধরিতেছে, তার আকুল প্রাণ স্থির হয়ে আসিতেছে। সে যে এত শীঘ্র হৃদয়ে বল আনিতে পারিয়াছে, সেইজন্য আমি পরম পিতাকে ধন্যবাদ দিলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রলাপ-বাক্য।

এইরূপ অস্থিরচিত্তে আরও মাস কয়েক কাটিল। ক্রমশঃই আমি মনকে সংযত করিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। আমি জীবিকার জন্য আইন শিখিতেছিলাম, যত শীঘ্র পারি, উহার শেষ পরীক্ষা দিয়া ও শেষ ডিনার খাইয়া কোন রকমে দেশে ফিরিতে পারিলেই বাঁচি। আমার তিন বৎসর শিক্ষার প্রায় দুই বৎসর হইয়া গিয়াছে, আর দশ মাস পরে আমি যেন এই জেলখানা থেকে খালাস পাব, এই ভাবিয়া আমি অতি উদ্বিগ্নচিত্তে দিন কাটাতে লাগিলাম। এমন সময়ে একদিন টেলিগ্রাম আসিল—"পিতার পক্ষাঘাত হয়েছে, তুমি শীঘ্র চলিয়া এস, পাঁচ শত টাকা পাঠালাম।" সহসা এরূপ সংবাদে চমকিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, ঈশ্বরের কাজ বুঝা ভার। মেয়েটীর মৃত্যুর পর থেকেই আমি দেশে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলাম, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে পিতা আমাকে বিলাতে পাঠিয়েছেন, তাহা পূর্ণ না হলে, আমার বাড়ীতে ফিরে যাওয়া উচিত নয়, এই ভাবিয়া চুপ করিয়াছিলাম, এখন ভগবান্ আর এক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া আমার ইচ্ছা পূরণের উপায় করিয়া দিলেন, ইহাতে আমি অতিশয় আশ্চর্য্য হলাম। আমি মেলের সঙ্গে ওভারল্যাণ্ড পথে স্বদেশে আসিবার জন্য ইংলণ্ড ছাড়িলাম। এক মুহূর্ত্তে ব্যারিষ্টারী, সম্মানলাভ, অর্থোপার্জ্জন সব রসাতলে গেল! হায়! মানুষ! তোমার এত বিদ্যা, এত প্রভাব, এত অহঙ্কার সত্ত্বেও তুমি কি সামান্য ঘটনার দাস, কি তুচ্ছ

অবস্থার অধীন! এই বিশাল জগতে তুমি কি ক্ষুদ্র প্রাণী, এই মহা ব্রহ্মাণ্ডে তুমি কি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ! ভাবিলাম, অজ্ঞান বাল্যকালে না বুঝিয়া ভেল্কি খেলিতে গিয়াছিলাম, সমস্ত জীবনটাই ত দেখিতেছি সেইরূপ ভেল্কিবাজি!!

ইউরোপীয় মেলের সঙ্গে ব্রিণ্ডিসি পর্য্যন্ত ট্রেণে আসিয়া ভূমধ্যস্থ সাগরে জাহাজে উঠিলাম। এরূপ শঙ্কিত ও উদ্বিগ্নচিত্তে আমি কখন ভ্রমণ করি নাই। মৃত্যুকালে মাকে দেখিতে পাই নাই, পিতাকেও বুঝি আর এ জন্মে দেখিতে পাব না, এই ভাবিয়া মনে একটা দারুণ আঘাত পেলাম। আমি যেন হাত দিয়া দিনগুলা ঠেলিতে লাগিলাম। যে পুস্তক পাঠ আমার অতি প্রিয় কাজ ছিল, তাহাতেও মনোনিবেশ করিতে পারিলাম না। দিনরাত কেবল পিতার মুখ ও তাঁর রোগযন্ত্রণা আমার সুমুখে ঘুরিতে থাকিল। বড় হয়ে অবধি বাবাকে কখন পীড়িত দেখি নাই, তিনি মৃত্যুকে বড় ভয় করিতেন, এক দিকে যেমন অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, অপর দিকে সেইরূপ মিতাহারী ও সাবধানী ছিলেন। তিনি অতি স্নেহময় পিতা না হলেও আমার জন্মদাতা, তাঁর প্রসাদেই এত বড় হইয়াছি, তাঁর কল্যাণেই এতদিন স্ত্রী সন্তান লইয়া নির্ভাবনায় সংসার করিয়াছি; আর তিনিই আমার জীবনের মূল, শোণিতের প্রধান বন্ধন—এই সব ভাবিয়া আমি তাঁকে দেখিবার জন্য অধীর হলাম। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর সেই অবৈধ বিলাসিতা, ভোগলিপ্সা, অন্যায় আচরণ, অসংযত জীবন, আমার মনে স্থান পাইল না। লোকে বলে, সকল দ্রব্যই দূর থেকে অতি সুন্দর দেখায়; আমার মতে মানব-চরিত্রও সেইরূপ। নিকটে না দেখিলে কিছুরই বিশ্লেষণ করা যায় না। দূর হতে যে নগরটি নানা রমণীয় অট্টালিকায় শোভিত, অতি সুখপ্রদ বোধ হয়, কাছে এসে দ্যাখ, সেই সুন্দর প্রাসাদশ্রেণীর মধ্যেই আবর্জ্জনাপূর্ণ কি

সরু সরু গলি রহিয়াছে, ঐ শুভ্র দৃশ্যের পাশে কি পূতিগন্ধ উঠিতেছে; সেইরূপ অন্তর হতে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধেয় মূর্ত্তি ও স্নেহময় আকৃতি দর্শনের লালসায় প্রাণ ব্যাকুল হয়, নিকটে থাকিলে তাঁরই নির্ম্মম ব্যবহারে ও কঠোর শাসনে আমরা ব্যথিত হই।

নানা চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় তিন সপ্তাহ কাটিল। আমি বাড়ী পৌছিয়াই ছুটিয়া পিতার ঘরে গেলাম। দেখিলাম, তিনি চোক বুজিয়া পড়িয়া আছেন। জগদম্বা ও ছোট দিদি তাঁর কাছে বসিয়া সেবা করিতেছে। যে গৃহের রৈ রৈ শব্দে পাড়া কাঁপিত, আজ সেই ঘরের কি নীরব ও নিস্তব্ধ ভাব। আমাকে দেখিবামাত্র আমার ছেলেটি ছুটিয়া এসে বলিল —দাদাবাবু! বাবা এসেছে। তিনি চোক চাহিলেন, আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন, কি বলিতে গেলেন, কিন্তু বাক্য সরিল না। আমি তাঁর কাছে বসিয়া পড়িলাম। পরে শুনিলাম, প্রায় এক মাস হল, পিতার সর্ব্বাঙ্গ পক্ষাঘাতে পড়িয়া গিয়াছে, সামান্য জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু কথা কহিবার শক্তি নাই, সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে গিয়াছে, জিব আওড়াইতেছে। ডাক্তারে বলিয়াছে, বাঁচিবার আশা নাই, তবে কিছুদিন ভুগিতে পারেন। আমার বড় দাদা পিতার পীড়ার খবর পাইয়া কর্ম্মস্থান থেকে এসেছিলেন, তিনি পিতার লোহার সিন্ধুক খুলিয়া তাঁর উইলখানি দেখিয়া ও বিষয় সম্পত্তির খোঁজ লইয়া আবার এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছেন।

এতদিন আমি নির্ভাবনায় জীবন যাপিতেছিলাম, বাড়ী আসিবার পর সমস্ত সংসারের দায়িত্ব আমার মাথায় পড়িল। আমি এতদিন পরে যথার্থ সংসার-ব্রতে দীক্ষিত হলাম। পিতার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলাম। যদিও ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন—তাঁর জীবনের আশা নাই, তথাপি তাঁকে বিনা চিকিৎসা ও বিনা সেবাতে ফেলিয়া রাখা আমার কাছে অতি গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে হল। চিকিৎসকেরা রোগ দূর করিতে না

পারিলেও অনেক সময়ে পীড়ায় শান্তি আনিতে পারে। ছোটদিদি ও জগদম্বা পালাক্রমে পিতার সেবা করিত। আমার মেজদাদা মাঝে মাঝে পিতার ঘরে আসিতেন, ছোটদিদিকে দুই চারটি প্রশ্ন করিয়া আবার চলিয়া যেতেন। আমি প্রায় তাঁর কাছে বসিয়া থাকিতাম। তিনি কখন কখন স্নেহভরে আমার হাত ধরিতে যাইতেন, কিন্তু হাত শিথিল হইয়া পড়িয়া যাইত। কখন কখন তাঁর মুখ নড়িত, যেন কি বলিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু বাক্য বাহির হত না, দুই চোক দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। তাঁর অবস্থা দেখিয়া প্রাণে ব্যথা পাইতাম। ভাবিতাম, যে লোক আজীবন নিজ গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন, শেষকাল পর্য্যন্ত যিনি বিলাসে আমোদে ও আরামে দিন কাটাইয়াছেন, মুহূর্ত্তের জন্যও যিনি একবারও ভাবেন নাই যে এ জগতে সকলই অনিত্য, সকলই নশ্বর, সেই ব্যক্তির আজ কি পরিণাম! যাঁহার মুখে হাসি দেখিলে পারিষদেরা স্বর্গজ্ঞান করিত, যাঁর চোকের আদেশে কর্ম্মচারীরা সর্ব্বত্র ছুটিত, যাঁর ভয়ে বাড়ীশুদ্ধ লোক কাঁপিত, আজ সেই লোক জড়ের ন্যায় শয্যাশায়ী রহিয়াছে; উঠিবার শক্তি নাই, হাতখানি পর্য্যন্ত কেহ না তুলিয়া দিলে নাড়িবার ক্ষমতা নাই, মুখে খাদ্য না দিলে খাইবার উপায় নাই। হায় রে মানুষ! এই তোমার দর্প, এই তোমার অহঙ্কার। এই তোমার প্রতাপ! জীবনের এই পরিণাম দেখিয়াও তোমার জ্ঞান হয় না। প্রায় চার মাস ঐরূপ অসহায় অবস্থায় পিতা পড়িয়া রহিলেন।

একদিন ভোরে উঠিয়া দেখি, পিতার অবস্থা অতি শোচনীয়, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যান নাই, রাত্রে অনেকবার অস্ফুট স্বরে নিজ মাকে ডাকিয়াছেন আর আমার মার নাম করিয়াছেন। মেজদাদা ডাক্তার বলিয়া তিনিই পিতার বৈঠকখানার পাশে একটী ঘরে শুইতেন। দেখিলাম— পিতা শ্বাস টানিতেছেন, মেজদাদা ঘড়ী ধরিয়া তাঁর কাছে বসিয়া আছেন,

ক্রমেই তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আরও শিথিল হয়ে আসিল, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তাঁর মুমূর্ষু কাল উপস্থিত দেখিয়া আমাদের দুইজন কর্ম্মচারী তাঁকে খাট থেকে নামাইয়া দালানে বাহির করিতে উদ্যত হইলেন। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম। যিনি নিজের টাকা দিয়া ও নিজের ভোগের জন্য ঐ সব দ্রব্যগুলি কিনিয়াছিলেন আর এত বৎসর ধরিয়া যাহা ব্যবহার করিতেছেন, মৃত্যুকালে তাঁহাকে সেই সব তাঁর যত্নের ও আরামের জিনিস থেকে বঞ্চিত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া রাখা আমার কাছে অতি নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর প্রথা বোধ হল। যদি ঐ বাহ্যিক অজ্ঞানের ভিতরে তাঁর কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান থাকে, তাহলে আমাদের এই নির্ম্মম আচরণে তিনি এই শেষ মুহূর্ত্তে আজ কি মনস্তাপ পাইবেন! ভাবিলাম, এই যে অমূল্য জীবনটা জন্মের মত চলিয়া যাইতেছে, এত সেবায়, এত চিকিৎসায় যাঁহাকে আমরা ঈশ্বরের বিধানের বাহিরে এক মিনিটও ধরিয়া রাখিতে পারি না, সেই অমূল্য জিনিসের সঙ্গে আমরা খানকতক লেপ, গদি ফেলিয়া দিতে এত অনিচ্ছুক! সার বস্তু হারিয়ে অপদার্থ জাজিম, সতরঞ্চির উপর আমাদের এত মমতা! ধিক আমাদের যত্নে! ধিক্ আমাদের পিতৃভক্তিতে! ধিক্ আমাদের মহত্ত্বে!

পূর্ব্ব হতে যাহা ভাবিয়াছিলাম, পিতার মৃত্যুর পর তাহাই ঘটিল। তিনি জীবদ্দশায় অতিরিক্ত খরচ করিয়া অধিকাংশ টাকাই নিঃশেষ করিয়াছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর জানা গেল, আমাদের তিন ভায়ের প্রত্যেকের ভাগে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার মাত্র টাকার কোম্পানির কাগজ পড়িয়াছে, আর ভদ্রাসন বাড়ী ছাড়া অন্য কিছুই স্থাবর-সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই। পিতার শ্রাদ্ধের পর বড়দাদা তাঁহার ভাগ লইয়া কর্ম্মস্থানে গেলেন। মেজদাদা অবিবাহিত, ঐ টাকাতেই তাঁর একরূপ চলিতে পারে, কিন্তু আমার উপায় কি হবে? যে আশায় পিতা আমাকে বিলাতে পাঠিয়ে-

ছিলেন, তাহা পূর্ণ হবার আগেই তিনি সরিয়া পড়িলেন। এখন আবার চাকরী না করিলে আর ত কোন উপায় দেখিতেছি না। আমি ত একলা নয়, স্ত্রীপুত্র আমার গলায় বাঁধা, তাদের যোগ্যরূপে ভরণপোষণ করিব কিরূপে? আমি মহা ভাবনায় পড়িলাম।

এখন আমরা আবার গরীব হলাম দেখিয়া আমাদের নূতন বন্ধুগুলি সব একে একে অন্তর্ধান হল। আমি বিলাত থেকে ফিরিয়া আসিবার পর তাহারা দুএকজন আমার সঙ্গে দেখা করিতে এসেছিল, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর উইল প্রকাশিত হইলে, সকলে বিদায় গ্রহন করিল। আমি তাহাদের এ ব্যবহারে সুখী বই দুঃখিত হলাম না। ওরূপ কপট বন্ধু থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। কেবল আমার সেই চিরকালের পুরাণ বন্ধু অনু মাঝে মাঝে আসিয়া আমার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা করিত, আর কেবল তার সঙ্গেই আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতাম।

আমি স্বভাবতঃই লোকের সঙ্গে বেশি মিশিতে ভালবাসি না, বিশেষ কোন লোককে ভালরূপে না জানিয়া তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। সেকারণে দুই একজন নূতন ব্যারিষ্টার আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেও আমি এ পর্য্যন্ত কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই। ক্রমে ভাবিলাম, এরূপ নিষ্কর্ম্মা হয়ে কতদিন বসিয়া থাকিব, পাঁচ জনের কাছে যাতায়াত না করিলে লোকে আমাকেই বা চিনিবে কি প্রকারে? আর আমাকে যখন জীবিকা উপার্জ্জিতে হবে, তখন এ মিথ্যা অভিমানটুকু আমার বিসর্জ্জন দেওয়াই উচিত।

একদিন একটী বিলাতফেরত ডাক্তারের বাড়ী থেকে আমার ও 'মিসেসের' নামে একখানি টিপার্টিতে নিমন্ত্রণের কার্ড আসিল। জগদম্বা শুনিয়াই ত হাসিয়া উড়াইয়া দিল। আমি ভাবিলাম, দেখিয়াই আসি না,

ব্যাপারটা কি? আমার সকলের চেয়ে যে ভাল পোষাকটী ছিল, সেইটী জগদম্বা বুরুষ করিয়া দিল, ডসনের বাড়ীর জুতাতে একটু বেশি মাত্রায় কালী লাগাইয়া সাফ করা হল, সাদা কলার, সিল্কের নেকটাই, সব যোগাড় করিয়া এক রকম ভদ্র সাহেব সাজিয়া পার্টিতে গিয়া উপস্থিত হলাম। দেখিলাম, অনেকগুলি বাঙ্গালী ও ইংরেজ ব্যারিষ্টার, বড় বড় উকীল, এটর্ণী ও দুচার জন দেশীয় জজ লইয়া পার্টী গঠিত হয়েছে। অধিকাংশই ইংরেজী পোষাক পরা; কতকগুলি ব্রাহ্ম ভায়া ও দেশী ব্যারিষ্টারদের স্ত্রী কন্যাও দেখিলাম। সকলেই অতি মনোহর, বহুমূল্য ও বিবিধ বেশে সজ্জিত। গৃহকর্ত্তা ড্রয়িংরুমের কাছে দাঁড়াইয়া সহাস্যে আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করিতেছেন। আমি দ্রুতপদে তাঁর সঙ্গে 'শেক হ্যাণ্ড' করিতে গেলাম—কিন্তু হা দুরদৃষ্ট! তিনি যে আমার নাম শুদ্ধ ভুলিয়া গিয়াছেন! আমি অপ্রতিভ হয়ে এক পাশে বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম, আমার এ বিড়ম্বনা কেন, আমি বামন হয়ে কেন চাঁদে হাত দিবার প্রত্যাশা করেছিলাম। আমাদের দেশের লোকেরা বিলাতে গিয়া অধিকাংশই ইংরেজদের অর্থের আদর, বাহ্যিক আড়ম্বর ও বিলাসিতা শিখিয়া আসেন, উহাদের ভিতরের উচু গুণগুলি—একতা, মহত্ব, কার্য্যশক্তি দৃঢ়তা প্রভৃতি সবল জাতীয় চরিত্রের ভিত্তিগুলি ধরিতে পারে না, এ যে বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

সকল বিষয়ে ভগ্নাশ হয়ে আমার মন কেমন অবসন্ন হয়েছিল, আমি কি করিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। কয়েক মাস পরে শুনিলাম, বিলাতে আমার সমপাঠীদের মধ্যে চার পাঁচজন ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভাবিলাম, তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা করিতে দোষ কি? আমি স্বভাবতঃই লাজুক ও অভিমানী। ধনী পিতার পুত্র হয়েও বেশি বড় মানুষদের সঙ্গে অধিক মিশিতাম না, বেশি টাকা

ওলা লোকদের কাছ ঘেঁসিতাম না ; আর এখন ত আমি একরূপ দরিদ্র, এখন পাঁচ জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেও নারাজ। তথাপি পূর্ব্ব পরিচয় ও বিদেশে আলাপের অনুরোধে আমি,——এস্কোয়ার, ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ব্যারিষ্টার মশায় কলিকাতায় সাহেব-পল্লীতে বাস করেন, খুব বড় কম্পাউণ্ডওলা বাড়ী, ফটকে দরোয়ান। আমি পদব্রজে গিয়াছিলাম বলিয়াই হোক বা আমার সামান্য পোষাক দেখিয়াই হোক, দরোয়ানজী আমায় সেলাম করিতেই ভুলিয়া গেল। আমি এক কার্ড বাহির করিয়া তার হাতে দিলাম, বলিলাম—সাহেব কা পাশ লে যাও। অল্পক্ষণ পরে সে ফিরিয়া এসে বলিল—সাহেব পুছতা হ্যায়, আপ কাঁহা সে আয়া।—হরি! হরি! এই এক বৎসর যেতে না যেতেই ব্যারিষ্টার মহাশয় আমার অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছেন! সেই যে লণ্ডনের পশ্চিম-মধ্য-বিভাগে আমার একটী সুন্দর সাজান ঘরে বসিয়া আমরা কয়েকটী ভারতবর্ষীয় একত্র হয়ে চা পান করিতাম, আর স্বদেশের কথা আলোচিতাম, তাহা কি ব্যারিষ্টার ভায়া এত অল্পদিনেই ভুলিয়া গেলেন। আমি ভাল করিয়া পরিচয় দিব কি না, ভাবিতেছি, এমন সময়ে এক 'ল্যাণ্ডো' চড়িয়া দুটী সুসজ্জিতা মহিলা ও একটী ভদ্রলোক বাড়ী প্রবেশিল। দরোয়ান সেলাম করিতে করিতে ছুটিল। আমি অপ্রস্তুতের ন্যায় ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থাকিলাম। বাড়ী আসিতে আসিতে আর একজন বিলাতফেরত বন্ধুর কথা মনে পড়িল। তিনি সাহেব ও বাঙ্গালী-পল্লীর মধ্যস্থলে থাকিতেন। লোকটী কিছু গম্ভীর প্রকৃতির। বিলাতে ব্যারিষ্টারী না শিখিয়া বিজ্ঞানে উপাধি লইয়াছিলেন। স্বদেশে আসিয়া খুব বড় সরকারী কাজ পাইয়াছেন। আমি কার্ড পাঠাবামাত্র আমাকে সেলাম দিয়া ডাকিয়া পাঠালেন। দেখা হলে খুব সহৃদয়ে অভ্যর্থনা করিলেন। হঠাৎ আমার ইংলণ্ড ত্যাগ ও পিতার

মৃত্যুতে বেশ সহানুভূতি দেখালেন। আমি তাঁহার সদ্ভাব দেখিয়া তাঁহাকে আমার অবস্থা সবিশেষ জানালাম। তিনি বলিলেন, শিক্ষা বিভাগে কোনরূপ কাজের সুবিধা দেখিলে তিনি প্রথমেই আমাকে স্মরণ রাখিবেন। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর পরস্পরের কাছে বিদায় লইলাম। লোকটীকে দেখিয়া মনে হল, লোকে যে বলে বড় সরকারী চাকরী পেলেই মানুষ অহঙ্কারী হয়, সেটা ভুল, ইনি ত বেশ অমায়িক। আমি চলিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, অতি সুন্দর ও দামী বেশ-ভূষায় সজ্জিত দুইটি স্ত্রীলোক ফিটনে চড়িয়া হাওয়া খাইতে যাইতেছে, আমি তাহাদের পোষাকের বাহার ও চাকচিক্যে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এঁরা বাঙ্গালীর গৃহকন্যা—না অপ্সরা? দরোয়ানকে জিজ্ঞা-সিয়া জানিলাম তাঁহারা গৃহকর্ত্তার স্ত্রী ও কন্যা। আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। লণ্ডনের হাইড পার্কের 'রটনরো' নামক স্থানটি মনে পড়িল। সেখানে যে বেশ বিন্যাস, সাজসজ্জার পরাকাষ্ঠা দেখিয়াছি, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের মধ্যে সেই বেশভূষার চূড়ান্ত অসারতা ঢুকিয়াছে, আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা ঐরূপ প্রজাপতি সাজিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াচ্ছেন, আর আমরা তাহাতে প্রশ্রয় দিতেছি। ধনী ইংলণ্ডে যাহা শোভার আকর বলিয়া মনে হয়, দরিদ্র ভারতে তাহা যে ধ্বংস-কারী প্রহেলিকা মাত্র। বিলাতফেরত বাঙ্গালি! ধিক্ তোমার বিদ্যা-শিক্ষা, ধিক্ তোমার অনুকরণ-প্রিয়তা, ধিক্ তোমার মানসিক স্বাধীনতা। বিদ্যাজ্ঞানের দ্বারা তোমার মন যদি সংযত, উন্নত ও মার্জ্জিত না হয়, তাহলে আমার মতে তুমি চিরকাল মুর্খ থাক, তাহাতে ক্ষতি নাই। ইংরেজদের ভালগুণগুলি না লইয়া তুমি কেবল বাহ্যিক বেশের অনুকরণ করিলে তোমার মহত্ত্বের পরিবর্ত্তে নীচত্বের প্রকাশ পায়; আর এতদিন স্বাধীন দেশে থাকিয়া তুমি কেবল ফেসানের ক্রীতদাস হইয়াছ, ইহা

দেখিলে লজ্জায় আমার যে মাথা হেঁট হয়ে পড়ে, ঘৃণায় অন্তর জর্জরিত হয়। তুমি ওরূপ বিলাসিতা ও আড়ম্বরে সমস্ত অর্থ ব্যয় না করিয়া সামান্যভাবে জীবন-যাপিলে দেশের ও জগতের কত কাজ করিতে পারিবে। ভাব দেখি, এত টাকা খরচ করে তোমাদের বিলাত পাঠিয়ে দেশের কি লাভ হইল? যদি তোমাদের চরিত্রের উন্নতি না হল, যদি তোমাদের হৃদয়ের মহত্ব না বাড়িল, যদি তোমাদের স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি না ঘটিল, তবে অত টাকাগুলা খরচ করিয়া বিলাতে যাবার দরকার কি?

বাড়ীতে আসিয়া জগদম্বার কাছে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলে সে হাসিয়া বলিল—পরমেশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার ব্যারিষ্টারীতে ব্যাঘাত না পড়িলে হয় ত আমাকেও একদিন প্রজাপতি সাজিতে হত! আমি বলিলাম, তুমি যে দরিদ্রের স্ত্রী, অত সাজসজ্জার টাকা কোথা পাবে? সে তার সরল প্রেমপূর্ণ চোকদুটী আমার দিকে ফিরাইয়া বলিল—আচ্ছা, তুমি ওরূপ 'গরীব' 'গরীব' বল কেন? আমার ত মনে হয়, আমার মত ধনী এ জগতে কেউ নাই। তোমার চেয়ে কি টাকার দাম বেশি?—আমার মুখ বন্ধ হল। ঐরূপ দুচারটি শিক্ষা পাইয়া বিলাতফেরত স্বদেশীয়দের কাছে আর বড় ঘেঁসিলাম না। অনেক খুঁজিয়া একটী কলেজে প্রফেসরী কাজ পাইলাম। সামান্য গৃহস্থ অবস্থায় মনের শান্তিতে দিন কাটাতে লাগিলাম।

সমাপ্ত।